শ্রীশ্রীমা সারদা

(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটির (প্রাইভেট) লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
২৪ ডিসেম্বর (শ্রীশ্রীমায়ের
পুণ্য জন্মতিথি) ১৯৫৯

ছেপেছেন
বি· সি· মজুমদার
বি· পি· এমস প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উঃ)

প্রচ্ছদ
সুফি

নিবেদন

প্রবাসী ১৩৩১ বৈশাখ সংখ্যায় পত্রিকা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "সারদামণি দেবীর জীবনকথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন জীবনচরিত নাই। পরমহংসদেবের জীবনচরিতে প্রসঙ্গক্রমে সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে তাহার দ্বারাই কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে হয়। সম্ভব হইলে রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তদের কেহ এই মহীয়সী নারীর জীবনচরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। হয়তো একাধিক জীবনচরিত লিখিত হইবে। **তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোনপ্রকার ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনি, ভাষ্য থাকিলে চলিবে না।**"

রামানন্দের একটি ইচ্ছা বহু পূর্বেই পূর্ণ হয়েছে—সারদাদেবীর বহু জীবনীগ্রন্থ এখন সহজলভ্য কিন্তু দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষাটি এ যাবৎ অপূর্ণই থেকে গেছে—সারদাদেবীর প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত হলেও প্রায় সবগুলি টীকা-টিপ্পনি, ভাষ্যতেই স্ফীত-কলেবর। তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না কিন্তু নিরপেক্ষ ইতিহাসেরও উপযোগিতা কিছু কম নয়। বর্তমান গ্রন্থটি রচনাকালে আমরা এদিকেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রেখেছি—কোনো কাহিনী বা ঘটনার ব্যাখ্যা বা ভাষ্য রচনার ভার পাঠকের হাতেই ন্যস্ত করেছি। এ ছাড়া, এ যাবৎ প্রকাশিত গ্রন্থগুলি কোনো কালক্রম অনুসরণ করে রচিত হয় নি—সাধারণত পরিচ্ছেদগুলি বিভক্ত হয়েছে শ্রীমার কতকগুলি কর্মপরিচয় ও প্রণালী, গুণাবলী বা ভাবের উপর নির্ভর করে। আমরা যথাসম্ভব কাল অনুযায়ী জীবনী প্রণয়নেরই চেষ্টা করেছি; তবে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে পূর্ব প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থ থেকেই। উক্ত জীবনীগ্রন্থগুলি ছাড়াও পরবর্তীকালে প্রকাশিত ভগিনী নিবেদিতার পত্রাবলী, 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী প্রভানন্দ ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কিছু কিছু প্রবন্ধ, প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার স্মৃতিকথা, স্বামী অব্জজানন্দ সঙ্কলিত 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' থেকে কিছু কিছু নতুন সংবাদ বর্তমান গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও এই গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ বলার দাবী করি না, কারণ মাঝে মাঝেই সারদাদেবীর জীবনের ধারাবাহিকতার ইতিহাস বিচ্ছিন্ন। এই সময়ের কোনো সংবাদ সংগ্রহ করা বর্তমানে আর সম্ভব বলে মনে করি না এবং ভবিষ্যতেও সেই শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করা সম্ভব হবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সারদাদেবীর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের অনুপুঙ্খ বিবরণ সংগৃহীত হয় নি—হওয়া সম্ভবও ছিল না। পরবর্তীকালে যতখানি আগ্রহ সহকারে ভক্তগণ তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, পূর্ববর্তীকালের ঘটনা সে

ভাবে সংগৃহীত হয় নি; সে ক্ষেত্রে তাঁরা শ্রীমায়ের স্মৃতিচারণের উপরই নির্ভর করেছেন। কিন্তু সেই স্মৃতিচারণায় ধারাবাহিকতার অভাব স্বাভাবিক। তার ওপর আছে স্মৃতির বিশ্বাসঘাতকতা। বাল্য ও কৈশোর বাদ দিলে সারদাদেবীর পুণ্যজীবন দুটি ভাগে বিন্যস্ত করা চলে—শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলার কাল এবং তাঁর দেহাবসানের পরবর্তীকাল। প্রথম অংশটি ছায়াচ্ছন্ন—সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণের স্মৃতিনির্ভর। আবার দ্বিতীয় অংশটিরও কয়েকটি ভাগ; যথা—জয়রামবাটী-কামারপুকুর কাহিনী, কলকাতা কাহিনী এবং তীর্থপর্যটন কাহিনী। জয়রামবাটী-কামারপুকুরে অবস্থানকালের মধ্যেও যথেষ্ট ফাঁকের অবকাশ আছে। কলকাতা ও তীর্থপর্যটন কাহিনী ভক্তেরা যথাযথভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। জীবনের তিন-চতুর্থাংশ যিনি অন্তঃপুরচারিণী তাঁর কোনো 'শ্রীম' ছিল না, যিনি ডায়েরীর মধ্যে তাঁকে ধরে রাখবেন। সুতরাং মাঝে মাঝে যুক্তিনির্ভর অনুমান অনিবার্য। প্রচলিত জীবনীগ্রন্থগুলির মধ্যেও পরস্পর বিরোধিতা বা মতপার্থক্য আছে—সেগুলি প্রয়োজনমত পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রেরণাতেই আমরা এই কাজে হাত দেবার সাহস সঞ্চয় করি। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (বর্তমানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সহকারী সম্পাদক) রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারের গবেষণায় ব্যাপৃত। প্রয়োজনে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। বেলুড় মঠের বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ (ম্যানেজার) স্বামী প্রমেয়ানন্দ ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যাপীঠের বর্তমান সম্পাদক স্বামী উমানন্দ নিরন্তর উৎসাহিত করেছেন। আর আমাদের দীর্ঘকালের একান্ত সুহৃদ শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মূল্যবান পরামর্শ আমাদের বাড়তি (ন্যায্য বলেও দাবী করি) পাওনা। বন্ধুবর সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অসুস্থ অবস্থায় নিয়মিত পত্র মারফত উৎসাহিত করেছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

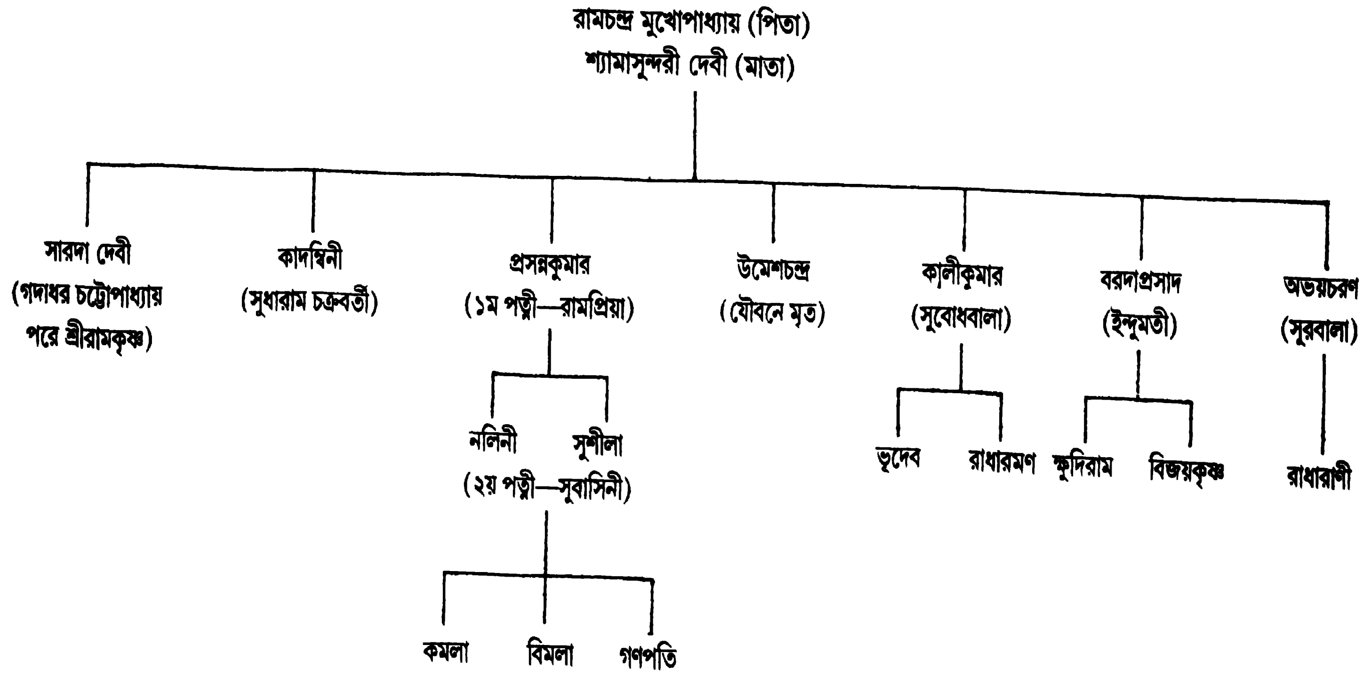
প্রবন্ধ সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশে সাধারণত প্রকাশকেরা যখন কুণ্ঠিত তখন দেব সাহিত্য কুটীর কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশে যে দুর্লভ সৎসাহস দেখিয়েছেন তার জন্য শুধু আমরা নয়, শ্রীমা-অনুরাগী পাঠকসমাজও তাঁদের কাছে ঋণবদ্ধ।

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

উৎসর্গ

পিতা ভূপেন্দ্রপ্রসাদ ও মাতা বিজনবালার স্মৃতির উদ্দেশে

বংশ-তালিকা


রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পিতা)
শ্যামাসুন্দরী দেবী (মাতা)
সারদা দেবী
(গদাধর চট্টোপাধ্যায়
পরে শ্রীরামকৃষ্ণ)
কাদম্বিনী
(সুধারাম চক্রবর্ত্তী)
প্রসন্নকুমার
(১ম পত্নী—রামপ্রিয়া)
নলিনী
সুশীলা
(২য় পত্নী—সুবাসিনী)
কমলা
বিমলা
গণপতি
উমেশচন্দ্র
(যৌবনে মৃত)
কালীকুমার
(সুবোধবালা)
ভূদেব
রাধারমণ
বরদাপ্রসাদ
(ইন্দুমতী)
ক্ষুদিরাম
বিজয়কৃষ্ণ
অভয়চরণ
(সুরবালা)
রাধারাণী

শ্রীশ্রীমা সারদা

(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

॥ ১ ॥

১২৬০ বঙ্গাব্দ। ৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি (ইং ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩)।

বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার সংযোগস্থলে জয়রামবাটী গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পর্ণকুটীরে রাত্রি দুই দণ্ড নয় পল-এ (দিন ও রাত্রির সংযোগকালের সামান্য পরে—গোধূলি লগ্নে) জন্মগ্রহণ করেন তাঁর প্রথমা কন্যা সারদামণি দেবী। এই কন্যার জন্মের কিছুদিন আগে একরাত্রে রামচন্দ্র স্বপ্ন দেখেন 'একটি হেমাঙ্গিনী বালিকা তাঁহার পৃষ্ঠোপরি পড়িয়া কোমল বাহুপাশে তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়াছে।' রামচন্দ্র তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'কে গো তুমি?' বালিকা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'এই আমি তোমার কাছে এলুম।' সারদাদেবীর মায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ দর্শন ছিল আরও প্রত্যক্ষ। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনাকালে সারদাদেবী বলেছিলেন, "আমার জন্মও তো ঐ রকমের, (অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের মত)।" তাঁর মা গিয়েছিলেন শিহড়ে ঠাকুর দেখতে। ফেরার সময় একটি দেবালয়ের নিকটবর্তী বেলগাছ তলায় শৌচে যান। সেই-অবস্থায় তিনি দেখতে পান, "লাল চেলি পরা একটি পাঁচ ছ'বছরের সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার কাছে এলাম মা।' মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে ধরাধরি করে নিয়ে এল।...তা থেকেই আমার জন্ম।"

সারদাদেবীর মা শ্যামাসুন্দরী শিহড় নিবাসী হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা—বংশ-পদবী, বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বংশের কোন এক পূর্বপুরুষের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বর্ধমানের মহারাজা খেতাব দেন—'মজুমদার'। সেই থেকে বংশ

পরম্পরায় মজুমদার পদবীই তাঁরা ব্যবহার করতেন। সারদাদেবী নিজেদের মা বাবার পরিচয় ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "আমার মা-বাবা বড় ভাল লোক ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক—অন্যবর্ণের দান নিতেন না। মায়ের কত দয়া ছিল—লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন, কত সরল'! ...বাবা তামাক খেতে ভালবাসতেন। তা এমন সরল, অমায়িক ছিলেন যে, যে-কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে যেত, ডেকে বসাতেন, আর বলতেন, বসো ভাই, তামাক খাও। এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম তামাক সাজতেন। বাবা-মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয়? ...মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী, সমস্ত বছর সব জিনিষটি গুছিয়ে রাখতেন, বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার'।"

নিজের নামকরণ সম্পর্কে সারদাদেবীর কথা, "আমার মা নাম রেখেছিলেন ক্ষেমঙ্করী। আমি হবার আগে আমার যে মাসিমা এখানে [জয়রামবাটীতে] এসেছিলেন, তার একটি মেয়ে হয়। মাসিমা তার নাম রেখেছিলেন সারদা। সেই মেয়ে মারা যাবার পরই আমি হই। মাসিমা আমার মাকে বলেন, 'দিদি, তোর মেয়ের নামটি বদলে সারদা রাখ; তাহলে আমি মনে করব আমার সারদাই তোর কাছে এসেছে এবং আমি ওকে দেখেই ভুলে থাকব।' তাইতে আমার মা আমার নাম রাখলেন সারদা।" পরে তাঁর রাশিনাম হয় ঠাকুরমণি দেবী।

প্রায় দেড়শো বছর আগেকার জয়রামবাটী বাংলার অন্যান্য প্রত্যন্ত গ্রামগুলির মতই অবহেলিত, তিমিরাচ্ছন্ন। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই—একমাত্র ভরসা শ্রীচরণ। আদিগন্ত বিস্তৃত রুক্ষ প্রান্তর—মাঝে মাঝে গাছগাছালির মধ্যে ছোট ছোট গ্রাম—দু' একটি প্রাচীন মন্দির বা পূজাস্থলী। শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় শূন্য—দু'একটি গ্রাম্য পাঠশালা, আর যাত্রা, কথকতা, বাউল কীর্তনকে অবলম্বন করে লোকশিক্ষার সীমিত উপকরণ। জয়রামবাটী গ্রামের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে বয়ে যায় শীর্ণকায় আমোদর নদ। ম্যালেরিয়া, উদরাময় এখানকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। গ্রামটি ব্রাহ্মণ প্রধান।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ কবে এবং কিভাবে এখানে এসেছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায়, ১০৭৬ বঙ্গাব্দের ১২ বৈশাখ বিষ্ণুপুরের কোন এক রাজা জয়রামবাটীর খেলারাম মুখোপাধ্যায়কে ঐ গ্রামের ধর্মঠাকুরের সেবা-পূজার জন্যে কিছু ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর ভূমি দান করেন। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই খেলারামের বংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর পিতার নাম কার্তিকচন্দ্র। রামচন্দ্রের আরও তিনটি ভাই ছিল—ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও নীলমাধব। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত—অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সামান্য উপার্জন করতেন, আর নীলমাধব কলকাতায় পাইকপাড়ার

জমিদার বাড়িতে সামান্য পাচকের কাজ করতেন। বৃদ্ধ বয়সে কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি সারদাদেবীর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন—পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটবে। ধর্মঠাকুরের সেবা ছাড়াও মুখোপাধ্যায় পরিবার গ্রামবাসীদের যজন-যাজন ক্রিয়া সম্পাদন করতেন আর যে সামান্য জমিজমা ছিল তাতে নিজেদের তত্ত্বাবধানে লোক দিয়ে চাষ-আবাদ করতেন অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে পরিবারটি ছিল গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত।

রামচন্দ্র দীর্ঘদিন নিঃসন্তান ছিলেন। পিতামাতার প্রথম সন্তান সারদার আরও একটি ভগিনী ও পাঁচটি ভাই কালক্রমে জন্মগ্রহণ করে। ভগ্নীর নাম কাদম্বিনী এবং ভ্রাতাদের নাম প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ। কাদম্বিনীর সঙ্গে বিবাহ হয় কোকন্দ গ্রামের সুধারাম চক্রবর্তীর। অল্পবয়সে অপুত্রক অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় ভ্রাতা উমেশচন্দ্রও বিবাহের পূর্বেই আঠার-উনিশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ ডাক্তারী বিদ্যাশিক্ষার পর স্ত্রী সুরবালা (যিনি রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে ও সারদাদেবীর জীবনীগ্রন্থে 'পাগলীমামী' নামে পরিচিতা) এবং একমাত্র কন্যা রাধারানীকে রেখে পরলোকগমন করেন। প্রসন্নকুমার, কালীকুমার ও বরদাপ্রসাদ বিবাহাদির পর দীর্ঘকাল সংসার-জীবন যাপন করেন। সারদাদেবীর পরবর্তী জীবনে সুরবালা, রাধারানী (রাধু), প্রসন্নকুমার, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ এবং তাদের সন্তানদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

রামচন্দ্রের সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। মাত্র কয়েক বিঘা নিষ্কর জমিতে ধানচাষ কিন্তু সম্বৎসরের প্রয়োজনের তুলনায় তার আয় অপ্রতুল। তাই তিনি কিছু তুলার চাষ করতেন এবং যাজনাদির দ্বারা কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। শ্যামাসুন্দরী কৃষিকাজেও স্বামীকে সাহায্য করতেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু সারদাকে ক্ষেতে শুইয়ে রেখে নিজে তুলা সংগ্রহ করতেন। একটু বড় হবার পর সারদাও মা-বাবাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে শুরু করেন। মাতা ও কন্যা তুলা থেকে পৈতা তৈরী করে গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বাড়িতে বিক্রী করতেন। আবার একইসঙ্গে ছোট ছোট ভাইবোনগুলির ভারও গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীকালে বাল্যস্মৃতি রোমন্থন করে সারদাদেবী বলেছিলেন, "ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম, আমোদর নদই ছিল আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান সেরে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল। ছেলেবেলায় গলা সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি; ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল, ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।" নিজের বাল্যশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উক্তি, "ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ (জ্ঞাতিভাই)—ওরা সব পাঠশালায় যেত।

ওদের সঙ্গে কখনও কখনও যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম।" পরে আবার অবশ্য তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভের কিছু সুযোগ পেয়েছিলেনঃ "কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণপরিচয়' একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিয়ে বললে, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কি না, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি বই কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি আছি। ভব মুখুজ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত তাই খুব করে দিতাম।" এইভাবে মোটামুটি শিক্ষালাভ করে পরবর্তীকালে রামায়ণ ইত্যাদি পাঠ করতে পারতেন, একটু আধটু চিঠিও লিখতে পারতেন, তবে স্বহস্তে লেখা তাঁর চিঠি বিশেষ নেই। মুখে মুখে বলে অন্যের মারফৎ চিঠি-লেখার অভ্যাস তাঁর ছিল।

১২৭১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে) জয়রামবাটী ও সন্নিহিত অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সারদাদেবীব বয়স তখন এগারো বছর—বিবাহের পর পিত্রালয়ে আছেন। রামচন্দ্রের কিছু সঞ্চিত ধান ছিল। দরিদ্রের মর্মস্পর্শী অবস্থায় বিচলিত রামচন্দ্র নিজের ভবিষ্যতের কথা না চিন্তা করেই বুভুক্ষু গ্রামবাসীদের জন্য অন্নসত্র খুলে দেন। সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে সারদাদেবী বলেছিলেন, "একবার সেখানে কি দুর্ভিক্ষই না লাগল—কত লোক খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত। আমাদের আগের বছরের ধান মরাই বাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন, 'বাড়ির সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে। এক একদিন এমন এত লোক এসে পড়ত যে খিচুড়িতে কুলত না। তখনই আবার চড়ানো হত। আর সেই গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত শীগ্‌গির জুড়াবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম। আহা! ক্ষিধের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে।

"একদিন একটি বাগদী না ডোমের মেয়ে এসেছে—মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল তাই খেতে আরম্ভ করেছে! এত যে সকলে ডাকছে 'বাড়ির ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য মানছে না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ!"

॥ ২ ॥

একেবারে শৈশবকালেই কিছু না বুঝেই পতি নির্বাচন করেছিলেন সারদাদেবী। তাঁর মাতুলালয় ছিল শিহড়ে। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের (গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের) ভাগিনেয় হৃদয়রামের বাড়িও সেখানে। শিহড়ে শান্তিনাথ শিবের অধিষ্ঠান। তাঁর মন্দিরে বিভিন্ন সময়ে কীর্তন, যাত্রাগান প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান লেগে থাকত। কামারপুকুর থেকে যুবক গদাধর এসেছিলেন যাত্রা শুনতে আর ছোট্ট সারদাও গিয়েছিলেন জয়রামবাটীর প্রতিবেশী মহিলাদের সঙ্গে যাত্রার আসরে। শিশুর সঙ্গে কৌতুক করার ইচ্ছাতেই মহিলাদের মধ্যে কোন একজন তাঁর ক্রোড়ে উপবিষ্ট সারদার কাছে জানতে চান সেখানে উপবিষ্ট ছেলেদের মধ্যে কাকে তার পছন্দ, কাকে সে বিয়ে করতে চায়? শিশু সারদা নির্দ্বিধায় গদাধরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। উপস্থিত মহিলাদের সম্মিলিত হাস্যরোলের মধ্যে যে ঘটনাটি ঘটে সেটি সম্ভবত গদাধরের দৃষ্টি এড়ায়নি এবং তার মধ্যেই ছিল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত।

গদাধর চট্টোপাধ্যায় তখন দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ভবতারিণীর মন্দিরের পূজারী। কিন্তু অভিনব তাঁর পূজা—তা কোন লৌকিক নিয়মবদ্ধ নয়। তাঁর কাছে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠানের মূল্য সামান্যই। প্রস্তর নির্মিত দেবীমূর্তি তাঁর কাছে চিন্ময়ী মা, আর তিনি তাঁর একান্ত স্নেহের সন্তান। ছোট ছেলেটির মতই মার কাছে তাঁর নিত্য আব্দার—মা, দেখা দে। মন্দিরে, বাইরের প্রাঙ্গণে-উদ্যানে, নিজের বাসকক্ষে চলে তার নিরন্তর কান্নাঃ 'মা তুই কি সত্যই আছিস না প্রস্তরমূর্তি মাত্র।' মাটিতে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতে থাকেন, মা, মা মা,—যেন মাতৃহারা শিশু। কিন্তু কই—তাঁর আহ্বানে কেউ তো সাড়া দেয় না। দিনের পর দিন কেটে যায়, তাঁর প্রার্থনা তো পূরণ হয় না! কই তিনি ব্যাকুল সন্তানের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর দুঃখমোচন করছেন? তাহলে এই মাতৃমূর্তি কি নিছক শিল্পীর ভাবকল্পনা মাত্র!

আহার নিদ্রা ভুলে গদাধর নিরন্তর অন্বেষণ করে চলেছেন একটি সত্যের—জগদম্বা কি প্রত্যক্ষ, না মানুষের কল্পনামাত্র। অবশেষে স্থির করলেন, আর নয়, মায়ের চরণেই নিজের জীবন উৎসর্গ করবেন। মাতৃমন্দিরের মধ্যেই থাকত পশু বলিদানের খড়্গ। সেই খড়্গের দ্বারা নিজের জীবননাশের প্রচেষ্টার মুহূর্তের ঘটনার তিনি নিজেই বিবরণ দিয়েছেন, "...সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম... ঘরদ্বার মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর

কিছু নাই। আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন-জ্যোতিঃ সমুদ্র। যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তাহার উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে একেবারে কোথায় তলাইয়া দিল। হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।

"তাহার পর কি হইয়াছে, কোন দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মায়ের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।"

তারপর থেকে গদাধরের পার্থিব-চেতনা প্রায়শঃ লুপ্ত। মন সর্বদাই উর্ধ্বমুখী। রাসমণির কর্মচারীরা তাঁর জামাতা মথুরনাথের কাছে নালিশ জানাল, ছোট ভটচাজ পাগল হয়ে গেছেন, মথুরনাথ কিন্তু নির্বিকার—রানীর মনেও কোন মালিন্য নেই কারণ গদাধরের বাইরের পরিচয় যাই হোক না কেন তাঁরা চিনেছেন তাঁর সাধক-সত্তাকে—যা সচরাচর সকলের চোখে পড়ে না।

এদিকে সংবাদ পৌঁছল কামারপুকুরে। গ্রাম্য প্রতিবেশীরা তাদের জ্ঞানবুদ্ধিমত গদাধর-জননী চন্দ্রমণিকে নানা পরামর্শ দিতে শুরু করল।কেউ বলল, ওটা মৃগী রোগ, কারও মতে কোন দুষ্টগ্রহ ভর করেছে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পরামর্শ দেয় ঃ চিকিৎসা করাও, ওঝা ডাকো। বিভ্রান্ত চন্দ্রমণি কর্তব্য স্থির করতে পারছেন না। স্বামী নেই, জ্যেষ্ঠপুত্রও লোকান্তরিত, তিনি নিজে একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক—অর্থেরও অভাব। অবশেষে মধ্যমপুত্র রামকুমারকে পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরে, গদাধরকে ফিরিয়ে আনতে। মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে গদাধর ফিরে গেলেন কামারপুকুরে। সেখানে শুরু হল তাঁর চিকিৎসা—টোটকা—ঝাড়ফুঁকও বাদ গেল না। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হল না—ফল দেখা দিল অন্যভাবে।

বাল্যের সেই লীলাভূমি—সেই উদার, আদিগন্ত মাঠ, সেই পরিচিত বৃক্ষশ্রেণী—আমবাগান, সেই বাল্যবন্ধুরা। গদাধর যেন আবার তাঁর শৈশবকে খুঁজে পেলেন। উন্মুক্ত প্রকৃতির সংস্পর্শে তাঁর আধ্যাত্মিক উদ্দামতা কিছুটা প্রশমিত হল। সুযোগ বুঝে চন্দ্রমণি পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। চারদিকে খোঁজ চলতে লাগল উপযুক্ত পাত্রীর। প্রথম দিকে গদাধর মায়ের এই প্রচেষ্টার কথা কিছু জানতে পারেননি—চন্দ্রমণি ইচ্ছা করেই তাঁকে এ সম্পর্কে কিছু জানতে দেননি কারণ তাঁর ভয় ছিল, গদাধর হয়তো সম্মতি দেবে না—নানা বাধার সৃষ্টি করবে, হয়তো তাঁর তথাকথিত অসুস্থতাও বেড়ে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথাটা একদিন গদাধরের কানেও পৌঁছল। আপত্তি দূরে থাক তিনি কিন্তু আনন্দিতই হলেন এবং স্বয়ং পাত্রীর সন্ধানও বলে দিলেন, "জয়রামবাটীর

রাম মুখুজ্যের বাড়িতে দেখ গে, বিয়ের কনে সেখানে কুটো বাঁধা আছে"—সেই যাত্রা আসরের শিশুকন্যাটি! সুতরাং পাত্রী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবেই নিষ্পন্ন হল এবং অবিলম্বে বিবাহের দিনও স্থির হয়ে গেল। ১২৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখের শেষ দিকে কামারপুকুর নিবাসী ঁক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র (৪র্থ সন্তান) ২৪ বৎসর বয়স্ক গদাধরের সঙ্গে জয়রামবাটী নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা ছয় বৎসর বয়স্কা সারদামণির শুভবিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। সমকালীন রীতি অনুযায়ী পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে তিনশো টাকা পণ দিলেন।

বিবাহের কাল সম্পর্কে সারদাদেবী পরে বলেছিলেন, "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশদিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। ধর্মদাস লাহা এসে বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে?' সূয্যুর বাপ (ঈশ্বর মুখোপাধ্যায়) কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিলেন।"

বিবাহের সময় সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য চন্দ্রমণি লাহাবাবুদের বাড়ি থেকে কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার এনে বধূকে সাজিয়ে ছিলেন। বিবাহের উৎসব সাঙ্গ হবার পর এখন আবার সেগুলি ফেরৎ দেওয়া প্রয়োজন কিন্তু চন্দ্রমণির মাতৃহৃদয় বধূর গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নেবার মত নির্মমতা দেখাতে পারছিলেন না। গদাধর মায়ের মর্মবেদনা ও সমস্যার কথা বুঝতে পেরে ঘুমন্ত বধূর গা থেকে একে একে সেগুলি অতি সন্তর্পণে খুলে নেন। নিদ্রাভঙ্গের পর নিরাভরণ সাবদাদেবী গয়নার খোঁজ করতে চন্দ্রমণি তাঁকে বললেন, "মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল ভাল গয়না পরে কত দেবে।" বালিকা এই প্রবোধবাক্যে শান্ত হলেও সেইদিনই তাঁর খুড়া কামারপুকুরে এসে উপস্থিত। ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অলঙ্কারহীন দেখে ক্রোধভরে তাঁকে তখনই কোলে তুলে নিয়ে তিনি জয়রামবাটী ফিরে যান।

সারদাদেবী দ্বিতীয়বার কামারপুকুরে আসেন ১২৬৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৬০ নভেম্বর/ডিসেম্বর)। পরে ঐ সময়ের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, "আমার সাত বছর বয়সের সময় ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) জয়রামবাটী এসেছিলেন। বিয়ের পর জোড়ে যায় না?" গদাধর কয়েকদিন জয়রামবাটীতে কাটিয়ে বধূসহ কামারপুকুরে ফিরে যান। কিছুদিন পরে গদাধর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সারদাদেবীও চলে যান পিত্রালয়ে।

ইং ১৮৬৬-র মে মাসে সারদাদেবী তৃতীয়বার কামারপুকুরে আসেন। পরে তিনি বলেছেন, "তের বছর বয়সের সময় যাত্রার দিন হয়, কামারপুকুরে যাই। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে।" নির্জন গ্রাম্যকুটীরে একাকী কিশোরীবধূ। একটু দূরে হালদারপুকুর—সেখানে স্নান করার জন্য যেতে হয়, স্বভাবতই ভয় পেতেন,

ভাবতেন, "নতুন বৌ, একলা কি করে নাইতে যাব?" এই চিন্তা করতে করতেই দেখতে পেলেন আটটি মেয়ে হালদারপুকুরের দিকে স্নানে চলেছে। আশ্বস্ত হয়ে তিনিও তাদের সঙ্গেই স্নানে গেলেন। বিনাবাক্যে তারা সারদাকে মাঝখানে নিয়ে সামনে চারজন ও পিছনে চারজন পুকুরে গিয়ে স্নান সেরে আবার আগের মতই তারা সারদাদেবীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলে গেল। এইভাবে যে এক মাস সেবার তিনি কামারপুকুরে ছিলেন প্রতিদিনই তাদের সঙ্গিনীরূপে পেয়েছেন কিন্তু কোনদিনই জানতে পারেননি, তারা কারা, কোথায় থাকে। কয়েকমাস পরে ইংরেজি ১৮৬৬-৬৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে তিনি আবার যখন কামারপুকুরে আসেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও জননী চন্দ্রমণি উভয়েই দক্ষিণেশ্বরে। সারদাদেবীর কথায় "আবার পাঁচ-ছয় মাস পরে গিয়ে কামারপুকুরে দেড়মাস থাকি।... কামারপুকুরে আমার ভাসুর, জা এঁরা সব ছিলেন।"

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ (গদাধর এখন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ) যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়রামকে নিয়ে কামারপুকুরে আসেন তখন সারদাদেবীও পঞ্চমবার শ্বশুরালয়ে আগমন করেন এবং দীর্ঘ সাত মাস সেখানে অবস্থান করেন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষালাভ কালের স্মৃতিচারণ করে সারদাদেবী বলেছেন, "হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে, ঐ কাল হ'তে সর্বদা এইরূপ অনুভব করতুম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর পূর্ণ থাকত তা' বলে বোঝাবার নয়।"

সারদাদেবী ভৈরবীকে শাশুড়ীর মতই শ্রদ্ধা করতেন কিন্তু তাঁকে ভয়ও পেতেন যথেষ্ট। ভৈরবী মাঝে মাঝে রান্না করতেন অতিরিক্ত লঙ্কার ঝাল দিয়ে, যা সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠত না। রামলালের মা ও সারদাদেবীকে সেই ব্যঞ্জন পরিবেশন করে তিনি তাঁদের মতামত জানতে চাইলে রামলালের মা কুণ্ঠাহীন ও সরলভাবেই ঝালের কথা বলতেন কিন্তু ঝালের প্রচণ্ডতায় চোখে জল ঝরলেও সারদাদেবী বলতেন, 'বেশ ভাল হয়েছে।' পরবর্তীকালে সারদাদেবী সকৌতুকে সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

একদিন ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ-বেশে সজ্জিত করলেন—চন্দনচর্চিত দেহ, কণ্ঠে ও বাহুতে পুষ্পমাল্য। সেই গৌরাঙ্গরূপ কেমন হয়েছে সেটা জানার জন্য টেনে আনলেন সারদাদেবীকে। সারদাদেবী স্বভাবতই লজ্জাশীলা। স্বামী সম্পর্কে শাশুড়িস্থানীয়া কারও কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ কবা তাঁর পক্ষে অসম্ভব তদুপরি ছিল ভৈরবী সম্পর্কে তাঁর ভীতি। সুতরাং তিনি সংক্ষেপে 'ভাল হয়েছে' বলেই সে যাত্রা নিষ্কৃতি পান।

এই সময়ে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃদয়রামের সঙ্গে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রচণ্ড কলহ, এমনকি হাতাহাতিও হয়। অবশেষে একদিন সকলের অগোচরে ভৈরবী নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। সাত মাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ফিরে গেলে সারদাদেবী জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করেন।

॥ ৩ ॥

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনায় নিমগ্ন হলেন। আহার নিদ্রা নেই, এমনকি আচ্ছাদন সম্পর্কেও কোন হুঁশ নেই। জয়রামবাটীতে পল্লবিত হয়ে সংবাদ পৌঁছল। রাম মুখুজ্যের জামাই সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। পল্লীবাসীদের সহানুভূতির যন্ত্রণায় সারদাদেবী স্থির করলেন, "সব্বাই এ রকম বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কি রকম আছেন (১৮৭২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে)। কি এক যোগ উপলক্ষে আমাদের দেশ থেকে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে আসছিল। ...আমি একজনকে বললুম, 'আমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখতে যাব কেমন আছেন?' সে বাবাকে সব বলে দিল। আমি তো আর বাবাকে কিছু বলতে পারিনি, লজ্জায়, ভয়ে। বাবা বল্লেন, 'যাবে, বেশ তো।' তিনি আমাদের সঙ্গে এলেন। পথে জ্বর হল। খুব জ্বর, কোন জ্ঞান নেই। রাতে স্বপ্ন দেখি কি, একটি কালো কুচকুচে মেয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। বললে, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' আমি বললুম, 'আমিও তাঁর ওখানে যাব। তুমি আমার কে হও?' সে বললে, 'আমি তোমার বোন। ভয় কি? সেরে যাবে।' পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। বাবা শেষে পালকী করলেন। রাত প্রায় ন'টার সময় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছুলুম। আমি একেবারে ঠাকুরঘরে গিয়ে উপস্থিত।... ঠাকুর দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ, বেশ করেছ।' বললেন, 'মাদুর পেতে দে রে।' ঘরেই মাদুর পেতে দিলেন। ঠাকুর বললেন, 'এখন কি আর আমার সেজোবাবু (মথুরানাথ) আছেন? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে। তখন কয়েক মাস হল মথুরবাবু মারা গেছেন। অক্ষয় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) তারও কয়েকমাস আগে মারা গেছে।... মথুরবাবু থাকলে কি আমাকে কুঁড়েঘরে বাস করতে হয়?... তিনি অট্টালিকায় রাখতেন। আমরা নবতের ঘরে যেতে চাইলুম। ঠাকুর বললেন, 'না না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে, এ ঘরেই থাক।' আমরা তাঁর ঘরেই শুলুম। একটি সঙ্গী মেয়ে আমার কাছে শুল। হৃদয় দু'ধামা না তিন ধামা মুড়ি আনলে, তখন সকলের খাওয়া হয়ে গেছে কি না! পরদিন ডাক্তার দেখালেন। কয়েকদিন পরে জ্বর সারতে নবতের ঘরে গেলুম। তখন আমার শাশুড়ী কুঠিঘর ছেড়ে নবতের ঘরে এসে রয়েছেন। কুঠিঘরের একটি কোঠা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অক্ষয় তাঁর ঐ কুঠিতেই মারা যায়। সে মারা যেতে মা-ঠাকরুণ কুঠিঘর ছেড়ে এলেন।"

সারদাদেবী বুঝলেন ঠাকুর সম্পর্কে যে সব গুজব তিনি শুনেছিলেন তা অতিরঞ্জিত। ঠিক স্বাভাবিক মানুষের মতই কোমল হৃদয়, স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ অথচ অনন্যসাধারণ সাধনার জীবনে অভ্যস্ত। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় সারদাদেবীর শিক্ষার ভার নিয়ে গৃহকর্ম, আত্মীয়স্বজনের প্রতি ব্যবহার, অপরের গৃহে ভব্যতা প্রভৃতি সম্পর্কে উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি এমনকি ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করতেন। সারদাদেবীর শিক্ষাজীবন পরিপূর্ণতর হয় এইকালেই। শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র মৌখিক উপদেশ দিয়েই নিশ্চিন্ত হতেন না, সংবাদ নিতেন, কিভাবে সেগুলি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হচ্ছে।

সারাদিন নহবতে কাটালেও রাত্রে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যায় স্থান লাভ করতেন। একদিন তিনি এই সময় সারদাদেবীকে প্রশ্ন করেন, 'কিগো, তুমি কি আমায় সংসার পথে টেনে নিতে এসেছ?' সারদাদেবী নির্দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "না, আমি তোমাকে সংসার পথে কেন টানতে যাব? তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।" অন্য একদিন স্বামীর পদসেবারত অবস্থায় তাঁকে সারদাদেবী প্রশ্ন করলেন, "আমাকে তোমার কি বলে মনে হয়?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এ শরীরের জন্ম দিয়েছেন ও এখন নহবতে বাস করছেন আর তিনি এখন আমার পদসেবা করছেন।"

অভিনব তাঁদের দাম্পত্যজীবন—কামগন্ধহীন, নিঃস্বার্থ প্রেমের চরমতম রূপ। স্বামী-স্ত্রী, গুরু-শিষ্যা—একাকার। পূর্ণ যৌবনসম্পন্ন অথচ দেহবোধহীন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় রাত্রিই অতিবাহিত হত বিনিদ্র অবস্থায়—কখনও সমাধিস্থ, কখনও অর্ধবাহ্যদশাগ্রস্ত। প্রথম প্রথম সমাধি দর্শনে অনভিজ্ঞ সারদা ভীত হয়ে পড়তেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সমাধিকালে তাঁর করণীয় কি হবে, সে সম্পর্কে অবহিত করেন। সুদীর্ঘ আট মাস কাল এইভাবেই উভয়ে এক শয্যায় রাত্রি যাপন করেছেন। যে ঊর্ধ্বলোকে শ্রীরামকৃষ্ণের মন বিচরণ করত, সারদাদেবীও সেই লোকে ক্রমশঃ পৌঁছেছেন। পরবর্তীকালে ভক্তদের কাছে সেই কালের কথা স্মরণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "ও যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমাকে আক্রমণ করত, তাহলে সংযমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কি না কে বলতে পারে? বিয়ের পর মাকে (জগদম্বাকে) ব্যাকুল হয়ে বলেছিলাম,'মা আমার পত্নীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে।' ওর সঙ্গে একত্র বাস করে এইকালে বুঝেছিলাম, মা সে-কথা সত্যসত্যই শুনেছিলেন।"

॥ ৪ ॥

১২৭৯ বঙ্গাব্দের ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ইংরেজি ৫ জুন, ১৮৭২।[১]

পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতার ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় স্বর্ণ-অক্ষরা দিন। সেদিন অমাবস্যা, ফলহারিণী কালীপূজা। মন্দিরে বিশেষ পূজা-ব্যবস্থা কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের ছোট্ট ঘরটিতে, সবার অলক্ষ্যে আর এক দেবীর বোধন। হৃদয়রাম পূজার কিছু কিছু ব্যবস্থা করে কালীমন্দিরে চলে গেলেন। দীনুপূজারী রাধাগোবিন্দের সেবাপূজা শেষ করে অবশিষ্ট আয়োজন সমাপ্তির পর বিদায় নিলেন—রাত্রি তখন ৯টা।

পূর্বেই সারদাদেবীকে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবার কথা জানিয়ে রেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ৯টার সময় তিনি উপস্থিত হলে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা শুরু করলেন। প্রথমে নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়ে তাঁকে দেবীর জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবেশনের আহ্বান জানালেন। মন্ত্রোচ্চারণ করে সমস্ত পূজা-দ্রব্য শোধন করে পূজা শুরু হল। মন্ত্র উচ্চারণ ও আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি দেখতে দেখতেই সারদাদেবী আবিষ্ট—অর্ধবাহ্যদশাগ্রস্ত। ইঙ্গিতমাত্রই তিনি পূজাপীঠে উপবেশনের পর মন্ত্রপূত কলসের জলসিঞ্চন করে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবী-অভিষেক সম্পন্ন করলেন—প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করলেন, "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর—এঁর শরীর মনকে পবিত্র করে এঁর মধ্যে আবির্ভূত হয়ে সর্বকল্যাণ সাধন কর।" পরে আপন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে ষোড়শোপচারে পূজা করে নিজের সাধনালব্ধ ফল জপমালা-সমেত দেবীকে সমর্পণ করে তার চরণে প্রণত হলেন। ভোগ নিবেদন করে সেই ভোগের কিয়দংশ দেবীমানবীর মুখে প্রদান করলেন। ধীরে ধীরে এক প্রশান্ত আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে সারদাদেবী সমাধিস্থ। অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হল। সেই নির্জন রুদ্ধ কক্ষে সমাধিস্থ পূজিতা দেবী শ্রীশ্রীমা ও পূজক শ্রীরামকৃষ্ণ। বাইরে নিস্তব্ধ অমারাত্রি—অনন্ত প্রবাহিনী গঙ্গার কুলকুল ধ্বনি। মধ্যরাত্র অতিক্রান্ত। সমাধিভঙ্গের পর অর্ধবাহ্যদশায় শ্রীরামকৃষ্ণ

১। স্বামী সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ অনুসারে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ইং ২৫ মে ১৮৭৩।

প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা শেষ করলেন ঃ

(সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো'অ'স্তু তে।)

দীর্ঘ সাধনার সমাপ্তি হল শ্রীরামকৃষ্ণের!

উত্তরকালে স্বামী অরূপানন্দের কাছে সারদাদেবী স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন। আমি তখন ষোল বছরে পড়েছি। [প্রকৃতপক্ষে সারদাদেবীর বয়স তখন উনিশ বছর। লীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী কুড়ি বছর। কোন জীবনীগ্রন্থেই ষোল বছরের উল্লেখ নেই।] রাত প্রায় ন'টায় আমাকে তাঁর ঘরে আনালেন। পূজার সব জোগাড়। ভাগনে সব জোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর চৌকীর উত্তর পাশে (গঙ্গাজলের) জালার পানে মুখ করে (পশ্চিম মুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমের দরজার কাছে বসেছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার ডান পাশে সব পূজার জিনিষ।"

স্বামী অরূপানন্দ—"পূজার সময় কি করলেন?"

সারদাদেবী—"আমি একটু পরেই বেহুঁশ হয়ে গেলাম। পূজার মধ্যে কি হয়েছে জানতে পারিনি।"

স্বামী অরূপানন্দ—"হুঁশ হতে তুমি কি করলে?"

সারদাদেবী—"আমি মনে মনে প্রণাম করলুম। পরে চলে এলুম।"

স্বামী অরূপানন্দ—"পূজার সময় আর কেউ ছিল?"

সারদাদেবী—"দীনু বলে একটি ছেলে, আমার ভাসুরপো হয়, মুকুন্দপুরের জ্ঞাতির ছেলে, ঠাকুরের কাছে থাকত। তিনি খুব ভালবাসতেন। সে সব ফুল, বেলপাতা যোগাড় করে এনে দিতে লাগল। হৃদয় সব ঠিকঠাক করে দিলে। পূজার সময় আর কেউ ছিল না। একা তিনি ছিলেন। পূজার শেষাশেষি হৃদয় এসেছিল।"

স্বামী অরূপানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীদেবীর কাছে শুনেছিলেন, মা তাঁকে বলেছিলেন, "পূজার প্রথমে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন, সিঁদুর দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন, পান মিষ্টি খাওয়ালেন।" কাপড় পরাবার কথায় লক্ষ্মীদেবী প্রশ্ন করেছিলেন, "তুমি তো অত লজ্জা কর। কাপড় কি করে পরালেন গো?' উত্তরে সারদাদেবী বলেছিলেন, "আমি তখন কি রকম যেন (অর্ধবাহ্যদশা) হয়ে গিছলুম।" স্বামী জ্ঞানানন্দের কাছেও সারদাদেবী এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন। জ্ঞানানন্দ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "মা, ঠাকুর যখন আপনার পায়ে ফুল দিতে গিয়ে হাত দিলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন, তখন সঙ্কোচ বোধ হল না?" উত্তরে সারদাদেবী বলেছিলেন, "না, আমি তখন সব দেখেছি বটে কিন্তু কিছু বলতে

কইতে ইচ্ছা ছিল না।"

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে (১২৮০ বঙ্গাব্দের) প্রথম দিকে সারদাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শম্ভুনাথ মল্লিক সেকালের বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রসাদবাবুকে দিয়ে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু তাতে বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। অগত্যা তিনি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে প্রথমে কামারপুকুর, ও পরে জয়রামবাটী ফিরে গেলেন।

১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মার্চ সারদাদেবীর পিতা রামচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তার মাত্র কয়েকমাস আগে (২৭ অগ্রহায়ণ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যু হয়। এই দুটি মৃত্যুর ঘটনা তাঁর মানসিক শান্তি বিশেষভাবে বিঘ্নিত করে। শান্তিলাভের আশায় এপ্রিল মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর শ্যামাসুন্দরীর সাংসারিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেরা তখনও নাবালক। পড়াশুনোর জন্য তাদের বিভিন্ন আত্মীয় বা অনাত্মীয় ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। শ্যামাসুন্দরী অন্যের ধান ঢেঁকিতে কুটে তার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কায়ক্লেশে সংসার পরিচালনা করতে থাকেন। মায়ের ব্যয়ভার লাঘব করার জন্যই সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসেন। দক্ষিণেশ্বরের জলবায়ু তখন অতি নিকৃষ্ট। বর্ষায় উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি নানাবিধ জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং শ্রীমাও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। এবারও শম্ভু মল্লিক যথাসাধ্য তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন কিন্তু যা একান্ত প্রয়োজন তা হল স্থান পরিবর্তন। প্রথম দিকে সারদাদেবী স্থান পরিবর্তনে রাজি হননি। এক বৎসর কাল রোগভোগের পর অগত্যা তাঁকে ফিরে যেতে হয় জয়রামবাটীতে। কিন্তু সেখানেও রোগ উপশম হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না উপরন্তু প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা দেখা দিল। শ্রীমা স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, "...দক্ষিণেশ্বরে এক বছর ছিলাম। শেষটায় অসুখ হতে দেশে যাই। শম্ভুবাবু ডাক্তার প্রসাদবাবুকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলেন।" অবশেষে জয়রামবাটীতে মুমূর্ষু অবস্থায় সিংহবাহিনী দেবীর কাছে হত্যা দিয়ে স্বপ্নে ওষুধ লাভ করে ক্রমশঃ সেরে ওঠেন।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি (১৬ ফাল্গুন ১২৮২ বঙ্গাব্দ) শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণিদেবী ইহলোক ত্যাগ করেন—সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে। তারপরই তিনি আক্রান্ত হন ম্যালেরিয়ায়। নানারকম গ্রাম্য চিকিৎসা চলতে লাগল, জয়রামবাটীর চার মাইল দূরবর্তী গ্রাম কয়াপাট মদনগঞ্জে গিয়ে শিবমন্দিরে প্লীহায় দাগ দেওয়া পর্যন্ত। এই প্লীহায় দাগ দেওয়া ছিল, একধরনের অতি যন্ত্রণাদায়ক গ্রাম্য চিকিৎসা। স্নানের পরে রোগীকে শুইয়ে

তিন-চাবজন লোক তাকে সবলে চেপে ধবে থাকত যাতে সেই দুর্বিষহ চিকিৎসা যন্ত্রণায সে ছুটে পালিযে যেতে না পাবে। তাবপব একজন জ্বলন্ত কুলকাঠ প্লীহাব অবস্থানেব জাযগায পেটেব চামডায ঘষত। চামডা পুডে গিযে বোগী দারুণ কষ্টে চিৎকাব শুরু কবত। শ্রীমা কিন্তু এই চিকিৎসাকালে কাউকে অঙ্গস্পর্শ কবতে দেননি—যন্ত্রণাসূচক কোন শব্দও কবেননি। নীববে সেই কষ্ট সহ্য কবেছেন।

ওই বছবই ৭ মার্চ (চৈত্র বাং ১২৮২) মাতৃদেবীব তিবোভাবে ব্যথিত শ্রীবামকৃষ্ণেব কথা স্মবণ কবে শ্রীমা তৃতীযবাব দক্ষিণেশ্বব আসেন। নহবতেব সঙ্কীর্ণ ঘবে তাঁব থাকাব অসুবিধাব কথা বিবেচনা কবে শ্রীবামকৃষ্ণভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায তাঁব জন্য একটি কুটীব নির্মাণেব উপযোগী কাঠ সবববাহেব প্রতিশ্রুতি দেন এবং বেলুড থেকে যথাসমযে কাঠ দক্ষিণেশ্ববেব গঙ্গাব ঘাটে এসে পৌঁছয। সাবদাদেবীব স্মৃতিচাবণ অনুসাবেঃ "একখানা গুঁডিকাঠ জোযাবে ভেসে গেল। হৃদয এসে 'তোমাব ভাগ্য মন্দ' এই সব বলে আমাকে বকলে। কাপ্তেন শুনে বললেন, 'যা লাগে আমি দেব'।" শম্ভুনাথ মল্লিক উদ্যোগী হযে ঘব তৈবী কবে দিলেন। এইখানে সাবদাদেবী কিছুকাল বাস কবেন। আকস্মিকভাবে একটি বাত শ্রীবামকৃষ্ণেবও এই ঘবে থাকতে হযেছিল। তখন বর্ষাকাল। একদিন তিনি সাবদাদেবীব সংবাদ নিতে সেখানে উপস্থিত হযেছেন—শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। বাধ্য হযে সেখানেই তিনি বাত্রিযাপন কবেন—পবদিন সকালে বৃষ্টি থামতে ফিবে গেলেন নিজেব কক্ষে। কিছুকাল এই কুটীবে বাস কবাব পব তাঁকে আবাব ফিবতে হল নহবতে। শ্রীবামকৃষ্ণেব অসুখ, তাঁব সেবাযত্ন, পথ্য বান্না কবাব জন্য তাঁকে ফিবে আসতে হয। সেবাব তাঁকে নহবতেব ঘবে ফিবিযে আনাব জন্য বিশেষ উদ্যোগী হযেছিলেন কাশী থেকে আগত একটি মেযে। পবে সেই মেযেটিব আব কোন খোঁজ পাওযা যাযনি। সাবদাদেবী বলেছেন, "কাশীতে গিযে সেই মেযেটিব অনেক খোঁজ কবেছিলাম, দেখা পাইনি।"

স্বামী অপূর্বানন্দ এই মেযেটি সম্পর্কে জানিযেছেন যে, তিনি যোগেন-মা'ব কাছে শুনেছেন, শ্রীমা পূর্বে সঙ্কোচবশতঃ কখনও মুখেব ঘোমটা খুলতেন না। এই মেযেটি একদিন বাত্রে ঠাকুবেব ঘবে তাঁকে নিযে গিযে তাঁব সামনে প্রথম মুখেব আববণ উন্মোচন কবে দেন। সে-বাত্রি তাঁবা উভযে শ্রীবামকৃষ্ণেব ঘবে অতিবাহিত কবেন। সাবাবাত শ্রীবামকৃষ্ণ নানা ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা কবেন—মেযেটি অনন্যচিত্তে তাঁব কথা শুনতে শুনতে এমনই তন্ময হযে যায যে কখন বাত্রি শেষ হযে সূর্যোদয হযেছে সে জ্ঞানও ছিল না।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দেব ২২ মে (বাং ১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩) শ্রীমা দক্ষিণেশ্ববে সাবিত্রীব্রত কবেন। ঐ বছব নভেম্ববে (কার্তিক – অগ্রহাযণ ১২৮৩) সাবদাদেবী আবাব জযবামবাটী ফিবে যান। ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দে সাবদা-জননী শ্যামাসুন্দবী

জয়রামবাটীতে নিজ গৃহে জগদ্ধাত্রীপূজা করেন এবং শ্রীমা তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই পূজার সূত্রপাতের সঙ্গে একটি অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। গ্রামের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবেশীর বাড়িতে কালীপূজার সময় প্রত্যেক গৃহ থেকে চাল সংগ্রহ করা হত। এই চাল দেওয়ার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। শ্যামাসুন্দরী প্রতি বছরের মত সেবারও অনেক আগে থেকেই চাল তৈরী করে রেখেছিলেন। কিন্তু সে বছর প্রতিবেশী নব মুখোপাধ্যায় গ্রাম্য দলাদলির জন্য শ্যামাসুন্দরী প্রদত্ত চাল ফেরৎ দিলেন। তখন সঙ্কট দেখা দিল সেই চাল নিয়ে। দেবীর জন্য সঙ্কল্পিত চাল অন্য কেউ খেতে পারেন না। ক্ষুব্ধ, বেদনাহত শ্যামাসুন্দরী রাত্রে স্বপ্ন দেখেন 'লালমুখী দেবী' দোরগোড়ায় পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন। শ্যামাসুন্দরীকে গা চাপড়ে তুলে তিনি অভয় দিয়ে বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব, তোমার ভাবনা কি?" শ্যামাসুন্দরী জানতে চাইলেন, তিনি কোন দেবী? স্বপ্নমূর্তি বললেন, "ওই যে গো, এর পরেই যার পূজা।" পরদিন শ্যামাসুন্দরী স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করে কন্যা সারদার কাছে জানতে চাইলেন দেবীর পরিচয়, "ওরে সারদা, লাল রঙ—পায়ের ওপর পা দিয়ে—ও কী ঠাকুর? জগদ্ধাত্রী?" সারদাদেবীর কাছে ইতিবাচক উত্তর পেয়ে তিনি বললেন, "আমি জগদ্ধাত্রীপূজা করব।" কিন্তু আরও তো চাল চাই। শ্যামাসুন্দরী বিশ্বাসদের বাড়ি থেকে দু'আড়া ধান আনলেন কিন্তু বৃষ্টি শুরু হল একনাগাড়ে—ধান শুকোবার দারুণ অসুবিধা—অবশেষে সে অসুবিধাও দূর হল দেবীর আশীর্বাদে—চারদিকে বৃষ্টির কামাই নেই অথচ শ্যামাসুন্দরীর ধান শুকোবার স্থানটিতে খটখটে রোদ। সব দিক থেকেই অনুকূলতা দেখা দিল। সব ব্যবস্থা শেষ করে পুত্র প্রসন্নকে পাঠালেন দক্ষিণেশ্বরে, শ্রীরামকৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানাতে। পূজার কথা শুনে খুশি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, বললেন, "এই আমার যাওয়া হল, যা, বেশ করে পূজা করগে, বেশ বেশ, তোদের ভাল হবে।" রীতিমত সমারোহ ও আনন্দের মধ্যেই পূজা সাঙ্গ হল। গ্রামসুদ্ধ লোককে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানোও বাদ গেল না।

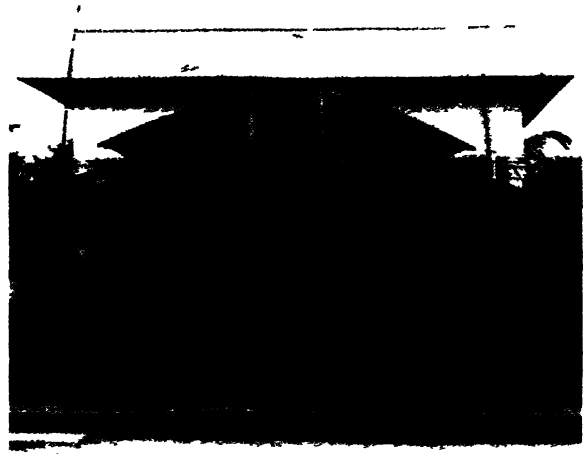
পরের বছর শ্যামাসুন্দরী যখন আবার পূজার তোড়জোড় করছেন তখন কন্যা সারদা বললেন, "একবার পূজা হল, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই।" রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, সেই দেবী জয়া-বিজয়া দুই সখী পরিবৃত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করছেন "তাহলে যাই?" সারদাদেবী জিজ্ঞাসা করলেন, "কে তোমরা?" স্বপ্নমূর্তি জবাব দিলেন, "আমি জগদ্ধাত্রী।" এই ঘটনা পরে উল্লেখ করে সারদাদেবী বলেছিলেন, "বল্লুম, না মা, তোমরা কোথায় যাবে?...তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নাই। সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজার সময় এখানে (জয়রামবাটীতে) আসি—বাসন-টাসন মাজতে হয় কি না! তখন তো আমাদের সংসারে লোকজন



বেলুড়ে শ্রীশ্রীমা



বিষ্ণুপুর স্টেশন—শ্রীশ্রীমা এখানে বসে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।



জয়রামবাটীতে সিংহবাহিনী মন্দির



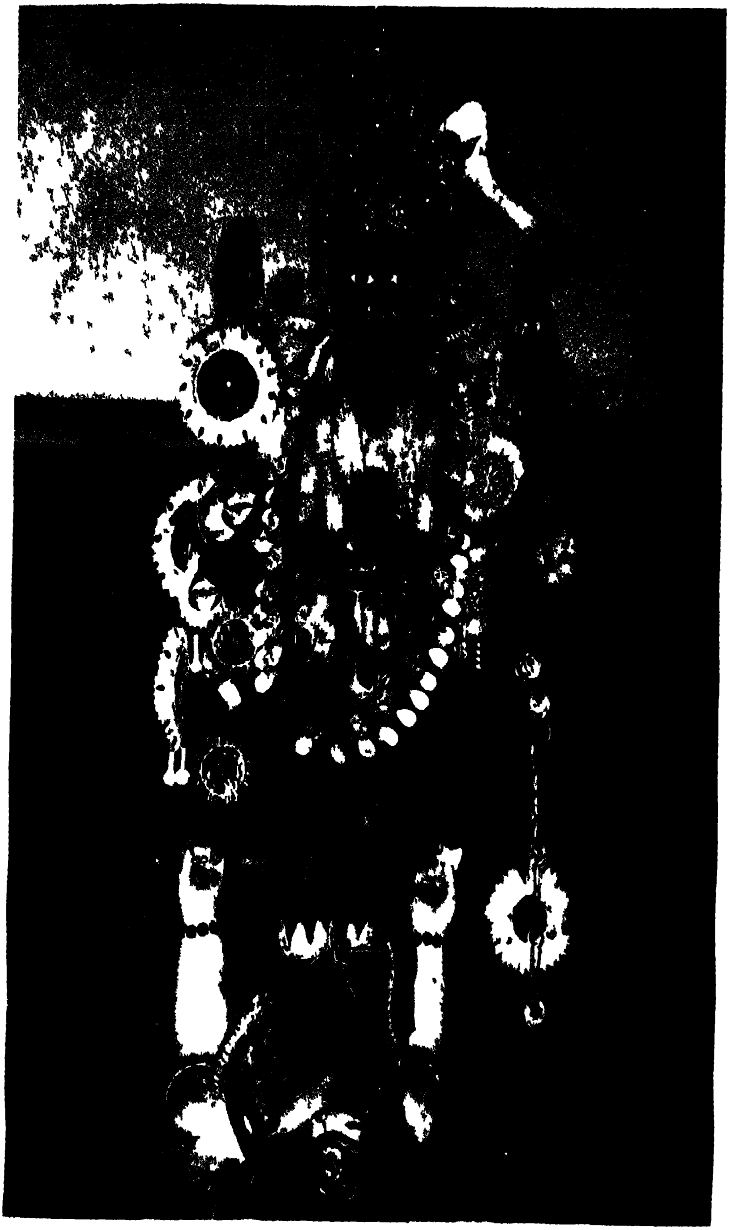
জয়রামবাটীতে সিংহবাহিনী দেবীর মন্দিরের বিগ্রহ



জয়রামবাটীর আমোদর নদের ঘাট



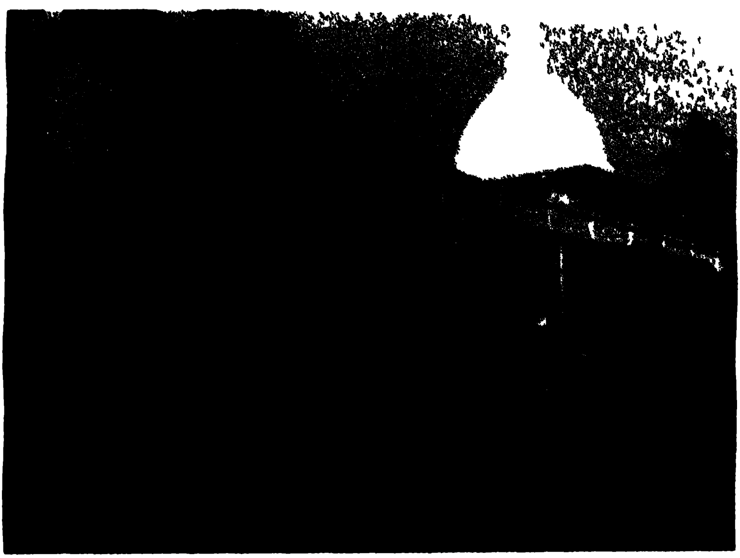
তেলেভোলার মন্দির



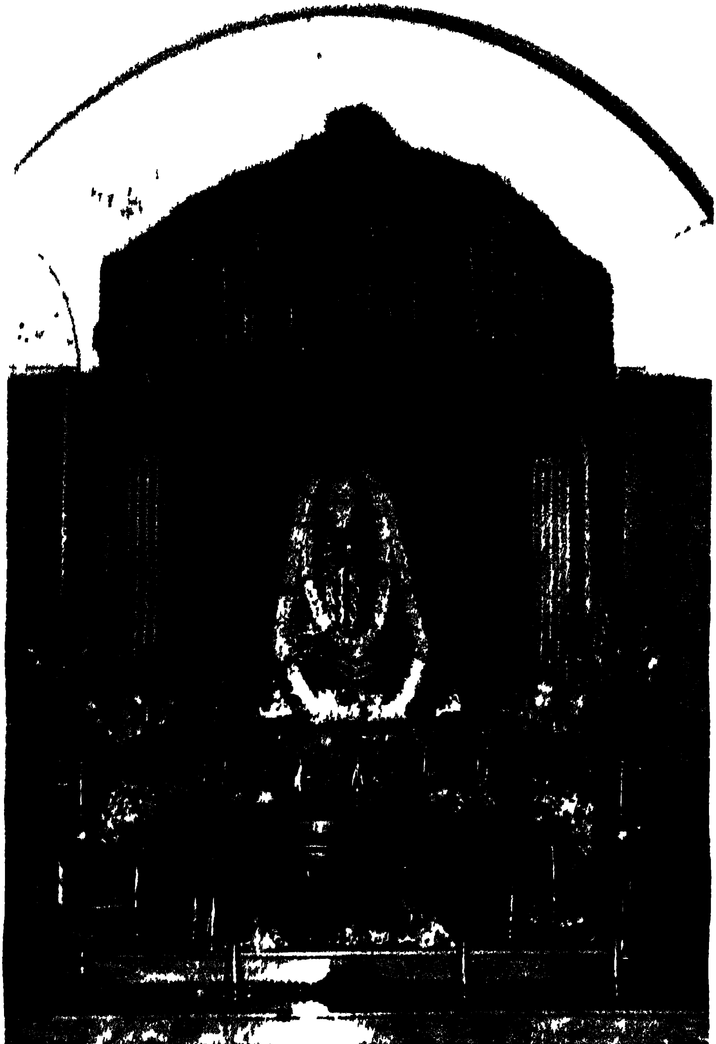
তেলেভোলার মা কালী



কোয়ালপাড়ার জগদম্বা আশ্রম



জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির



জয়রামবাটীর মন্দিরে শ্রীশ্রীমা সারদা



সিহড়ে শান্তিনাথ মন্দির

বেশি ছিল না, বাসন মাজতে আসতুম। তারপর যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) সব কাঠের বাসন করে দিলে। বল্লে, 'মা আর তোমায় বাসন মাজতে হবে না।' জগদ্ধাত্রীপূজার জমিও করে দিলে।"

অদ্যাবধি জয়রামবাটী ও সারদাপীঠে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রচলিত।

১৮৭৭-এর জগদ্ধাত্রীপূজার পর থেকে ১৮৮১-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারদাদেবীর অবস্থান বা কর্মের কোন প্রামাণ্য সংবাদ পাওয়া যায় না। এর মধ্যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন কিনা তা-ও জানার উপায় নেই—স্বয়ং সারদাদেবীও এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি। তাই প্রামাণিকভাবে ১৮৮১-র ফেব্রুয়ারি-মার্চকেই চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের সময় বলে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রায় চার বৎসরের মধ্যে সারদাদেবী কখনও দক্ষিণেশ্বরে পদার্পণ করেননি, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সারদাদেবী স্মৃতিচারণ করে বার বার দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের কথা বলেছেন কিন্তু তাঁর পক্ষে সাল তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব ছিল না। অনুমান করা যেতে পারে এই কালের মধ্যে অন্তত পক্ষে একবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন এবং পথে সেই সুপরিচিত 'ডাকাতবাবা'র ঘটনাটি ঘটে যার কথা তিনি অনেক ভক্তের কাছেই উল্লেখ করেছেন। তেলোভেলোর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ এবং তাদের আশ্রয়ে রাত্রিযাপন করে পরদিন তাদেরই সাহায্যে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান। প্রত্যেক জীবনীকারই গুরুত্ব সহকারে ঘটনার বর্ণনা করলেও কেউ সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি এবং সারদাদেবীর স্মৃতিচারণ থেকে কালের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তবে সেই সময় তাঁর সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী ছিলেন একথা তিনি অবশ্য বলেছেন এবং সেই সূত্র ধরে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য ঘটনাটিকে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের (১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে) ঘটনা বলে অনুমান করেছেন কারণ লক্ষ্মীদেবী ১৪ বছর বয়সে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন এবং ১২৮৪-র মাঘ মাসেই তাঁর চোদ্দ বছর পূর্ণ হয়। ঘটনাটি অবশ্যই শীতকালে ঘটেছিল কারণ সারদাদেবী ক্ষেত থেকে কলাইশুঁটি তোলার কথা মনে রেখেছিলেন।

এই ডাকাতবৃত্তান্ত একটু সুবিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। সারদাদেবীর কথা অনুযায়ী সেবার তিনি পল্লীর কয়েকজন বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর আসছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মীদেবী ও ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম। কামারপুকুর থেকে আরামবাগ—সাড়ে চার ক্রোশ পথ শ্রীমা সহজেই অতিক্রম করলেন। আরামবাগেই রাত্রিযাপনের কথা কিন্তু তখনও যথেষ্ট সময় রয়েছে দেখে তাঁর সঙ্গিনীরা স্থির করলেন সেইদিনই তারকেশ্বর পর্যন্ত আরও পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হবার পর সারদাদেবী ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অগত্যা তিনি সঙ্গিনীদের অগ্রসর হবার পরামর্শ

দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। ক্রমশঃ তিনি এত পিছিয়ে পড়লেন যে শিবরাম, লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। তখন তিনি তেলোভেলোর মাঠে—ডাকাতের মাঠ বলে যার দুর্নাম। সেই সুদীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রমের আগেই সূর্যাস্ত হল। ক্রমশঃ গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সন্ত্রস্ত শ্রীমা যতদূর সম্ভব দ্রুত এগোতে লাগলেন কিন্তু অন্ধকার ভেদ করে অকস্মাৎ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল এক ভীষণকায় বলিষ্ঠ পুরুষ মূর্তি—হাতে লোহার বালা, লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। শ্রীমা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটি কর্কশকণ্ঠে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল—কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাবে ইত্যাদি নানা বৃত্তান্ত। সারদাদেবী ভীত হলেও ধীর ভাবেই লোকটিকে পিতা সম্বোধন করে বললেন, "বাবা সঙ্গীরা আমায় ফেলে গেছে, আমি পথ হারিয়েছি; তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন, আমি তাঁর কাছেই যাচ্ছি।" এমন সময় লোকটির পিছন থেকে একটি স্ত্রীলোক সেখানে উপস্থিত হল। সারদাদেবী বুঝতে পারলেন স্ত্রীলোকটি পুরুষটিরই স্ত্রী। তিনি তার হাত ধরে বললেন, "মা আমি তোমার মেয়ে সারদা, কী বিপদেই পড়েছিলুম মা, যদি বাবা আর তুমি না এসে পড়তে!"

মাতৃসম্বোধনে বিহ্বল নিঃসন্তান স্ত্রীলোকটি সাদরে তাঁকে বুকে টেনে নিল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী তেলোভেলোর গ্রামের একটি দোকানে পৌঁছল—সেখানে মুড়ি সংগ্রহ করে রাত্রে আহারের ব্যবস্থা হল। তারপর সেই বাগদিনী ডাকাত-পত্নী নিজের কাপড় বিছিয়ে সারদাদেবীর শয়নের ব্যবস্থা করল এবং ডাকাত সর্দার লাঠি হাতে দুয়ারে জেগে সারারাত পাহারায় রইল।

পরদিন ভোরবেলা বাগদি-দম্পতির সঙ্গে শ্রীমা যাত্রা শুরু করে প্রায় দ্বিপ্রহরে তারকেশ্বরের চটিতে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হন। প্রান্তর অতিক্রমকালে বাগদি পুরুষটি পাশের ক্ষেত থেকে কলাইশুঁটি তুলে এনে সারদাদেবীকে দিল—তিনিও তাদের প্রীতির জন্য মুখ না ধুয়েই সেগুলি খেতে খেতে চলতে লাগলেন। দীর্ঘ পথ—চলার ক্লান্তি দূর করার জন্য পত্নীর আদেশে ডাকাত সর্দার কৃষ্ণযাত্রার গান শোনাতে লাগল। একসময়ে সে যাত্রাদলেও ছিল—তাই কণ্ঠের কর্কশতার অন্তরালে মাধুর্যের অভাব ছিল না। [১]

১। ঘটনাটি এখানে সন্নিবিষ্ট হলেও এর প্রকৃত ঘটনাকাল নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপাব। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য এটিকে ১৮৭৮-এর ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন—শ্রীমা বার বার বলেছেন লক্ষ্মীদেবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। প্রামাণ্য সূত্র অনুযায়ী লক্ষ্মীদেবীর প্রথম দক্ষিণেশ্বর আগমন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে, সেবার তাঁদের সঙ্গে সারদা-জননী শ্যামাসুন্দরীও ছিলেন। নিজের কন্যাকে বিপদসঙ্কুল স্থানে পরিত্যাগ করে নিজে এগিয়ে যাবেন এবং সারারাত্রি (পরদিন দ্বিপ্রহর পর্যন্ত) তার অন্বেষণের ব্যবস্থা করবেন না, এটা অকল্পনীয়। সারদাদেবী অবশ্য কোথাও জননীর উপস্থিতির কথা বলেননি। ঘটনাটি ১৮৭৮ সালেই ঘটা সম্ভব—তবে লক্ষ্মীদেবীর উপস্থিতি সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যায়।

এই ঘটনার একটি প্রাসঙ্গিক দিক শ্রীআশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। সারদাদেবী তাঁর একজন ভক্তের কাছে ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "লোকটা জাতে বাগদি, ডাকাতের মতো রুক্ষ কথায় জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কে?' আর আমার পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।" ভক্তটি প্রশ্ন করল, 'ডাকাত আপনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছিল?' সারদাদেবী উত্তরে বলেছিলেন,"পরে বলেছিল, কালীরূপে নাকি দেখেছিল।" ভক্তের প্রশ্ন; 'তাহলে আপনি তাঁকে কালীরূপে দেখা দিয়েছিলেন। লুকোবেন না মা, বলুন।' শ্রীমা কিন্তু এই ধরনের অলৌকিকতার ধার দিয়ে যাননি, বললেন,"আমি কেন দেখাতে যাব? সে বললে, সে দেখেছে।" ভক্তঃ 'তাহলেই হল—আপনি দেখিয়েছিলেন।' সহাস্যে সারদাদেবী উত্তর দিয়েছিলেন,"তা তুমি যাই বল না কেন?" অর্থাৎ অন্যে তাঁর উপর অলৌকিকতার দায় চাপাবার চেষ্টা করলেও তিনি নিজে তা মেনে নেননি।

জীবনীকারদের বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীমায়ের প্রমাণসিদ্ধ চতুর্থবার দক্ষিণেশ্বর আগমন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে (যদিও সকলেই স্বীকার করেছেন এর পূর্বেই হয়ত তিনি এসে থাকতে পারেন)—সঙ্গে লক্ষ্মীদেবী, মাতা শ্যামাসুন্দরী, ভ্রাতা প্রসন্নকুমার ছাড়া আরও কয়েকজন। প্রসন্নর কলকাতার বাসায় রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে তিনি ও অন্যান্য সকলে দক্ষিণেশ্বরে যান। সারদাদেবীর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হতেই, "হৃদয় কি ভেবে বলতে থাকে, 'কেন এসেছে? কি জন্যে এসেছে? এখানে কি?' এই সব বলে তাদের অশ্রদ্ধা করে। হৃদয় শিওড়ের লোক, আমার মা [শ্যামাসুন্দরী]-ও শিওড়ের মেয়ে—কাজে হৃদয় মাকে আদৌ মান্য করলে না। মা বললেন, 'চল দেশে ফিরে যাই। এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব।' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া হাঁ না কিছুই বলেননি। আমরা সেইদিনই চলে এলাম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিল। আমি মনে মনে মা কালীকে বললাম, 'মা যদি কোন দিন আনাও তো আসব'।"

মাত্র দু'তিন মাস পরেই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃদয়রামকে দক্ষিণেশ্বর থেকে চিরবিদায় নিতে হয়। শ্রীমায়ের ভাষায়, "তারপর হৃদয় ওখান থেকে চলে গেল, ত্রৈলোক্যবাবুর মেয়ের পায়ে ফুল দিয়ে। মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যবাবুর বালিকা কন্যাকে হৃদয়রাম কুমারী পূজা করতে চেয়েছিলেন, তা থেকেই দেখা দিল বিপত্তি। তিনি বিতাড়িত হবার পর রামলাল স্থায়ীভাবে কালীঘরের স্থায়ী পূজারী নিযুক্ত হলেন।" মায়ের কথায়, "[রামলাল] পূজারী হয়ে ভাবলে, 'আর কি এবার আমি কালীর পূজারী হয়েছি।' সে ঠাকুরের অত খোঁজ-খবর নিত না। উনি ভাবটাব হয়ে হয়ত পড়ে থাকতেন। এদিকে মা কালীর প্রসাদ শুকনো হয়ে

থাকত। তখন অন্য কেউ নেই। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ আমাকে আসবার জন্যে খবর দিতে লাগলেন। ও দেশের যে আসত তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্যে। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।' ঠাকুরের এই সব সংবাদ পেয়ে আমি শেষে আসলুম [১৮৮২-র মাঘ বা ফাল্গুন মাসে], এক বছর আসিনি।" সুতরাং সারদাদেবীর পঞ্চমবার দক্ষিণেশ্বর আগমন প্রামাণ্যভাবে ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারি-মার্চে। কিন্তু সেবার দক্ষিণেশ্বরে কতদিন ছিলেন এবং কবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন সে সংবাদ জানা যায়নি।

সারদাদেবী ষষ্ঠবার দক্ষিণেশ্বর আসেন ১৮৮৪-র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে (বাং ১২৯০, মাঘ)। দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে জয়রামবাটী পরিত্যাগ এবং দক্ষিণেশ্বরের উপস্থিতির মধ্যবর্তীকালে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ভাবের ঘোরে রেলিঙের উপর পড়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বামহস্তের অস্থির স্থানচ্যুতি ঘটে। সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হয়ে কাপড়ের পুঁটুলিটি রেখে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'কবে রওনা হয়েছ?' সারদাদেবীর উত্তরে যখন জানতে পারলেন তাঁর যাত্রার দিন ছিল বৃহস্পতিবার, তখনই বলে উঠলেন, "তুমি এই বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলে আমার হাত ভেঙেছে—যাও যাও যাত্রা বদলে এসগে।" শ্রীমা সেই দিনই প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলে শ্রীরামকৃষ্ণ বাধা দিয়ে বলেন, 'আজ থাক, কাল যেও।' পরদিনই তিনি যাত্রা বদল করার জন্য দেশে ফিরে যান কিন্তু যাত্রা বদল করে অনতিবিলম্বে ফিরেছিলেন কি না সে সংবাদ জানা যায়নি; কারণ তাঁর পরবর্তী দক্ষিণেশ্বর আগমনের স্বীকৃত সংবাদ পাওয়া যায় ১৮৮৫-র মার্চ মাসে (বাং ১২৯১, ফাল্গুন)। সেবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহে যোগদান করে কামারপুকুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসেন। মধ্যবর্তীকালে সঙ্গীর অভাবের জন্যই যে তাঁর আসা সম্ভব হয়নি, সে কথা জানিয়ে নিকুঞ্জদেবীকে বলেছিলেন, "বৌমা সেবার যখন নয় মাস আসিনি বড় কষ্ট হয়েছিল।"

সারদাদেবী বলেছিলেন 'ন-মাস' কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৩ মাস পরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে সেবার এসেছিলেন। তাহলে কি মধ্যবর্তীকালে যাত্রা বদল করে কয়েকদিনের জন্য একবার এসেছিলেন? অবশ্য সে কথার কোন প্রমাণসূত্র নেই।

দক্ষিণেশ্বরে এই শেষ বার বাসকালে সারদাদেবীর জীবনে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, তবে সেগুলির সাল তারিখ অনিশ্চিত। পরবর্তীকালের সারদাদেবীর স্মৃতিচারণ থেকে জানতে পারা যায় এগুলির কথা।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমায়ের জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখে দেন। সারদাদেবী অনুরূপ কৃপার জন্য লক্ষ্মীদেবীকেও তাঁর কাছে পাঠান। তার আগেই উভয়েই কামারপুকুরে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সে কথা জানার পরও লক্ষ্মীদেবীর জিহ্বায় রাধাকৃষ্ণের বীজ ও নাম লিখে দেন এবং বলেন, "আমি ঠিকই দিয়েছি।"

সম্ভবত এই সময়েই লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারীর ঘটনাটি ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা থেকে জানতে পারা যায়, লছমীনারায়ণ তাঁকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ স্পর্শ করেন না, সুতরাং সহজেই প্রত্যাখ্যান করলেন। লছমীনারায়ণ বুঝতে পারলেন, উনি কোন প্রলোভনেরই বশীভূত নন। তখন তিনি সারদাদেবীকে টাকা দেবার প্রস্তাব করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর মন বোঝার জন্য তাঁকে নিজের কক্ষে ডেকে এনে লছমীনারায়ণের প্রস্তাবের কথা জানালেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আমি নিতে পারব না বলায় তোমার নামে দিতে চাইছে, তুমি ওটা নাও না কেন? কি বল?" শুনেই সারদাদেবী বুঝতে পারলেন এটা বকলমে শ্রীরামকৃষ্ণকেই টাকা দেওয়া। নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, তা কেমন করে হবে? ও টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ও টাকা তোমারই নেওয়া হবে; কারণ আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যক খরচ না করে থাকতে পারব না; ফলে ওটা তোমারই নেওয়া হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য। কাজেই ও টাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না।"

শ্রীমা একটু মুক্তহস্ত ছিলেন—তিনি প্রায় ভক্তদের প্রদত্ত জিনিসগুলি থেকে কিছু অগ্রভাগ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য সরিয়ে রেখে বেশির ভাগ অংশটা আগত ভক্ত মহিলা ও বালকবালিকাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তাঁর এই প্রকৃতির কথা শ্রীরামকৃষ্ণও জানতেন। একবার অনুযোগের সুরে শ্রীমাকে তিনি বলেছিলেন, 'এত খরচ করলে কি ভাবে চলবে?' কথাটি শুনেই শ্রীমা কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন নহবতে। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ত্রস্ত হয়ে তখনই রামলালকে ডেকে বললেন, 'ওরে, রামলাল, যা তোর খুড়ীকে গিয়ে শান্ত কর। ও রাগলে (নিজেকে দেখিয়ে) এর সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ তখন দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের কৃচ্ছ্রসাধনে পারঙ্গম করে তুলছেন। তিনি নহবতবাসিনী সারদাদেবীকেও *বলে দিয়েছিলেন কাকে ক'খানা রুটি দিতে হবে, যেমন—রাখালকে দু'খানা,* লাটুকে পাঁচখানা, বুড়ো গোপাল ও বাবুরামকে চারখানা করে। কিন্তু বলেই নিশ্চিন্ত হননি তিনি—একদিন রাখালকে (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, ক'খানা রুটি খেলি?' তিনি ভয়ে ভয়ে বললেন 'সাতখানা।' বাবুরামের

(পরে স্বামী প্রেমানন্দ) কাছেও জানতে পারলেন তিনি বরাদ্দের চেয়ে দু'খানা রুটি বেশি খেয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত বেশি খেলি কেন?' বাবুরাম নির্দ্বিধায় বললেন, 'মা দিলেন যে।' তিনি তখনই চটি পায়ে ছুটলেন নহবতে। অনুযোগ জানিয়ে বললেন, 'তুমি ছেলেদের মানুষ হতে দেবে না? ওরা যে সাধু হবে গো! এ বয়সে এত খেলে চলবে কেন?'

বেদনার্ত কণ্ঠে বললেন, "ও দুখানি রুটি বেশি খেয়েছে বলে তুমি অত ভাবছ কেন? তাদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। তুমি ওদের খাওয়া নিয়ে কোন গালাগালি কোরো না।" নিরুত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে ফিরে এলেন নিজ কক্ষে।

আর একদিনের ঘটনা। বাবুরামের পেটের অসুখ, তাঁকে একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলেন শ্রীমা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেটা দেখতে পেয়েছিলেন। শ্রীমা বলেছেন, "আমাকে একদিন বললেন, 'তুমি বাবুরামকে কি খেতে দিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'মিছরির পানা।' ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'ওদের যে সাধু হতে হবে। এসব কি অভ্যাস করাচ্ছ?'" সারদাদেবী কোন উত্তর দিলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

কিন্তু শুধু ভক্তদের আহারাদি সম্পর্কেই নয়, অন্যদিকেও সারদাদেবীর মাতৃত্ব ক্রমশঃ বিকশিত হচ্ছিল। দিনের বেলা শ্রীরামকৃষ্ণের আহারের সময় তিনি ভক্ত সমাগমের জন্যে আসতে পারতেন না কিন্তু রাত্রে সকলকে সরিয়ে দেওয়া হত যাতে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ঠাকুরের কাছে বসে থেকে তাঁকে খাওয়াতে পারেন। সেদিনও তিনি ঠাকুরের আহার্য বস্তুর থালা হাতে নিয়ে সিঁড়ি থেকে সবে বারান্দায় পা দিয়েছেন এমন সময় এক মহিলা ভক্ত এসে বললেন, 'দিন মা, আমায় দিন।' থালাটি নিয়ে মহিলাটি ঠাকুরের সম্মুখে রেখে চলে গেলেন। প্রবেশ করলেন শ্রীমা। ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন কিন্তু অন্ন স্পর্শ করতে পারলেন না। পাশে উপবিষ্ট শ্রীমাকে বললেন, 'তুমি এ কি করলে? ওকে কি জান না। ও অমুকের ভাজ, দেওরকে নিয়ে থাকে। এখন আমি ওর ছোঁয়া খাই কি করে?' শ্রীমা অনুনয় করে বললেন, 'তা জানি, আজ খাও।' শ্রীমায়ের অনুনয়ের উত্তরে ঠাকুর শর্ত আরোপ করতে চাইলেন, 'আর কোন দিন কারও হাতে দেবে না বল?' হাত জোড় করে সারদাদেবী বললেন, "তা তো আমি পারব না ঠাকুর। তোমার খাবার আমি নিজেই নিয়ে আসব কিন্তু আমায় মা বলে চাইলে আমি তো থাকতে পারব না। আর তুমি তো শুধু আমার ঠাকুর নও—তুমি সকলের।"

মায়ের কথায় হয়ত প্রসন্নই হয়েছিলেন কারণ তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি আহারে মনোনিবেশ করেন।

আরও একটি ঘটনা হয়ত এই কালেই ঘটেছিল। কালীপদ ঘোষ ছিলেন এক

সাহেব কোম্পানীর বড়বাবু এবং আর্থিক সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে সকল রকম চরিত্র দোষ তার মধ্যে ছিল। একদিন তাঁর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে এসে পৌঁছালেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে।—তাঁর সান্নিধ্যে আপন দুঃখের সব সংবাদ জানিয়ে কোন মন্ত্র বা ওষুধের প্রার্থনা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সোজা দেখিয়ে দিলেন নহবতের দিকে—"ওখানে একজন স্ত্রীলোক আছেন, তাঁকে তুমি সব খুলে বল। তাঁর বিভিন্ন মহৌষধ জানা আছে, এসব ব্যাপারে তাঁর শক্তি আমার চাইতে অনেক বেশি।"

ঘোষগৃহিণী উপস্থিত হলেন সারদাদেবীর কাছে। নারীর বেদনা তিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন নারীর কাছে। শ্রীমা সব শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আমি আর কি জানি বাছা! যিনি তোমায় পাঠিয়েছেন, তিনি নানারকমের ওষুধ জানেন, তুমি তাঁর কাছেই যাও।' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আবার পাঠিয়ে দিলেন সারদাদেবীর কাছে। এই ভাবে দু'তিনবার ঘোরার পর সারদাদেবী বুঝতে পারলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁর শক্তি সারদাদেবীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক। সেই বিপন্না নারীকে আশ্বস্ত করে পূজার একটি বিল্বপত্র হাতে দিলেন, বললেন, "বাছা এটি নিয়ে যাও—এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।"

অচিরে গিরিশ মারফৎ কালীপদ ঘোষ এসে পৌঁছলেন এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রবল ভক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর জীবন সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হল।

এই সময় প্রত্যহ ভক্তের ভিড়। সারাদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাতের কিছুমাত্র সুযোগ নেই। তা'ছাড়া ভক্তদের আহারাদির ব্যবস্থাও করতে হয় তাঁকেই। তিনি নীরবে আপন কর্তব্য সমাধা করে চলেছেন। হয়ত অসময়ে কোন ভক্ত এসে পড়েছে—তখনই নহবতে খবর যায়—তাঁর জন্য উপযুক্ত আহারের ব্যবস্থা করতে। নহবতের দরমার বেড়ার অন্তরালে একটি ছোট্ট কক্ষের মধ্যে যাবতীয় সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হয়। অদূরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে কখনও চলেছে ধর্মকথা, কখনও গান, কখনো বা রহস্যালাপ। সারদাদেবীর কাছে সে জগৎ কাছে থেকেও অনেক দূরে। কিন্তু তিনি তার আভাসটুকু থেকে বঞ্চিত হন না—বেড়ার ফাঁক দিয়ে কখনো কখনো উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকেন সেই আনন্দের হাটের দিকে।

সন্ধ্যা হয়। রাত বাড়ে। "জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের দিকপানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি," সারদাদেবী স্মৃতি চারণ করেছেন, "তোমার এ জ্যোৎস্নার মতন আমার অন্তর নির্মল করে দাও। রাত্রে যখন চাঁদ উঠত গঙ্গার ভিতর স্থির জলে তার প্রতিবিম্ব দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কত্তুম—চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।"

॥ ৫ ॥

১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের গলরোগের প্রাথমিক লক্ষণ ধরা পড়ল। ২৪ মে (বাং জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা ত্রয়োদশী) শ্রীরামকৃষ্ণ পানিহাটীর উৎসবে যোগদান করেন। সারদাদেবীও সে উৎসব দেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। অন্যের মারফৎ তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা জানাতে শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'ও যদি যেতে চায়, তাহলে চলুক।' এই সামান্য কথা ক'টি থেকেই সারদাদেবী বুঝতে পারলেন তিনি সম্মতি জানালেও তাঁর সায় নেই। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত পানিহাটী না-যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল সেটা পরে তাঁর কথাতেই প্রকাশিত হয়েছে, "সঙ্গে না গিয়ে ভালই করেছে। ওকে সঙ্গে দেখলে লোকে বলত, 'হংস-হংসী' এসেছে। ও খুব বুদ্ধিমতী।"

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসক এবং ভক্তরাও বুঝতে পারছেন—এটি সাধারণ গলরোগ নয়, কালান্তক কর্কট রোগ যার প্রকৃত চিকিৎসা তখনকার দিনে তো বটেই আজও আবিষ্কৃত হয়নি কিন্তু তবু নতুন নতুন চিকিৎসক আসেন, নতুন নতুন বিধান দেন। তাতে কখনও দু'চার দিন সামান্য উন্নতির লক্ষণ দেখা দিলেও রোগ নিরাময হয় না। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ স্ট্রিটে একটি বাসাবাড়িতে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয় কিন্তু ২৬ সেপ্টেম্বর দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করে সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ এককথায় সে বাড়িতে অবস্থান না-মঞ্জুর করে দেন এবং সেইদিনই তাঁকে বলরাম বসুর বাড়িতে এনে অস্থায়ীভাবে রাখা হয়। ২ অক্টোবর (১৮৮৫) নতুন একটি বাসাবাড়িতে এনে সেইখানেই তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়।

দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট চিরদিনের মত ভেঙে গেল—শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর কোলাহলহীন, নিষ্প্রদীপ। নহবতে সারদাদেবীর আর কোন কাজ নেই।

নতুন বাসায় পুরুষ ভক্তরাই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা-শুশ্রূষা, দেখাশোনা করেন। মাঝে মাঝে গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদেবী উপস্থিত হয়ে সেবাকাজে সহায়তা করেন। তাঁরা ফিরে গেলে সারদাদেবী তাঁদের মুখ থেকেই সব সংবাদ পান। কিন্তু ক্রমশঃ নানাবিধ অসুবিধা দেখা দিতে লাগল—বিশেষ করে তাঁর পথ্য তৈয়ারী করে যে সুনিপুণ দক্ষতায় ও কথার কৌশলে সারদাদেবী তাঁকে আহার্য গ্রহণ করাতে

পারতেন সে ক্ষমতা কারও ছিল না। এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীর শ্যামপুকুরের বাসায় আসার ঘোর বিরোধী; তাঁর বক্তব্য, "সপত্নীক এখানে থাকলে শহরের লোকেরা 'হংস-হংসী' বলে নিন্দা করবে।" অবশ্য শ্যামপুকুরে সারদাদেবীর অবস্থানের প্রধান অন্তরায় সেখানে অন্তঃপুরের অভাব। লজ্জাশীলা সারদাদেবী সাধারণত সকলের দৃষ্টির আড়ালে জীবনযাপনে অভ্যস্ত—পরবর্তীকালেও পুত্রপ্রতিম নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভক্তদের কাছেও মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেননি। শ্যামপুকুরের বাসাবাড়িতে স্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু নেই। ভক্তরা অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাযত্নের জন্য সারদাদেবীর অসুবিধাগুলিকে আমল দেননি—আর সারদাদেবীও নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার ভার গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তদের প্রবল আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের বিরোধিতাও স্তিমিত হল এবং একদিন (২ অক্টোবরের পরে কয়েকদিনের মধ্যে) সারদাদেবী এসে পৌঁছলেন শ্যামপুকুর বাটীতে। বিদায় আনন্দধাম দক্ষিণেশ্বর!

শ্যামপুকুরের বাসাবাড়ির ছাদের একটি ছোট্ট চালাঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। সেদিকটায় পুরুষদের যাতায়াত ছিল না কিন্তু তাঁর স্নান-শৌচাদির জন্য স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা সম্ভব হল না। পুরুষদের ঘুম ভাঙার আগে রাত ৩টায় উঠে তিনি একতলায় সাধারণ স্নানাগারে স্নান শেষ করে ছাদের ঘরে আশ্রয় নিতেন। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হলে অল্পসময়ের জন্য নেমে আসতেন দোতলার একটি ঘরে বিশ্রাম নিতে। রাত্রি ২টা পর্যন্ত সেখানেই নিদ্রা যেতেন। এইভাবে চলল তাঁর অক্লান্ত পতিসেবা—সকলের অগোচরে, নিভৃত সাধনায়।

চিকিৎসকদের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ অবনতি হতে লাগল। উপরন্তু চিরদিন খোলামেলা জায়গায় জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শহরের আবহাওয়ায় তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলেন না। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারও অভিমত দিলেন এই বদ্ধস্থানের পরিবর্তে কিছুটা মুক্ত স্থানে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। ১১ ডিসেম্বর (১৮৮৫) শ্যামপুকুর পরিত্যাগ করে ৯০, কাশীপুর রোডের উদ্যানবাটীতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা হল। উদ্যানবাটী বাগান পুকুর সমেত একটি দোতলা গৃহ মাসিক ৮০ টাকা ভাড়ায় পাওয়া গেল। দোতলায় দু'খানি ঘর ও সংলগ্ন প্রাচীর-ঘেরা ছাদ। এর মধ্যে বড় ঘরখানিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থানের ব্যবস্থা, ছোট ঘরখানিতে তাঁর স্নানাদি এবং দু'একজন ভক্ত যাঁরা পালা করে রাত্রে তাঁর সেবা করতেন তাদের সাময়িক বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট হল। নিচের ঘরখানিতে থাকতেন সারদাদেবী—সেখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্যাদি প্রস্তুত করতেন এবং ওপরে গিয়ে

খাইয়ে আসতেন। এই সময় আবার এক নতুন বিপত্তি ঘটে। দোতলা সিঁড়িটি ছিল কাঠের এবং ধাপগুলির উচ্চতা এত বেশি যে সাধারণ মানুষের পক্ষেই সেগুলি অতিক্রম করা রীতিমত আয়াস-সাধ্য। একদিন আড়াই-সের দুধ নিয়ে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে সারদাদেবী মাথা ঘুরে পড়ে যান এবং তাঁর গোড়ালির হাড় সরে গিয়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় বাবুরাম মহারাজ এসে তাঁকে ধরে তোলেন। তিন দিন পরে পায়ের ব্যথা কিছুটা উপশম হলে বালক ভক্তগণের সাহায্যে আবার তিনি স্ব-কর্তব্য সাধনে রত হন। এই তিন দিন গোলাপ-মা মণ্ড তৈরী করে শ্রীরামকৃষ্ণকে খাইয়ে আসতেন।

এই সময়ের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের শীতকালের ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী–সেবকগণের সাহায্য ছাড়া তিনি ওঠা-নামা বা চলাফেরা করতে পারেন না। সেই সময় তাঁর সেবক ভক্তেরা স্থির করেন সন্ধ্যার সময় তাঁরা বাগানের খেজুর রস খাবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অগোচরেই তাঁরা সব কাজ শেষ করতে চেয়েছিলেন। যথাসময়ে তাঁরা একত্রে সেইদিকে চললেন। অকস্মাৎ সারদাদেবী দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তীর বেগে সেই দিকে ছুটে চলেছেন। চমকে উঠলেন তিনি! এটা কিভাবে সম্ভব! যাঁকে পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে হয় তিনি কেমন করে শয্যাত্যাগ করে এভাবে ছুটে যেতে পারেন! কৌতূহলী হয়ে তিনি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন শয্যা শূন্য—সন্ত্রস্ত হয়ে ছাদে, পাশের ঘরেও অনুসন্ধান করে কোথাও তাঁকে খুঁজে পেলেন না। কিছুক্ষণ পরেই আবার তেমনিভাবে দ্রুত ফিরে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তখনকার মত আশ্বস্ত হলেও কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ঘটনাটি সম্পর্কে। উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "তুমি দেখেছ না কি?" একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে—সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের পাশে যে খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলুম, ওই গাছতলায় একটা কাল সাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়ায়। ছেলেরা তা জানত না। তাই অন্য পথে ওখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলুম। বলে এলুম, আর কখনও ঢুকিস্ নে।" সারদাদেবীকে অন্যের কাছে তখন সে কথা প্রকাশ করতেও নিষেধ করলেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তরের পর সারদাদেবী নীরদ মহারাজের কাছে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেন।

এই ভাবেই চলতে থাকে কাশীপুরের দিনগুলি। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১ জানুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যাত্যাগ করে নিচে নেমে এসে বাগানে সমবেত গৃহীভক্তদের আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। আজও প্রতি বৎসর ১ জানুয়ারি কল্পতরু

দিবস রূপে পালিত হয়।

তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটছে। কখনও কখনও একটু সুস্থ বোধ করেন কিন্তু অধিকাংশ সময়ই অবনতির দিকে চলেছে দ্রুত গতিতে। এই সময় একদিন সারদাদেবী যখন পথ্য দিতে গেছেন তখন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন কিছু বলতে চান। সারদাদেবী প্রশ্ন করলেন, "কি বলবে, বলই না।" কিছুটা অনুযোগের সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "হাঁ গা, তুমি কিছু করবে না? এ-ই (নিজেকে দেখিয়ে) সব করবে?"

সারদাদেবী ইতস্তত করে উত্তর দিলেন, "আমি মেয়েমানুষ—আমি কী করতে পারি?"

"না, না, তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে"—ভারার্পণের ভঙ্গীতে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

সেদিনের মত কথাটা ওইখানেই চাপা পড়ে গেল। সম্ভবত এর কয়েকদিন পরেই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে সহধর্মিণীর উপর ভার ন্যস্ত করলেন। সেদিন খাবার দিতে গিয়ে সারদাদেবী দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, "এখন খাবে যে, ওঠো।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, যেন দূরাগত প্রত্যাদেশের কণ্ঠে বললেন, "দ্যাখ, কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।"

সেদিন সারদাদেবী তাঁর নারীত্বের অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে রাখার চেষ্টায় বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ! তা কি করে হবে?"

নারীপুরুষের কর্তব্যের পার্থক্যকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের দিকে দেখিয়ে বললেন, "এ আর কি করেছে? তোমাকে অনেক বেশি করতে হবে।"

আপাতত প্রসঙ্গটির এইখানেই ইতি টানবার জন্য সারদাদেবী বললেন, "সে যখন হবে, তখন হবে। তুমি এখন খাও তো!"

ব্যাধির প্রকোপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কলকাতার সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা তখনও প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু ভক্তেরা বুঝতে পারছেন, আর কোন আশা নেই। বুঝতে পারছেন সারদাদেবীও। সব যখন নিষ্ফল হতে চলেছে তখন একমাত্র আশ্রয় দৈব কৃপা। শেষ চেষ্টা হিসাবে তারকেশ্বরে আশুতোষ শিবের কাছে হত্যাদান! সেই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি পৌঁছলেন তারকেশ্বরে। মন্দির-সংলগ্ন দীঘিতে স্নান সেরে সিক্ত বসনে পূজা দিলেন শিবের কাছে—তার সেই অবস্থাতেই লিঙ্গমূর্তির কাছে ধর্ণা দিলেন স্বামীর রোগমুক্তির কামনায়। দুটি নিরন্ন, বিনিদ্র দিন-রাত্রি অতিবাহিত হল। তৃতীয় দিনটিও কাটল।

অর্ধরাত্রে তাঁর মনে হল "সৃষ্টির অন্তকাল উপস্থিত। জরাজীর্ণ পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আবার ধীরে ধীরে নতুন সৃষ্টি জেগে উঠছে। সেই ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি একা। অনন্তকাল ধরে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই লীলা প্রত্যক্ষ করে চলেছেন। তাঁরই সৃষ্টি, ধ্বংসও তাঁরই। তিনি এই দুয়ের অতীত—অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত পরমাত্মা।"

"ঘটাকাশ ভেঙে গেছে। এখন তিনি সম্পূর্ণ মায়াবন্ধনহীন।... জন্ম মৃত্যু প্রকৃতির বিধান, জলবুদ্বুদের মত একবার ভাসে আবার সাগরলহরীতে লয় পায়। কে কার পতি! কে কার পত্নী! এ জগতে কেউ কারও নয়। একা আসা, একা যাওয়া। কেউ কারও সঙ্গে আসে না, সঙ্গে যায়ও না। তবে ?"

ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলেন তিনি। মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল পান করলেন।

কথা প্রসঙ্গে তারকেশ্বরে হত্যাদানের বিবরণ দিয়ে সারদাদেবী স্বামী অরূপানন্দের কাছে বলেছিলেন, "তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম। তাতেও কিছু হল না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজানো থাকলে তার ওপর ঘা মেরে যদি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই আমার মনে ভাব এল, 'এ জগতে কে কার স্বামী?... কার জন্যে আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?' একেবারে সব মায়া কাটিয়ে বৈরাগ্য এনে দিলে। আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পিছনে কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম—পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে পড়েছিলুম কি না। তবে একটু সুস্থ হলুম। তাবপরদিনই ফিরে আসি।"

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কিছুই অবিদিত নয়, সব জেনে শুনেও তিনি রহস্যচ্ছলে বললেন,"কি গো, কিছু হল ? কিছুই না!"

শেষদিন যে আসন্ন সে কথা জেনেও সারদাদেবী কিন্তু ধৈর্য হারাননি—উপরন্তু ভক্তশিষ্যদের আশ্বাস দিয়েছেন। লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বলেছেন, "তাঁর সেবা করতে করতে আমাদের মধ্যে কেউ হতাশ হয়ে পড়লে তিনি (সারদাদেবী) বুঝতে পারতেন। যোগীনভাইকে (স্বামী যোগানন্দ) দিয়ে বলে পাঠাতেন, 'ওকে হতাশ হতে মানা কোরো। তাঁর শরীর আজকাল একটু ভাল রয়েছে। এখন তো ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে হয়েছে।'

তিরোভাবের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে নির্দেশ দিলেন, (তাঁর অবর্তমানে) 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।... কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত করো না। তোমার মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।... বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমায়

ভক্তেরা যে যেখানেই আদর করে রাখুক না কেন কামারপুকুরে নিজের ঘরখানি নষ্ট করো না।"

কৃচ্ছ্রসাধনা ও স্বাবলম্বিতা তথা নারীর ব্যক্তিত্ব রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

অবশেষে এলো সেই কালরাত্রি—৩১ শ্রাবণ, ১২৯৩ ১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ) রাত্রি ১টা ২ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। ভক্তেরা প্রথমে বুঝতে পারেননি যে এ সমাধি থেকে আর ব্যুত্থান সম্ভব নয়। পরদিন সকালে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, 'সব শেষ!'

এই চিরবিদায়ের সংবাদ যখন শ্রীমায়ের কাছে পৌছল তখন একবার মাত্র ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন, 'মা কালী গো, তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে চলে গেলে গো!' পরক্ষণেই শব্দহীন বেদনায় স্তব্ধ। লাটু মহারাজ বলেছিলেন, "মাকে কাঁদতে দেখে বাবুরাম আর যোগীনভাই সেখানে গেলো আর গোলাপ-মা মাকে ধরে ঘরে নিয়ে গেলো।... মা একবার কেঁদে সেই যে চুপ করলেন আর তাঁর গলার আওয়াজ শুনা গেল না। মেইয়া মানুষের এমন ধৈর্য হামনে জীবনে দেখিনি।"

একটা দুর্যোগ যে সেদিন ঘটতে চলেছে তার পূর্বাভাস তিনি সকালেই পেয়েছিলেন। সেদিনের কথা স্মরণ করে পরে বলেছিলেন, "যেদিন এমনি হবে, খিচুড়ি রান্না হয়েছিল, খিচুড়ি ধরে গেল—নীচেরটা পুড়ে গেল। ছেলেরা আমার উপর-উপর সেই খিচুড়িই খেলে। আমার একখানা দেশী কুঞ্জদার শাড়ী ছাতে শুকোচ্ছিল, কে চুরি করে নিলে।"

পরদিন ১ ভাদ্র বেলা ১০টায় শোকযাত্রা শুরু হল। কাশীপুরের মহাশ্মশানে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহের অগ্নিসংকার হল! সব শেষে পূত ভস্মাস্থি একটি পাত্রে সংগ্রহ করে ভক্তগণ বহন করে এনে স্থাপন করলেন শয্যায়। সন্ধ্যায় শ্রীমা হাতের সোনার বালাটি যখন খুলতে উদ্যত হয়েছেন তখনই তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগের পূর্বেকার সেই অপরূপ শ্রীমণ্ডিত কান্তিতে। শ্রীমায়ের হাত চেপে ধরে বললেন, "আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর।"

শ্রীমা নিজেই কাপড়ের চওড়া পাড়গুলি ছিঁড়ে সরু করে নিলেন। পরবর্তীকালেও তিনি খুব সরু লালপেড়ে শাড়ি পরিধান করতেন।

॥ ৬ ॥

২১ আগস্ট, ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ-স্মৃতি-পূত কাশীপুর উদ্যানবাটী পরিত্যাগ করে সারদাদেবী চলে গেলেন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়িতে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের তৃতীয় দিবসে অর্থাৎ ১৮ আগস্ট পূতাস্থিপূর্ণ তাম্রকলসের সম্মুখে ভোগ নিবেদিত হল কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল উদ্যানবাটীতে আর অবস্থান সঙ্গত বা সম্ভব কি না! প্রশ্নটা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক। আগস্ট মাস পর্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে কিন্তু তারপর? প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের আর এই ব্যয়ভার বহনের ইচ্ছা নেই। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবক ভক্তেরা চান মায়ের শোকহ্রাসের জন্য এবং অস্থি সংরক্ষণের একটা উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে সেখানে উপযোগী মন্দির নির্মাণ করার জন্য কিছু সময় এবং সেই কারণেই আরও কিছুদিন উদ্যানবাটীতে অবস্থান করতে। কিন্তু তাঁদের তো আর্থিক সঙ্গতি বলতে কিছু নেই। শ্রীরামকৃষ্ণের অস্থি সংরক্ষণ করে উপযুক্ত স্থানে তার উপর মন্দির নির্মাণ তাঁদের কাছে নিছক স্বপ্নমাত্র। রামচন্দ্র দত্তের নেতৃত্বে একটি সভায় স্থির হল কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের বাগানে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে বিশেষ প্রীতিলাভ করেছিলেন, সেইখানেই অস্থিসংরক্ষণ করা হবে। যুবক ভক্তগণ এ ব্যবস্থায় সম্মতি জানাতে পারলেন না কিন্তু বাধ্য হয়েই তাঁরা মেনে নিলেন। তাঁদের পক্ষে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, বলরাম বসু, সুরেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন গৃহস্থ ভক্তমাত্র। এই নিয়ে মতান্তর এক সময় মনান্তরেও পরিণত হয়েছিল। শ্রীমা এই ঘটনাতে ব্যথিত হয়ে গোলাপ-মাকে বলেছিলেন, "এমন সোনার মানুষ চলে গেলেন; দেখেছ গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া করছে।" শেষ পর্যন্ত প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তদের ইচ্ছাই পূর্ণ হল এবং ২৩ আগস্ট, ১৮৮৬ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে তাম্রকলসটি উপযুক্ত সমারোহের সঙ্গে সমাহিত হল। তাতে অবশ্য যুবক ভক্তরাও যোগদান করলেন কিন্তু তার আগেই শশী মহারাজ (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), নিরঞ্জন মহারাজ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) তাম্রকলস থেকে বেশির ভাগ ভস্ম ও কিছু অস্থি সকলের অলক্ষ্যে একটা স্বতন্ত্র পাত্রে সরিয়ে গোপনে বলরামবাবুর বাড়িতে রেখে সেখানেই নিত্যপূজার ব্যবস্থা করলেন।

৩০ আগস্ট বলরাম বসুর বাড়ি থেকেই সারদাদেবী বৃন্দাবন যাত্রা করলেন, সঙ্গে গেলেন যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ এবং গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবী। পথিমধ্যে তাঁরা বৈদ্যনাথধাম ও কাশীধাম দর্শন করে পৌঁছলেন

অযোধ্যায়।[১] মনে হয় ৩১ আগস্ট শ্রীমা বৈদ্যনাথধাম দর্শন করে সেইদিনই কাশী অভিমুখে যাত্রা করে ১ সেপ্টেম্বর কাশীধামে পৌছান। ঠিক কতদিন কাশীধামে অবস্থান করেছিলেন বলা কঠিন।[২] যে কয়দিন এখানে ছিলেন তার মধ্যে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও অন্যান্য দেব-দেবী দর্শন করেন, বেণীমাধবের ধ্বজাতেও আরোহণ করেন। একদিন বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করে ভাবাবেশে তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুত পদক্ষেপে বাসস্থানে পৌছেই বলেন, "ঠাকুর আমার হাত ধরে মন্দির থেকে নিয়ে এলেন।" অন্য আর একদিন কয়েকজন মহিলার সঙ্গে ভাস্করানন্দ স্বামীকে দর্শন করতে যান। স্বামীজী তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়। শ্রীমা ও অন্যান্য মহিলাদের দেখে অবিচলিত স্বামীজী বলেন, "শঙ্কা মৎ করো মাঈ, তুম সব জগদম্বা হো, শরম ক্যা?" পরে শ্রীমা এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন, "আহা কি নির্বিকার মহাপুরুষ—শীত গ্রীষ্ম সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন।"

কাশী থেকে সারদাদেবী পৌছলেন অযোধ্যায়। সেখানে মাত্র একদিন কাটিয়ে পরদিনই রওনা হন বৃন্দাবন অভিমুখে। এই সময় ট্রেনে অকল্পনীয়ভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পান। শ্রীরামকৃষ্ণের বাহুতে একটি সোনার ইস্ট-কবচ ছিল। অসুখের সময় সেটি খুলে সারদাদেবীকে দিয়েছিলেন এবং শ্রীমা নিজের বাহুতে সেটি ধারণ করে নিয়মিত পূজা করতেন। রেলগাড়িতে সেই কবচ-সমেত হাত জানলার পাশে উপরেব দিকে রেখে শুয়েছিলেন। অকস্মাৎ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তি তাঁকে সতর্ক করে দেন। "ওগো তোমার হাতে সোনার ইস্টকবচ এমন করে রেখেছ কেন? ও যে চোরে অনায়াসে খুলে নিতে পারে।" শ্রীমা তাড়াতাড়ি উঠে কবচটি হাত থেকে খুলে যে টিনের বাক্সে তাঁর নিত্যপূজিত ঠাকুরের ফটোটি থাকত তার মধ্যে রেখে দিলেন। ঐ কবচ এরপর আর তিনি ধারণ করেননি। ১৩১২ বঙ্গাব্দেব প্রথম দিকে (ইং ১৯০৫) ঐ ইস্টকবচ মঠের ঠাকুর ঘরে নিত্যপূজার জন্য স্বামী প্রেমানন্দের হাতে দেন এবং তাঁকে পূজাবিধিও শিখিয়ে দেন। শ্রীমা ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, "বৃন্দাবন যখন যাই, পথে রেলে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর (রেলগাড়ির) জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে রয়েছে, দেখো, যেন না হারায়।'

"তাঁর ইস্টকবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। তারপর উটি মঠে দিলুম। এখন মঠে পূজা হয়।"

১। স্বামী গম্ভীবানন্দ লিখেছেন, "পথে তাঁহাবা দেওঘবে নামিযা পবেব গাডিতে কাশীধামে চলিলেন।"

২। স্বামী গম্ভীবানন্দেব মতে কাশীধামে অবস্থানকাল ৮/১০ দিন। অপবপক্ষে ব্রহ্মচাবী অক্ষযচৈতন্য ৩ দিন অবস্থানেব কথা বলেছেন।

স্বামী অরূপানন্দের কথায় জানা যায় "ও কবচটি একবার (১৯১০) ঠাকুরের তিথি-পূজার দিন হারিয়েছিল। ফুল বেলপাতার সঙ্গে সেটি কেউ অসতর্ক ভাবে গঙ্গায় ফেলে দেয়। কারও খেয়াল ছিল না। ভাঁটায় গঙ্গার জল কমে গেলে রামবাবুর ছেলে ঋষি ওখানে খেলতে খেলতে ওটি পেয়ে কুড়িয়ে আনে।"

শ্রীমা ঘটনাটি শুনে মন্তব্য করেন, "তাঁর ইস্টকবচ সাবধানে রাখতে হয়।"

বৃন্দাবন স্টেশনে একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটে। কোন একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বলেছিলেন, একবার তিনি আসবেন বাউল সেজে। সারদাদেবীর হাতে থাকবে হুঁকো কলকে এবং তাঁর নিজের হাতে থাকবে ভাঙা একটা পাথরের বাসন। বৃন্দাবন স্টেশনে সকলে ট্রেন থেকে নামছেন। পুরুষ ভক্তেরা আগেই নেমে পড়েছেন। গোলাপ-মা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছেন। লাটু মহারাজের হুঁকো কলকেগুলো পড়েছিল, সেগুলি তাড়াতাড়ি মায়ের হাতে দিয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী বললেন, 'এই তোমার হুঁকো কলকে ধরা হয়ে গেল।' শ্রীমাও সঙ্গে সঙ্গে, 'ঠাকুর, ঠাকুর এই আমার হুঁকো কলকে ধরা হয়ে গেল' বলে ধূপ করে মাটিতে ফেলে দিলেন।

বৃন্দাবনে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে। প্রথম দিকে শ্রীমায়ের এতদিনের সংযত ভাবাবেগ এই সময় প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের কিছুদিন আগে যোগীন-মা (শ্রীমা বলতেন, 'মেয়ে যোগীন' আর স্বামী যোগানন্দকে 'ছেলে যোগীন') বৃন্দাবনে আসেন। তাঁর সঙ্গে এখানে সাক্ষাতের পরই শ্রীমায়ের এতদিনের রুদ্ধ শোক তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়। যোগীন-মা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে হারাবার প্রবল বেদনার কারণ তিরোভাব কালে যোগীন-মার অনুপস্থিতি। হয়ত যোগীন-মার দিক থেকেই প্রথম শোকোচ্ছ্বাস সারদাদেবীকে বিচলিত করেছিল। সেই সময় তাঁর সঙ্গিনীরা নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েও সে শোক প্রশমিত করতে পারেনি। ক্রমশঃ তিনি আত্মস্থ হয়ে ওঠেন। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে বার বার আবির্ভূত হয়ে তাঁকে শান্ত করেন এবং ক্রমাগত তিন দিন তাঁর আদেশ লাভের পর পূজাকালে স্বামী যোগানন্দকে মন্ত্রদান করেন। যোগীন মহারাজ পূর্বে থেকেই শ্রীমায়ের সেবাকার্য করতেন—মন্ত্রলাভের পর তিনি সম্পূর্ণরূপে মায়ের সেবকরূপে আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী বিরজানন্দের কাছে স্বামী অপূর্বানন্দ শুনেছিলেন, দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরে শ্রীমাকে আটটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেন, "এ-সব সিদ্ধমন্ত্র। তোমার কাছে যারা দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে আসবে—তাদের দিও। এই সিদ্ধমন্ত্র যাকে দেবে তার ইস্টদর্শনের আগে দেহত্যাগ হবে না।"

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে সারদাদেবীর আধ্যাত্মিক জীবনেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটে। এ-সময় মাঝে মাঝেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। একদিন ধ্যান করতে

করতে তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন। যোগীন-মা অনেকক্ষণ নাম শোনাবার পরেও ব্যুত্থানের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শেষে যোগীন মহারাজ একটু নাম শোনাবার পর সেই ভাব কিছুটা প্রশমিত হয় এবং সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন সেইরকম তিনিও বলে উঠলেন "খাব।" কিছু খাবার, জল ও পান তাঁর সামনে ধরতেই ঠাকুরের মতোই সামান্য খেলেন। এমনকি ঠাকুর যেমন পানের সরু দিকটা দাঁতে কেটে ফেলে দিয়ে খেতেন তিনিও অনুরূপভাবে খেলেন।

সারদাদেবীর চিরকাল কীর্তনগানের প্রতি গভীর আকর্ষণ—বৃন্দাবনে লাটু মহারাজ ও লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে ভগবানজীর আশ্রমে যেতেন নাম-কীর্তন শুনতে। কখনও কখনও রাধাভাবে ভাবিত হয়ে সকলের অগোচরে চলে যেতেন যমুনার তীরে। একদিন একজনের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, "আমিই রাধা।" কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধা যেমন কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন এখানে মায়ের জীবনেও দেখা যায় তিনি রামকৃষ্ণভাবে তন্ময় হয়ে ঠাকুরের মতই আচরণ করতেন এবং ভাবসমাধিস্থ অবস্থায় তাঁকে কোন প্রশ্ন করলে তাঁর উত্তরগুলিও হত শ্রীরামকৃষ্ণের মত।

একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (উদ্বোধন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯) স্বামী অচ্যুতানন্দ বৃন্দাবনবাসকালে শ্রীমায়ের আবাস কালাকুঞ্জের একটি রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন, "যমুনার ঘাট ধরে বংশীবট এলাকায় পৌঁছে পাণিঘাটের কাছে যমুনার চড়া ছেড়ে গলি দিয়ে পশ্চিমে একটু উঠতেই একটি প্রাচীন বাড়ি দেখা গেল—এটাই 'কালাবাবুর কুঞ্জ'। কলকাতার শ্যামবাজারের গুরুপ্রসাদ বসু বৃন্দাবনে এই কুঞ্জ ও শ্যামরায়েব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের আত্মীয়তার সূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত বলরাম বসুর ব্যবস্থাপনায় শ্রীশ্রীমা ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থূলদেহ অপ্রকট হওয়ার পরে তাঁর সেবক ও সেবিকাদের সঙ্গে এখানে আসেন। বাড়ির একতলায় শ্যামরায়ের বিগ্রহ। দোতলায় বাঁদিকের ঘরখানিতে মা থাকতেন। আর ছাদের আর এক প্রান্তে ডানদিকের ঘরে মেয়ে ভক্তেরা এবং নিচের ঘরে যোগেন মহারাজ, লাটু মহারাজ ও কালীমহারাজ প্রভৃতি পুরুষ ভক্তেরা থাকতেন।... এখনও এই ঘরে মায়ের ব্যবহার করা একখানি তক্তপোষ আছে। তাতে মায়ের একটি ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে।"

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে চিঠি পৌঁছল তাঁর মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদ শুনে সারদাদেবী মন্তব্য করেন, "সংসারে কতরকমের লোক সব দেখলুম। রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য, ঠাকুর যখন আর পূজা করতে পারলেন না, তখন হতে মাইনের টাকাটা বন্ধ না করে আমাকে ৭টি করে টাকা দিত। ...তা বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুরই চলে

গেলেন, টাকা নিয়ে আর কি করব!"

বৃন্দাবনে বিহারীজীর মন্দিরে সারদাদেবী প্রার্থনা করেন, "ঠাকুর, তোমার রূপটি বাঁকা, মনটি সোজা, আমার মনের বাঁক ঠিক করে দাও।" রাধারমণের মন্দিরে ভাবাবস্থায় তিনি দেখেছিলেন, হাওড়ার নবগোপাল ঘোষের পত্নী পাখা হাতে সখীর মত ভগবানকে হাওয়া করছেন। সেদিন বাসায় ফিরে তিনি যোগীন-মাকে তাঁর দর্শনের কথা জানিয়ে বলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ।"

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে গৌরী-মার সঙ্গেও সারদাদেবীর মিলন ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতার সময় গৌরী-মা বৃন্দাবনে আসেন। তিনি প্রথমে 'কালাবাবুর কুঞ্জে' কিছুদিন কাটিয়ে চলে যান কোন নির্জন স্থানে সাধনার জন্য। পরে যখন যোগেন-মা বৃন্দাবনে আসেন তখন তিনি বহু সন্ধান করেও গৌরী-মার সাক্ষাৎ পাননি। গৌরী-মা তখন একটি বিশেষ সাধনা করছিলেন যার জন্যে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করে একাদিক্রমে ন'মাস কালযাপন করতে হয়। নির্জন স্থানে সাধনা শেষ করে ফিরে বৃন্দাবনে এসে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাব সংবাদ পেয়ে তিনি 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করতে উদ্যত হন। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তিরস্কার করে বলেন, 'তুই কি মরবি না কি?' গৌরী-মা বুঝতে পারেন তাঁর অনেক কাজ বাকি—তাঁর মৃত্যু শ্রীরামকৃষ্ণের অভিপ্রেত নয়। তারপর আবার তিনি সাধনাস্থলে ফিরে যান।

সারদাদেবী বৃন্দাবনে পৌঁছে বহু চেষ্টা করেও গৌরী-মার সন্ধান পেলেন না। অকস্মাৎ একদিন যোগানন্দ স্বামী রাওলে রাধারানীর আবির্ভাবক্ষেত্র দর্শন করতে গিয়ে একখানি গৈরিক শাড়ি রোদে শুকাতে দেখতে পান। কৌতূহলবশত অনুসন্ধান করে তিনি একটি গুহার মধ্যে গৌরী-মাকে আবিষ্কার করেন। তখন তিনি ধ্যাননিমগ্না। তাঁর ধ্যানভঙ্গ না করে যোগীন মহারাজ 'কালাকুঞ্জে' ফিরে এসে শ্রীমাকে ঘটনার কথা জানান। পরদিনই সারদাদেবী উপস্থিত হন সেখানে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর এই প্রথম উভয়ের সাক্ষাৎ। স্বতঃই দুজনে শোকবিহ্বল হয়ে পড়েন। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ না করে গৌরীর কাছে শাস্ত্র-নির্দেশ জেনে নিতে বলেছিলেন। সারদাদেবী তাঁকে সে কথা উত্থাপন করলে গৌরী-মা বলেন, "আমাদের অন্য শাস্ত্রের কাজ কি মা? ঠাকুরের কথা শাস্ত্রের উপরে। ঠাকুর নিত্য বর্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী। তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।"

সারদাদেবী পক্ষাধিককাল ধরে বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন। বৃন্দাবন বাসের শেষদিকে তিনি হরিদ্বার ঘুরে এসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে ছিলেন যোগীন মহারাজ, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবী। ট্রেনে আকস্মিকভাবে যোগীন মহারাজ প্রবল জ্বরে

আক্রান্ত হন। যোগীন-মা যখন জ্বরাক্রান্ত যোগীন মহারাজকে বেদানা খাওয়াচ্ছিলেন তখন সারদাদেবীর একটি দর্শন হয়। তিনি দেখেন, যোগীন মহারাজ নয়, যেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই বেদানা খাচ্ছেন। আচ্ছন্ন চেতনায় যোগীন মহারাজ দেখতে পান এক ভয়ঙ্কর মূর্তি দাঁড়িয়ে বলছে, 'তোকে দেখে নিতাম; কিন্তু কি করব, পরমহংসদেবের আদেশ, আমাকে এখনই চলে যেতে হবে।' সেই মূর্তি এক রক্তবস্ত্র পরিহিতা দেবীমূর্তিকে দেখিয়ে, তাঁকে রসগোল্লা খাওয়াবার নির্দেশ দেন। এর পরই যোগীন মহারাজ সুস্থ হয়ে ওঠেন। হরিদ্বার পৌঁছে শ্রীমা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এবং বিভিন্ন মন্দির দর্শন করেন—গঙ্গার অপর তীরে চণ্ডীপাহাড়ে উঠে দেবী দর্শনও করেন। ব্রহ্মকুণ্ডে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু চুল ও নখ নিক্ষেপ করেন।

হরিদ্বার ত্যাগ করে সারদাদেবী ও অন্যান্য সকলে জয়পুরে পৌঁছান এবং সকলে গোবিন্দজীর বিগ্রহ দর্শন করেন। অন্যান্য মূর্তিগুলির মধ্যে যোগীন মহারাজ দেখতে পান অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্বপ্নে দেখা দেবীমূর্তি—শীতলা মূর্তি। নির্দেশমত সেই দেবীকে রসগোল্লা ভোগ দেওয়া হল। জয়পুর থেকে পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হয়ে সারদাদেবী সাবিত্রী পাহাড়ে আরোহণ করেন। তীর্থ পরিক্রমা শেষ করে কলকাতা ফেরার পথে সকলে প্রয়াগ দর্শন করেন। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অবশিষ্ট কেশ বিসর্জন দেন। সেদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে পরে তিনি বলেছিলেন, "ঠাকুরের চুল কি কম জিনিষ! তাঁর শরীর ত্যাগের পর যখন প্রয়াগ যাই তখন তাঁর চুল তীর্থে দেবার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলাম। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের স্থির জলের কাছে ঐ চুল হাতে নিয়ে জলে দেব বলে মনে করছি, এমন সময় হঠাৎ ঢেউ উঠে আমার হাত থেকে নিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। তীর্থ পবিত্র হবার জন্যে তাঁর চুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেল।"

ত্রিবেণীতে লক্ষ্মীদেবী মস্তক মুণ্ডন করলেও সারদাদেবী করেননি। এই সম্পর্কে দুর্গাপুরীদেবী একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন: ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানকালে সারদাদেবী নিজের কেশোদাম বিসর্জন দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁর এই সঙ্কল্পের কথা কাউকে জানাননি। স্নানের পূর্বরাত্রির অবসানে শুনতে পেলেন, অতি গম্ভীর বেদনার্ত কণ্ঠ, 'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী'। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দু'হাত দিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর অলঙ্কার ত্যাগে যেমন তিনি নিষেধ করেছিলেন কেশমুণ্ডনেও যেন সেই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত হল। সকলে সেই কাহিনী শুনে বলেন ঠাকুর লক্ষ্মীদেবীকে ডেকেছিলেন কিন্তু গৌরী-মা বলেন, 'না মা, ঠাকুর তোমাকেই ডেকেছিলেন। ত্রিবেণীতে আজ ভোরে তুমি স্নান করবে তাই ঠাকুর তোমাকে ডেকে দিয়ে গেলেন।'

॥ ৭ ॥

বৎসরাধিক কাল তীর্থভ্রমণ সেরে ৩১ আগস্ট ১৮৮৭, সারদাদেবী সকলের সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাগমন করে পক্ষকাল বলরাম বসুর গৃহে অবস্থান করেন। এবার এক নতুন জীবনে প্রবেশ করতে চলেছেন তিনি—এক নতুন সাধনার ব্রত নিয়ে বলরাম বসুর গৃহত্যাগ করে চললেন কামারপুকুরের পথে কারণ সেটাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ। পথে কিছুক্ষণ দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা বিরতি। সব দেবদেবীকে প্রণাম করলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচিহ্নগুলি দর্শন করলেন। সব পুরনো কথা মনে ভিড় করে এলো—সেই একদিন যেদিন দক্ষিণেশ্বর পূর্ণ ছিল এক অনাবিল আনন্দময়তায়—কত গান, কত ধর্মকথা, কত রঙ্গরসিকতা। সেই দক্ষিণেশ্বর আছে—আছেন জগত্তারিণী—রাধাকৃষ্ণ—দ্বাদশ শিবমন্দির কিন্তু সারদাদেবীর কাছে আজ সবই প্রাণহীন, বিবর্ণ। নিঃস্বতার বেদনা বুকে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে পৌছলেন কামারপুকুরে। তাঁর সঙ্গে এলেন স্বামী যোগানন্দ, শিবরাম ও গোলাপ-মা। কয়েকদিন পরে গোলাপ-মাও ফিরে গেলেন কলকাতায়। এবার শুরু হল নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল জীবনযাত্রা।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ত্রৈলোক্য বিশ্বাস সারদাদেবীর অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন। তার পশ্চাতেও ছিল কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্রচেষ্টা। শ্রীমা বলেছেন, "ত্রৈলোক্য আমাকে ৭টি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর দীনু খাজাঞ্চি ও অন্যান্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষবুদ্ধি করলে, ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে।" জীবৎকালেই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন রামলালকে বলেন, "দ্যাখ্ তোর খুড়ী যেন কামারপুকুরেই থাকে।" উত্তরে রামলাল বলেছিলেন, "ওঁর যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকবেন।" তাঁর এই কথা থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন সারদাদেবীর ভবিষ্যৎ কি? তাঁকে যে অনেক কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করতে হবে এবং সেই অবস্থাকেই মেনে নিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে হবে তারই আভাস দিয়েছিলেন তিরোভাবের কয়েকদিন পূর্বে 'শাক্ বুনে, শাক্‌ভাত্ খেয়ে আর হরিনাম করে জীবন যাপনের' নির্দেশের মধ্যে। সারদাদেবী বৃন্দাবনে অবস্থানকালে খাজাঞ্চিকে তাঁরা বুঝিয়েছিলেন, সারদাদেবীর দেখাশোনার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তরাই তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেন আর একজন বিধবা স্ত্রীলোকের খরচই বা কি? সুতরাং কালীবাড়ির টাকা দেবার আর প্রয়োজন নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ এই অর্থ সাহায্যের জন্য বার বার অনুরোধ জানিয়েও ব্যর্থ হন। সেই সময় ভক্তেরা স্থির করেন তাঁরাই সারদাদেবীকে মাসিক দশ টাকা করে সাহায্য করবেন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কিছুই হল না।

সুতরাং 'শাক বুনে হরিনাম করে দিন যাপনের' নির্দেশ আক্ষরিক অর্থেই সত্য হয়ে দাঁড়াল। নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ জীবন! এমনকি লক্ষ্মীদেবীও তাঁর সঙ্গে না এসে দক্ষিণেশ্বরে ভাইয়েদের আশ্রয়ে থেকে গেছেন। সেই একাকীত্বের জন্যই সে সময় তার মনে হয়েছিল 'যদি একটি সন্তান থাকত!' শ্রীরামকৃষ্ণ সে সময় দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এইসব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে তোমাকে কতলোক 'মা' 'মা' বলে ডাকবে।" কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা—এখন যে তাঁর পরীক্ষার কাল! তাঁর জীবনকে আরও দুঃসহ করে তুলেছে কামারপুকুরের গ্রাম-সমাজ। একালে বসে আমরা কল্পনাই করতে পারব না—একশো বছর আগে সংস্কারের বন্ধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা গ্রাম-সমাজের চেহারা—সেখানে সর্বরিক্ত, স্বামীবিরহিত দরিদ্র নারীর জীবন কতখানি ক্লেশকর ছিল। সম্বল বলতে এক টুকরো ধানজমি যার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ধানের মোটা চাল আর শাক পাতাই ছিল জীবনধারণের উপায়। এমন দিনও গেছে যখন ভাতের সঙ্গে সামান্য লবণটুকুও জোটেনি। প্রতিবেশিনীরা কেউ কেউ প্রথম দিকে তাঁকে সহানুভূতি দেখাতে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর সধবার লক্ষণসূচক অলঙ্কারাদি দেখে অপ্রসন্ন হয়ে ফিরে গিয়ে গ্রামে তাঁর বিরূপ সমালোচনা করেছেন। একমাত্র লাহাবাবুদের ভগিনী প্রসন্নময়ীই শ্রীমায়ের মুখে তাঁর বিধবার বেশধারণে শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধাজ্ঞার কথা জেনে দৃঢ়ভাবে তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করে গ্রামবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে গদাইয়ের স্ত্রী দৈবাদেশেই সধবার লক্ষণ ত্যাগ করতে পারেনি। অবশেষে গ্রামের সমালোচনা নতমস্তকে গ্রহণ করে সারদাদেবী হাতের বালা খুলে ফেলেন। চিরদিনই গঙ্গার প্রতি তাঁর আকর্ষণ (জয়রামবাটীতে আমোদর নদীকেই তিনি গঙ্গা বলে মনে করতেন)—গঙ্গাহীন কামারপুকুরও তাই তাঁর মনোকষ্টের অতিরিক্ত কারণ। একদিন স্থির করলেন গঙ্গাস্নান করতে যাবেন। এই সময় তিনি দেখতে পান সামনের পথ ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ এগিয়ে চলেছেন আর তাঁর পিছনে পিছনে তরঙ্গায়িত গঙ্গা উচ্ছল গতিতে তাঁকেই অনুসরণ করছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তের দল—নরেন্দ্রনাথ, বাবুরাম, রাখাল এবং আরও অনেকে। বিস্মিত সারদাদেবীর দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হল, "দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা!" তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের গাছ থেকে একমুঠো জবাফুল ছিঁড়ে এনে সেই গঙ্গায় অঞ্জলি প্রদান করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, "তুমি

হাতের বালা খুলো না—বৈষ্ণবতন্ত্র জানো তো?" বৈষ্ণবতন্ত্র জানতেন না সারদাদেবী, সে কথা জানাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে জেনে নিও।"

সেইদিনই অপরাহ্নে গৌরী-মা এসে হাজির। সব শুনে তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে সারদাদেবীকে বোঝালেন। তাঁর বৈধব্য বলে কিছু নেই কারণ তাঁর স্বামী 'চিন্ময়'। তাছাড়া তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি অলঙ্কার ত্যাগ করলে জগৎ শ্রীহীন হবে। তাঁর কথায় আশ্বস্ত সারদাদেবী পুনরায় হাতের বালা ও লাল পেড়ে কাপড় ব্যবহার শুরু করলেন। ইতিমধ্যে প্রসন্নময়ীর চেষ্টায় কামারপুকুরে সামাজিক মানসিকতারও কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বা সারদাদেবী সাধারণ মানুষ-মানুষী মাত্র নন। তাঁদের দৈবসত্তা সাধারণ নিয়মের অধীন নয়। ক্রমশ তাঁরা সারদাদেবীর আচার-আচরণে সন্তুষ্টির কারণ খুঁজে পেয়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

আর্থিক দুর্গতির বা গ্রামীণ সংস্কার ছাড়া আরও অশান্তির কারণ ছিল। সারদাদেবীর বয়স তখন মাত্র ৩৪/৩৫—একাকী নারীর অবস্থানের বিপদের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। এইরকম একটি অশান্তির ঘটনার কথা সারদাদেবীর মুখ থেকেই শোনা যাকঃ "হরিশ এই সময় কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভেতর যেই ঢুকেছি অমনি হরিশ আমার পিছন পিছন ছুটছে। হরিশ তখন ক্ষেপা। পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই! তাড়াতাড়ি ধানের খামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন নিজমূর্তি এসে পড়ল। তখন নিজমূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে গালে এমন চড় লাগালুম যে ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল। তারপর নিরঞ্জন এলে তাঁকে বললুম 'ওকে পাঠিয়ে দাও।' মনে হয় তার আর ওঠার ক্ষমতা ছিল না।"

ইতিমধ্যে শ্রীমা একবার জয়রামবাটী গিয়েছিলেন চারদিনের জন্য—মনে হয় জগদ্ধাত্রীপূজায় যোগদান করতে।[১] জগদ্ধাত্রীপূজার প্রতি তাঁর বরাবরের আকর্ষণ। মাতা শ্যামাসুন্দরীর নিজের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয় তবু মাতৃহৃদয় কন্যার দুরবস্থা দেখে তাঁকে নিজের কাছে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু সারদাদেবী তাতে সম্মত হননি, বলেছিলেন, "এখন তো মা কামারপুকুরে যাচ্ছি, পরে তিনি যা করবেন তা-ই হবে।"

১। এই অনুমানে গম্ভীরানন্দজীর সমর্থন আছে।

১৮৮৮-র প্রারম্ভে আঁটপুর থেকে বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী ও শ্বশ্রূ মাতঙ্গিনী এক আশ্রিতা ব্রাহ্মণকন্যা ও একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে কামারপুকুরে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছেই কৃষ্ণভাবিনীদেবী গৃহদেবতার ভোগের জন্য শ্রীমায়ের হাতে কিছু অর্থ দেন। সম্ভবত উপস্থিত হয়েই তিনি বুঝতে পারেন শ্রীমা কিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। বোধহয় তিনিই কলকাতায় ফিরে ভক্তদের কাছে সারদাদেবীর দুঃসহ জীবনযাপনের কথা জানান।[১]

এই সময়ের আরও একটু ঘটনার কথা জানিয়েছেন সারদাদেবী, "একজন উড়ে সাধু এসে কামারপুকুরে ছিলেন। আমি তাঁর চাল ডাল ইত্যাদি যা যা দরকার সব দিতুম, আর রোজ সকালে বিকালে খবর নিতুম 'সাধুবাবা কেমন আছ গো?'

"আহা তাঁর কুড়ে কি করেই যে বেঁধেছিলুম মা। রোজ আকাশ ভরে মেঘ হত, এই বৃষ্টি হয় হয় আর কি? আর হাত জোড় করে বলতুম, 'ঠাকুর রাখ গো রাখ। ওঁর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক তারপর যত পার ঢেলো।' তা গ্রামের লোকেরা কাঠকুটো যা লাগল দিয়ে সাহায্য করল। রোজ বৃষ্টি আসব আসব করত...এমনি করে কুঁড়েখানি তো হয়ে গেল। কিন্তু তার কিছুদিন পরেই সাধুটি সেই কুঁড়েতেই দেহ রাখলেন।"

এই ভাবেই একটি একটি করে দুঃসহ দিনগুলি কাটতে থাকে। লক্ষ্মীদেবী ও শিবরাম দু'চারদিনের জন্যে কামারপুকুরে এলে সাময়িকভাবে নিঃসঙ্গ জীবনে একটু আনন্দের স্পর্শ লাগে। এছাড়া আর কোন বৈচিত্র্য নেই, তবে শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য উপস্থিতি তিনি উপলব্ধি করেন—সেইটুকুই শান্তি। কখনো স্বপ্ন দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কাছে খিচুড়ি খেতে চাইছেন। গৃহদেবতা রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে তাঁকে খাওয়াবার তৃপ্তি পান। একবার যোগীন-মা কামারপুকুর গেলে ঠাকুরের উপস্থিতির কাহিনী, গৌরী-মার কাছে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার নির্দেশ ইত্যাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ঐ অশ্বত্থ গাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়েছিলেন। শেষে দেখলুম নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন! এখানকার ধূলি খাও। প্রণাম কর।" গ্রামস্থ মহিলাদের মধ্যে একমাত্র প্রসন্নকুমারী বরাবরই শ্রীমার আনুকূল্য করেছেন—যথাসম্ভব তাঁর প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টাও করেছেন। রাত্রে তাঁর কাছে থাকার জন্য নিজের পরিচারিকাকে পাঠিয়ে দিতেন। ধনী কামারনীর ভগ্নী শঙ্করীও মাঝে মাঝে রাত্রে এসে তাঁর কাছে থাকতেন এবং তাঁদের একটি ভাই বিভিন্ন কাজে সারদাদেবীকে সাহায্য করতেন। ইতিমধ্যে একদিন রামলাল কামারপুকুরে উপস্থিত হন, সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে। তিনি ফিরে এসে দেখেন

১। স্বামী গম্ভীরানন্দের অনুমান। অবশ্য গম্ভীরানন্দজী আরও একটি সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন, মায়ের ভ্রাতা প্রসন্নকুমার, রামলাল, গোপাল-মাও হয়ত জানিয়ে থাকতে পারেন।

রামলাল নিজের ইচ্ছেমত বাড়ি ও গৃহদেবতার ব্যবস্থা করে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেছেন। একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণর ঘরখানিই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। বিনা প্রতিবাদে শ্রীমা সেই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ঐ একটি নির্দিষ্ট কক্ষেই দিনযাপন করতে শুরু করেন।

এই ক্লেশকর জীবন যাপনের সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছল সুদীর্ঘ ন'মাস পরে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মে-জুন মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) ভক্তদের চেষ্টায় সারদা দেবী ফিরে এলেন কলকাতায়।

॥ ৮ ॥

ভক্তেরা আপাতত বলরাম বসুর বাড়িতেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় তিনি বেশিরভাগ সময় ধ্যানতন্ময়তায় ডুবে থাকতেন। একদিন বলরাম বসুর ছাদে ধ্যান করতে করতে তিনি সমাধিস্থ হন। সমাধি ভঙ্গের পর যোগীন-মাকে বলেছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমার কত আদরযত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে—সে যে কি আনন্দ বলতে পারি নে। একটু হুঁশ হতে দেখি যে শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতর ঢুকব? ওটাতে আমার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁশ এলো।"

শ্রীমায়ের থাকার জন্য ভক্তেরা বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ভাড়া নেন। সেইখানেই তিনি ছ' মাস অতিবাহিত করেন। গঙ্গার উপরেই বাড়ি—নিজের ঘর, সামনের বারান্দা—সকল জায়গা থেকে গঙ্গাদর্শন করতে পারার জন্য সারদাদেবী এই সময় বিশেষ আনন্দে দিন যাপন করেন। নিচের উদ্যান সংলগ্ন এই ঘাটটি আজও 'মায়ের ঘাট' নামে পরিচিত।

এই সময় একদিন কালী মহারাজ (স্বামী অভেদানন্দ) স্বরচিত একটি মাতৃস্তোত্র শোনান তাঁকে ঃ

প্রকৃতিং পরমাং বরদাং নররূপধরাং জনতাপহরাং।
শরণাগত সেবক তোষকরীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম॥
গুণহীন সুতানপরাধ যুতান কৃপয়াঽদ্যয় সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগর পার করীং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম॥
বিষয়-কুসুম পরিহৃত্য সদা চরণাম্বুরুহামৃত শান্তি সুধাং।
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাং, প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম॥
কৃপাং কুরু মহাদেবী শুভেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয় দাদেন কৃপাময়ি নামাঽস্তুতে॥
লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তুতে।
রামকৃষ্ণগত-প্রাণাং তন্নাম শ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাব রঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহু॥

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা
পবিত্রতাস্বরূপিন্যৈ তস্যৈ কুর্ম-নমোনমঃ ।।
দেবী প্রসন্নং প্রণতার্তিহন্ত্রীং,
যোগীন্দ্র পূজ্যাং যুগধর্ম পাত্রীং।
তাং সারদাং ভক্তি বিজ্ঞান দাত্রীং,
দয়া স্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ।।
স্নেহের বধ্নাসি মনোহস্মদীয়ং
দোষান অশেষাণ সগুণী করোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান
স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ।।
প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে,
নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দু চিরদগ্ধ চিত্তে
বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম ।।
জননীং সারদাং দেবী রামকৃষ্ণ জগদ্গুরুং।
পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ ।।

স্তোত্রটি শুনে প্রীত সারদাদেবী স্বামী অভেদানন্দকে আশীর্বাদ করলেনঃ "তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসবেন।"

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থানকালে যোগীন-মা ও গোলাপ-মার সাহচর্যে সারদাদেবী কঠোর তপশ্চর্যা করেন। একদিন রাত্রে এই ভাড়াবাড়ির ছাদে ধ্যান-নিরত অবস্থায় নিমগ্ন হন নির্বিকল্প সমাধিতে। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি এক গভীর আবেশের মধ্যে ছিলেন। স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের কাছে বলেছিলেন, 'এভাবে আর কিছুদিন থাকলে দেহে মন ফিরিয়ে আনা দুষ্কর হত।'

নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থানকালেই তিনি মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কাছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'র পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ শোনেন। ১১ জুলাই ১৮৮৮ শ্রীম পাণ্ডুলিপি নিয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পড়ে শোনান। শ্রীমা পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করেন এবং মহেন্দ্রনাথের প্রশংসা করেন। ২০ অক্টোবর (১৮৮৮) শ্রীমা মহেন্দ্রনাথের স্ত্রী নিকুঞ্জদেবীকে দীক্ষা দেন। পরে মহেন্দ্রনাথকেও মহামন্ত্র দান করেন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ লাভ করে।

নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়ির মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর সারদাদেবী বলরাম বসুর বাড়িতে (সম্ভবত ১ বা ২ নভেম্বর) আসেন এবং সেখান থেকে ৫ নভেম্বর (১৮৮৮) পুরী যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, সারদানন্দ, যোগীন-মা'র গর্ভধারিণী, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদেবী। তখনও স্থলপথে

পুরী গমনাগমনের ব্যবস্থা ছিল না সুতরাং ক্যানাল স্টিমারে কটক পৌঁছান। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত গোযানের ব্যবস্থা হয়। তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং সমস্ত রাত্রি গরুর গাড়ি চালিয়ে যান। সকালে পুরী পৌঁছেই তাঁরা প্রথমে যান জগন্নাথ দর্শনে। শ্রীরামকৃষ্ণ পুরী দর্শনে যেতে পারেননি। সেই কথা স্মরণ করে নিজের বস্ত্রাঞ্চলের আড়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি নিয়ে এসে তাঁকে জগন্নাথ দর্শন করান, বলেন, 'ছায়া কায়া ঘট পট সমান।' জগন্নাথ দর্শনের পর তিনি বলেন, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষ-সিংহ—রত্নবেদীতে বসে আছেন আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা করছি।" আবার অন্য একসময় বলেছিলেন, তিনি একবার স্বপ্নে পুরুষোত্তমকে শিবরূপে দর্শন করেছিলেন।

পুরীতে শ্রীমা ও মহিলাদের জন্য বলরাম বসুর 'ক্ষেত্রবাসীর মঠ'এ থাকার ব্যবস্থা হয়। পুরুষ ভক্তেরা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই জগন্নাথ দর্শনে যেতেন এবং নিতান্ত শরণাগত ভক্তের মতই উপস্থিত হতেন মন্দিরে। কৃষ্ণভাবিনীদেবী তাঁর যাতায়াতের জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারীকে। কিন্তু শ্রীমা সে ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে বলেন, "না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে। আমি দীনহীন কাঙালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ দর্শনে যাব। পুরীতে তিনি সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিই একে একে দর্শন করেন—লক্ষ্মী মন্দিরে মাঝে মাঝে ধ্যান করতেও যেতেন।

কিঞ্চিদধিক দু'মাসকাল পুরীতে কাটিয়ে সারদাদেবী কলকাতায় ফেরেন ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন কলকাতায় ফিরে তিনি 'নগা' নামক জনৈক ভক্তের বাড়িতে ওঠেন কিন্তু ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য শ্রীম'র ডায়েরী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। "Ma's pilgrimage to Jagannath 5th November 1888, Returns to our house Saturday at 12 noon— পৌ শু ১১ শী—12th Jan. 1889. (পঞ্জিকা অনুসারে ১২৯৫, ২৫ কার্তিক ৯ নভেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি, ২৫ পৌষ অশুদ্ধকাল। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সারদাদেবী ৮ নভেম্বর পুরী পৌঁছেই সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে যান কারণ পরদিন থেকে অকাল শুরু এবং স্বামী সারদানন্দের সারারাত —গোযান চালানোর কারণও এইখানেই নিহিত আছে। অকালান্তে ৮ জানুয়ারি তিনি পুরী থেকে যাত্রা শুরু করে ১২ জানুয়ারি কলকাতায় পৌঁছেছিলেন। পরদিন তিনি নিমতলায় গঙ্গা স্নান করেন এবং ২২ জানুয়ারি কালীঘাটে মাতৃমূর্তি দর্শন করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯, শ্রীমা কামারপুকুরের পথে যাত্রা করেন। মধ্যবর্তীকাল (মোট ২৪ দিন) তিনি কোথায় ছিলেন সেটা স্পষ্ট নয়। স্বামী অপূর্বানন্দ তাঁর

'জননী সারদাদেবী' গ্রন্থে লিখেছেন 'কিছুদিন আরও ভক্তগৃহে' অবস্থানের কথা। তিনিও 'নগা' নামক ভক্তের গৃহে মায়ের অবস্থানের কথা লিখেছেন কিন্তু শ্রীম-র ডায়েরীকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করলে সর্বপ্রথম তিনি শ্রীম'র গৃহেই ওঠেন। সেদিন বা তারপরদিন তিনি 'নগা' নামক ভক্তের গৃহে যান এবং সেখান থেকে অন্যান্য ভক্তদের গৃহে মোট ২৪/২৫ দিন অবস্থানের পর ৫ ফেব্রুয়ারি আঁটপুর যাত্রা করেন স্বামী প্রেমানন্দের মায়ের একান্ত অনুরোধক্রমে। আঁটপুরে তাঁর সহযাত্রী হন স্বামী বিবেকানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, সারদানন্দ, শ্রীম, সান্যাল মহাশয় প্রভৃতি। ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্যের মতে, শ্রীমায়ের সঙ্গে আঁটপুর যান স্বামী যোগানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ, নির্মলানন্দ, মাস্টার মহাশয় ও লক্ষ্মীদেবী। স্বামী বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল পূর্বেই আঁটপুরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে সকলে মিলিত হন।

সারদাদেবী আঁটপুরে অবস্থান করেন এক সপ্তাহ। সুতরাং অনুমান করা যায় ১২ বা ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি কামারপুকুর যাত্রা করে সেইদিনই সেখানে পৌঁছান।

১৯ মে একটি চিঠিতে শ্রীমাকে কথামৃতকার মহেন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন 'মা শরণাগত করো, সব শক্তি তো তোমারই।' আবার তার তিনদিন পর তিনি লেখেন। 'মা তুমিই বিপদনাশিনী, তুমি রক্ষা করো'। দুটি চিঠির উত্তরে শ্রীমা লেখেন, "সংসার জ্বলন্ত আগুন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হলে কি না হতে পারে!"

১৮৯০-এর প্রারম্ভে দোলযাত্রার পূর্বে ভক্তদের আগ্রহে শ্রীমা পুনরায় কলকাতায় আসেন অর্থাৎ কামারপুকুরে এবারের অবস্থানকাল প্রায় এক বছর। শ্রীম'র 'নোট' অনুযায়ী সেবার অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত সারদাদেবী কলকাতায় অবস্থান করেন। কিন্তু এই সময়ে অবস্থানের কোন বিস্তৃত বিবরণ বা প্রথমে কয়েকদিন কোথায় ছিলেন সে কথা জানা যায় না। কিছুদিন বেলুড়ে রাজু গোমস্তার ভাড়াবাড়িতে অবস্থানের পর ৪ মার্চ (১৮৯০) তিনি মাস্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়া টোলার লেনের বাড়িতে আসেন এবং সেই স্থান থেকেই ২৪ মার্চ প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী অদ্বৈতানন্দের সঙ্গে গয়া যাত্রা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃদেবীর পরলোকগমনের পর তিনি সারদাদেবীকে গয়াতে তাঁর পিণ্ডদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু পুত্র বর্তমানে, পুত্রবধূর পিণ্ডদান সঙ্গত কিনা, সে সম্পর্কে সারদাদেবীর মনে সংশয় ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন 'তা হবে গো হবে। ওখানে কি আমার যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরব?' সারদাদেবী অগত্যা সে ভার গ্রহণ করে শ্রীরামকৃষ্ণের গয়া যাত্রায় নিষেধ করেছিলেন। সারদাদেবী পিণ্ডদান কৃত্য শেষ করে এই সুযোগে বৈদ্যনাথধাম ও বোধগয়া দর্শন করেন। বোধগয়া দর্শন কালে সেখানকার ভিক্ষুদের থাকার সুচারু বন্দোবস্ত ও ধর্মানুশীলনের সুযোগ সুবিধা দর্শন করে

সারদাদেবী অভিভূত হন। তখনই তাঁর মনে পড়ে যায় শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানদের দুরবস্থার কথা, যাঁরা তাঁর নামে সংসার ত্যাগ করে আশ্রয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বামী অপূর্বানন্দ লিখেছেন, তিনি কৃষ্ণলাল মহারাজের কাছে শুনেছেন বোধগয়া থেকে ফিরে এসে শ্রীমা একবুক গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে তার ত্যাগী সন্তানদের মঠের জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীমার নিজের কথায় জানা যায়, "বোধগয়ার মঠ—তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই— দেখে কাঁদতুম আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হত' !"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, ছেলেদের আশ্রয় বা মঠের জন্য সারদাদেবীর আগ্রহ যে কতখানি প্রবল ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তী কালের অনেক কথাবার্তার মধ্যে। বেলুড় মঠ তৈরী হবার পর কোয়ালপাড়ার জনৈক সাধুকে তিনি বলেছিলেন, "আহা! এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু।... ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তাঁর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, '...তোমার নামে যারা বেরুবে, তাদের মোটা ভাত কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে এবং তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এ জন্যই তো তোমার আসা।' ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এ সব করলে।"

১৮৯০-এর ২ এপ্রিল সারদাদেবী কলকাতায় ফিরে শ্রীমা'র কাম্বুলিয়া টোলার গৃহে উঠলেন কিন্তু কয়েকদিন অবস্থানের পর তাঁকে যেতে হল বাগবাজারে, বলরাম বসুর গৃহে। বলরাম বসু তখন গুরুতর অসুস্থ—১৩ এপ্রিল (১৮৯০) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সারদাদেবী বলরাম বসুকে ঠাকুরের গৃহী ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন কারণ বলরাম বসুর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণর স্নেহ। বলরাম বসুর গৃহকে (বর্তমানে যা বলরাম-মন্দির) তিনি কলকাতার কেল্লা বলে অভিহিত করতেন। কলকাতায় এসে তিনি বলরাম বসুর গৃহে অনেকবার রাত্রি যাপন করেছেন। শ্রীমায়ের নিজের কথায় জানতে পারি: 'একবার যখন বলরামবাবুর স্ত্রী অসুস্থ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন 'যাও দেখে এস গে।' শ্রীমা বলেন 'যাব কিসে? গাড়ি-টাড়ি নেই।' উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে, হেঁটে যাও।' অবশ্য শেষে পালকি পাওয়া যায়, সেবার তিনি দক্ষিণেশ্বর থেকে পালকিতেই বলরাম-গৃহে উপস্থিত

হয়েছিলেন কিন্তু আর একবার শ্যামপুকুর থেকে পদব্রজেই বাগবাজার আসতে হয়েছিল, বসুগৃহিণীর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে-জুন, ১৮৯০) ভক্তেরা ঘুসুড়ি অঞ্চলে শ্মশানের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে সারদাদেবীর অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। জুলাই মাসে একদিন স্বামী অখণ্ডানন্দকে নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত হলেন মাতৃসকাশে। স্বামীজীর মনে তখন প্রব্রজ্যাগ্রহণের প্রবল আগ্রহ কিন্তু শ্রীমায়ের অনুমতি ছাড়া এত দীর্ঘ প্রবাস-যাপন সম্ভব নয়। সেই অনুমতির প্রার্থনা নিয়েই তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কয়েকটি ভক্তিসঙ্গীত গাইলেন, তারপর তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে বলেন, 'মা যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই আবার আসব নচেৎ এই-ই।' ব্যাকুল সারদাদেবীর কণ্ঠে শঙ্কা ফুটে উঠল। 'সে কি?' স্বামীজী তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বললেন, 'না না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' সন্তুষ্ট সারদাদেবী প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডানন্দকে সতর্ক করে দিলেন, 'বাবা তোমার হাতে আমাদের সর্বস্ব দিলুম। তুমি পাহাড়ের সকল অবস্থা জান, [স্বামী অখণ্ডানন্দ পূর্বেই তিব্বত পরিক্রমা করে এসেছিলেন] দেখো, যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট না হয়।' নরেন্দ্রনাথের আহারাদি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, সারদাদেবীকে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের জন্য বিশেষভাবে কিছু রান্না করার পরামর্শ দিতেন—সারদাদেবী নরেন্দ্রনাথের এই দিকটার কথা বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন।

ঘুসুড়ির বাড়িতে মায়ের অবস্থানকাল ভাদ্র মাস পর্যন্ত। এই সময় তিনি রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার সুবিধার জন্য বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়।

এই বাড়িতেই গিরিশচন্দ্র প্রথম মাতৃপদ স্পর্শ করেন। গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী শেষ শিশুপুত্রকে রেখে পরলোকগমন করেন ১৮৮৮-র ডিসেম্বরে। এই পুত্রটির প্রতি গিরিশের স্নেহ ছিল মাত্রাধিক এবং এর জন্য পরে তাঁকে অনেক দুঃখভোগও করতে হয়েছে—নিজের হাতে গড়া রঙ্গমঞ্চ থেকে ছাঁটাইও হতে হয়েছে। এই স্নেহাধিক্যের প্রথম কারণ তাঁর জন্মের পর থেকেই সে মাতৃহারা। দ্বিতীয়ত, এ সময় গিবিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে জন্মাবার প্রার্থনা জানান, কারণ তাতে তাঁকে অধিকতর সেবার সুযোগ লাভ করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্য সে প্রস্তাবে সম্মতি জানাননি। তার জন্য মত্ত অবস্থায় গিরিশ তাঁকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের দু'বছর পরে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হলে গিরিশ নিশ্চিতভাবে ধরে নেন যে ঠাকুর তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেছেন এবং তিনিই তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৮৯০-এর অক্টোবর মাসে (আশ্বিন-কার্তিক)

সম্ভবত স্বামী নিরঞ্জনানন্দের আগ্রহে সৌরীন ঠাকুরের বরাহনগরের বাড়িতে তিনি মাতৃসন্দর্শনে যান। এর আগে তিনি কখনও শ্রীমাকে দর্শন করেননি। একবার বলরাম বসুর বাড়ির ছাদে যখন শ্রীমা বেড়াচ্ছিলেন তখন গিরিশের বাড়ির ছাদ থেকে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গিরিশচন্দ্রের স্ত্রী মাকে দেখবার জন্য গিরিশকে ছাদে আহ্বান করেন কিন্তু আতঙ্কিত গিরিশ বলে ওঠেন, 'না, না আমার পাপনেত্র। এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।'

সারদাদেবী তখনও ভক্তদের কাছে দেখা দিতেন না। দু'একজন ছাড়া অন্য ভক্তদের কাছে মুখের অবগুণ্ঠনও উন্মোচন করতেন না। সাধারণত ভক্তেরা নিচে থেকে মাকে প্রণাম জানিয়ে চলে যেতেন। শিশুটির সঙ্গে কিন্তু শ্রীমায়ের পরিচয় ছিল—শ্রীমা মাঝে মাঝে গিরিশভবনে উপস্থিত হলে সে তাঁর ক্রোড়ে বসে স্নেহের আস্বাদ লাভ করেছে। তখন শিশুটির বয়স তিন বছর হলেও সে কথা বলতে পারত না কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে সব বুঝিয়ে দিত। এই বাড়িতে উপস্থিত হয়েই সে উপরে যাবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। জনৈক সেবক তার ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে মায়ের কাছে নিয়ে যান এবং সে মায়ের পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। নিচে নেমে আসার পর সে পিতাকে উপরে নিয়ে যাবার জন্য টানতে থাকে। গিরিশের মধ্যে পাপবোধ তখনও প্রবল— তিনি কিছুতেই উপরে যেতে রাজি নন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জিদের কাছে পরাস্ত হয়ে শিশুকে কোলে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উপরে উপস্থিত হলেন—অবগুণ্ঠনবতী মাতৃচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন, 'মা এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হল।'

এই প্রথম সারদাদেবীর ভক্তজননীরূপে আত্মপ্রকাশ।

রোগ উপশম হবার পর সারদাদেবী কিছুদিন বলরাম বসুর বাড়িতে অবস্থান করেন। কার্তিক ১২৯৭ অর্থাৎ ১৮৯০-এর নভেম্বর মাসে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী চলে যান।

সম্ভবত ১৮৯০-এর শেষের দিকে গিরিশের এই শিশুপুত্রটি মারা যায়। গিরিশচন্দ্র প্রবল বিশ্বাসে যে শিশুকে পুনরাবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং যে শিশু তাঁর মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন বহন করেছিল তার মৃত্যু যে গিরিশকে কতখানি মর্মান্তিকভাবে পীড়িত করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। তিনি থিয়েটারের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন করলেন।

এই সময় দিশাহারা গিরিশকে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ জয়রামবাটীতে মাতৃসকাশে গমনের পরামর্শ দিলেন। সেই পরামর্শমত তিনি গুরুস্থান কামারপুকুর দর্শন করে জয়রামবাটী পৌঁছান। এই কালেই গিরিশের কাছে সারদাদেবীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। একদিন আহারকালে আকস্মিকভাবে পরিবেশনরত সারদাদেবীর মুখ দর্শন করার সুযোগ পান। তখনই বিদ্যুচ্চমকের মতো তাঁর কাছে একটি রহস্যের

সমাধান হয়। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র প্রাণসংশয় ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তখনও তিনি রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে আসেননি বা তাঁর সঙ্গে পরিচিতও হননি। সেই সময় গিরিশ আচ্ছন্ন চেতনায় এক নারীমূর্তির দর্শন পান। চিকিৎসকরা যখন তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছেন তখন এই নারীমূর্তি তাঁর মুখে প্রসাদ দিয়ে বলেছিলেন, 'খাও, খেয়ে নাও, ভাল হয়ে যাবে।' ধীরে ধীরে তাঁর চৈতন্য সঞ্চারিত হবার পর তিনি ভেবেছিলেন, সেটা স্বপ্ন মাত্র। কিন্তু তখনও যে তাঁর মুখে টাটকা প্রসাদের স্বাদ! গিরিশ আরও রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়লেন যখন তিনি এই নারীমুখের সঙ্গে অন্য কোনও নারীর সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। কে এই নারী? ধীরে ধীরে গিরিশ সুস্থ হয়ে উঠলেন কিন্তু সেই রহস্য তাঁর কাছে অনুদ্‌ঘাটিতই থেকে গেল। সুদীর্ঘ ১৪ বছর পরে গিরিশচন্দ্র আকস্মিকভাবে মাতৃমুখ দর্শন করে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ, মা তুমি?' সারদাদেবীও অনুচ্চ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমি।' গিরিশচন্দ্রই প্রথম সারদাদেবীর কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান, তবে কৃপালাভ তিনি করেছিলেন নিজের অজ্ঞাতসারে, অযাচিতভাবে।

সংসার ও সমাজ তখন গিরিশের কাছে বিষবৎ। থিয়েটার করতে, নাটক লিখতে তাঁর আর আগ্রহ নেই। সব কিছু ত্যাগ করে তিনি বৈরাগ্যের জীবনকে বরণ করে নিতে চান। তিনি স্থির করলেন, সারদাদেবীর অনুমতি নিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করবেন। সেই সঙ্কল্পের কথা একদিন মাতৃসমীপে উত্থাপন করলেন। সারদাদেবী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন "তা কি করে হয়? ঠাকুর যে তোমাকে নাটকের মধ্যে দিয়ে লোকশিক্ষা বিস্তারের ভার দিয়ে গেছেন। তোমার সে পথ ত্যাগ করা চলবে না।" কিন্তু গিরিশের জেদ অসাধারণ—তর্কশক্তিও প্রবল। তিনি একটার পর একটা যুক্তি দেখিয়ে শ্রীমাকে তার সঙ্কল্প অনুমোদন করার জন্য মরীয়া হয়ে উঠলেন। কিন্তু সারদাদেবীর দৃঢ়তাও অসাধারণ—তিনিও নানাবিধ যুক্তি উপস্থিত করতে লাগলেন—রামকৃষ্ণ আন্দোলনে গিরিশের ভূমিকা থেকে কিছুতেই সরে আসতে দেবেন না—তাঁর মত পরিবর্তন দুঃসাধ্য। অবশেষে পরাজয়, মেনে নিলেন নাট্যকার। দীর্ঘ চারমাস অনভ্যস্ত গ্রামীণ জীবনযাত্রার সঙ্গে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে কাটিয়ে গিরিশ ফিরে এলেন কলকাতায়—মাতৃশক্তিতে উজ্জীবিত গিরিশ ভুলে গেছেন জীবনের সঞ্চিত ক্লেদ, গ্লানি। অন্তর থেকে স্ত্রী-পুত্রশোক এখন অনেকটাই স্তিমিত। কলকাতায় ফিরে এসে রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত পৌরাণিক নাটক 'জনা'—যার মধ্যে প্রাধান্য পেল মাতৃমহিমা।

সেবার ১০ নভেম্বর জগদ্ধাত্রীপূজা। পূজার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে স্বামী সারদানন্দ পৌঁছালেন জয়রামবাটীতে। তাঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সান্যাল, হরমোহন মিত্র, যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং কালীকৃষ্ণ (পরে স্বামী

বিরজানন্দ)। সুচারুভাবেই নিষ্পন্ন হল জগদ্ধাত্রীপূজা। কিন্তু তারপরই কলকাতা থেকে আগত সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে একে একে শয্যা নিলেন। শ্রীমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই—অন্ত নেই সেবাযত্নের এবং তজ্জনিত পরিশ্রমের। যা হোক শেষ পর্যন্ত সকলেই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৮৯২ খ্রীস্টাব্দটা সম্ভবত তিনি জয়রামবাটীতেই কাটিয়েছিলেন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি কামারপুকুর দর্শনে গিয়েছিলেন। সেই সময় অবশ্যই তাঁরা মাত্র কয়েক মাইল দূরবর্তী জয়রামবাটীতেও গিয়েছিলেন কিন্তু সেটা অনুমান মাত্র, তার কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র ১৮৯২-তে শ্রীমায়ের অবস্থান সম্পর্কে প্রামাণ্য সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না।[১] এপ্রিল, ১৮৯৩, মায়ের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের পত্র পৌঁছল—বিদেশগমনে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করে, তখনও তিনি গ্রামের বাড়িতে।

সারদাদেবী পড়লেন গভীর সঙ্কটে। নরেন্দ্রনাথের শক্তি সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সংশয় ছিল না কিন্তু সে সময় বিদেশগমনের কষ্ট ও অনিশ্চয়তাই তাঁর মধ্যে দ্বিধা সঞ্চার করে। মা হয়ে কেমন করে এতদূর দেশে ক্লেষকর জীবন যাপনের জন্য সন্তানকে অনুমতি দেন? অথচ নরেন্দ্রনাথের বিদেশগমনের প্রয়োজনীয়তাও তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। এই দ্বিধান্বিত অবস্থায় একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সাগরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং নরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করছেন তাঁকে অনুসরণ করতে। তাহলে নরেন্দ্রনাথের বিদেশগমনই ঠাকুরের অভিপ্রায়![২] তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল, সন্তান বাৎসল্য পরাস্ত হল, শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছার কাছে। তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনুমতিপত্র ও আশীর্বাদ পাঠালেন। আর মায়ের পত্র পেয়ে নরেন্দ্রনাথ শিশুর মত উল্লাসে ফেটে পড়লেন—তিনি কখনো পত্রখানি মাথায় নিয়ে নৃত্য করছেন কখনো বা তাঁর দুচোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু। আর কোন বাধা নেই, এবার

১। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য এর মধ্যে একবার বেলুড় মঠে মায়ের উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন কিন্তু সে সময় কোথায় এবং কতদিন ছিলেন সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। স্বামী গম্ভীরানন্দ পুরো সময়টাই জয়রামবাটী-কামারপুকুর অবস্থানের কথা বলেছেন।

২। স্বামী গম্ভীরানন্দ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে লিখেছেন, বিদেশ গমনের ব্যাপারে স্বয়ং স্বামীজী যখন দ্বিধাগ্রস্ত তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় তিনিও অনুরূপ দর্শন লাভ করেন এবং তা সত্ত্বেও মনস্থির করতে পারেননি। শ্রীমার অনুমতি পত্রে একই দর্শনের কথা জানতে পেরে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

মায়ের অনুমতিদানের পটভূমিকা সম্পর্কে আরও একটি সংবাদ পাওয়া যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভক্তমণ্ডলী রচিত 'লাইফ অব স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীমা স্বপ্ন দেখেন—ঠাকুর স্বামীজীর দেহে প্রবেশ করছেন অর্থাৎ পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণই বিবেকানন্দের আধারে কাজ করে যাবেন। অতীত স্বপ্নটির কথা স্মরণ করে শ্রীমা বিশ্বাস করেন, নরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরেরই ইচ্ছা।

তিনি স্বচ্ছন্দে বিদেশগমনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারেন কারণ স্বয়ং মা তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন। হায়দরাবাদ থেকে মাদ্রাজে মন্মথবাবুর গৃহে যখন ফিরলেন তখন তাঁর মুখ প্রভাত সূর্যের মত স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল। "হাঁ, পাশ্চাত্য—পাশ্চাত্য। আমি এখন প্রস্তুত। এসো আমরা উঠে পড়ে লাগি। স্বয়ং জগন্মাতা অনুমতি দিয়েছেন।" ৩১ মে নরেন্দ্রনাথ বোম্বাই ত্যাগ করে আমেরিকা পাড়ি দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত-ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "মায়ের কৃপা আমার উপর লক্ষ গুণ বড়—মায়ের দয়া, মায়ের আশীর্বাদ...তারকভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্বাদ করতে বলেছিলাম, তিনি যেমন আশীর্বাদ দিলেন আমি হুপ করে সাগর পার। এই বুঝ দাদা। এই শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার দিয়ে লড়াই করে টাকা রোজগার করছি, মায়ের মঠ হবে বলে। মায়ের কথা সময় সময় মনে করলে বলি, 'কো রামঃ'—ঐ যে বলছি, ঐখানটায় আমার গোঁড়ামি। রামকৃষ্ণপরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যাহা হয় বল, কিন্তু দাদা যার মায়ের উপর ভক্তি নেই তাকে ধিক্কার দিও।"

১৮৯৩-এর জুন-জুলাই মাসে (আষাঢ় ১৩০০) সারদাদেবী জয়রামবাটী থেকে বেলুড় মঠে আসেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল বর্তমান বেলুড় মঠের অনতিদূরে সেই নীলাম্বরবাবুর বাড়িতেই (তখনও অবশ্য বেলুড় মঠ হয়নি—এমনকি মঠের জমি-সংগ্রহও স্বপ্নমাত্র)। এখানে তাঁর অন্যতম সেবক ছিলেন ত্রিগুণাতীতানন্দ। জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই ভাড়াবাড়িতে কাটান।

এই নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থানকালে তিনি পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানের একটা পটভূমিকা আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীমা ভেবেছিলেন ঠাকুরই যখন চলে গেলেন তখন তাঁর আর বাঁচার প্রয়োজন কি? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, 'তোমার মরা হবে না, তোমায় থাকতে হবে।' এই থাকার উপযোগিতা তখনও শ্রীমায়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সুতরাং একরকম জীবন্মৃত অবস্থাতেই দিন কাটাতে লাগলেন। কোন কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। এমনকি কারও সঙ্গও তাঁর কাছে রুচিকব বলে বোধহয় না। সারদাদেবী যখন কাশীতে তখন একজন নেপালী সন্ন্যাসিনী তাঁকে পরামর্শ দেন, 'মাঈ, পঞ্চতপা কর।' সন্ন্যাসিনীর কথাতে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটল, ভাবলেন, অন্তরের দুঃসহ আগুন নিভতে পারে বাইরের আগুনের সংস্পর্শে এসে। মনে পড়ল ঠাকুরের কথা—তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ভাবধারা প্রচারের জন্য এখনও তাঁর শরীর ধারণের প্রয়োজন আছে। এই অবস্থায় কামারপুকুরে ফেরার পর বেশ কিছুদিন পল্লীগ্রামে কাটাল। সেই সময় তাঁর মনে পড়ে একটি দিব্য দর্শনের কথা। শ্রীমায়ের জবানীতে "ছেলেবেলায় দেখতুম আমারই মতো

একটি মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে থেকে, আমার সকল কাজে সহায়তা করত। দশ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত এরকম হত। ঠাকুর চলে যাবার থেকে প্রায়ই দেখতুম দাড়ি-টাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসী আমাকে পঞ্চতপা করতে বলতেন। প্রথম প্রথম আমি তেমন খেয়াল করিনি। পঞ্চতপা কি, তাও তত জানতুম না। তিনি এসেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।[১] বেলুড়ে এসে প্রথম যোগেন-মাকে জানালেন পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের কথা। যোগেন-মা উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'বেশ তো, আমিও করব।' নীলাম্বরবাবুর বাগানে পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের আয়োজন হল। একতলার ছাদে মাটি ফেলে পাঁচ হাত অন্তর ঘুঁটে দিয়ে চারদিকে আগুন জ্বলল—মাথার ওপর সূর্যের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ। ভক্ত-শিষ্য ময়মনসিংহ নিবাসী উমেশকান্ত দত্তের কাছে শ্রীমা পরে আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, "চারদিকে ঘুঁটের আগুন, উপরে সূর্যের তেজ। প্রাণে বড় ভয় ছিল। কি করে ওর ভেতরে যাব আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকব! পরে ঠাকুরের নাম করে ঢুকে দেখি আগুনের কোন তেজ নেই। এভাবে ৭ দিন কাজ করি। কিন্তু বাবা, শরীর যেন কালো ছাই হয়ে গিয়েছিল। এরপর আর সেই সন্ন্যাসীকে দেখিনি।"[২]

স্বামী অরূপানন্দের প্রশ্নের উত্তরে সারদাদেবী পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের উপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন।

অরূপানন্দ—"মা, লোকে এই যে দর্শনাদি করে, এসব কি ভাবে, না সাদা চোখে?"

মা—"সবই ভাবে। আমি কিন্তু সাদা চোখে দেখেছিলাম। কামারপুকুরে—গৈরিক পরা—রাধুর মত অতটুকু মেয়ে, [১১/১২ বৎসর] মাথায় রুখো চুল, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে—এই সামনে, এই পিছনে!

"তারপর বেলুড়ে— পঞ্চতপা করলুম—তখন নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। যোগেনও করলে। সেই সাধনটাধনের পর মিশে গেল, আর দেখিনি।"

অরূপানন্দ—"তপস্যায় কি দরকার?"

মা—"তপস্যার দরকার। এই যোগেনও কত উপবাস করে। খুব তপস্বী। গোলাপ জপে সিদ্ধ।

"নরেনের মা আমায় দেখতে এসেছিল। নরেন তাকে বললে, 'এই তো তুমি হয়ত তপস্যা করেছিলে বলে বিবেকানন্দকে পুত্র পেলে। আবার তপস্যা কর।

---

১ ও ২। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য উমেশচন্দ্রের কাছে মাতৃকথিত বিবরণী প্রসঙ্গে লিখেছেন "পঞ্চতপার যাবতীয় ব্যাপারে ৫ সংখ্যার সঙ্গে জড়িত। শ্রীমা ৫ দিনেই ব্রত সাঙ্গ করেছিলেন একথা অনেকেব নিকট শুনিয়াছি, উমেশ দত্ত ৫ দিনের স্থানে ৭ দিনের কথা এবং সন্ন্যাসীর স্থানে দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীর কথা লিখিয়াছেন। .... মার পক্ষে সন্ন্যাসী দেখাই স্বাভাবিক, যেহেতু ঐ মূর্তি তাঁহার প্রতিরূপ। এই পত্রে উমেশবাবু তাঁর স্মৃতিভ্রমের কথা স্বীকার করিয়াছেন," স্বামী গম্ভীরানন্দ অবশ্য উমেশচন্দ্রকে অনুসরণ করে ৭ দিন ও সন্ন্যাসীর কথাই লিখেছেন।

আবার হয়তো একটা পাবে।"

অরূপানন্দ—"পঞ্চতপাটপা করে কেন শরীরকে কষ্ট দেওয়া?"

মা—"পার্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন।"

অরূপানন্দ—"শিবও তো করেছিলেন। ধ্যানস্থ।"

মা—"হাঁ, এসব করতে হয় লোকের জন্য। নইলে লোকে বলবে 'কই সাধারণের মত খায়দায় আছে। আর পঞ্চতপাটপা! এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না? ঠাকুর সব সাধনা করেছেন—বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলাম, ছাঁচে তুলে নে'।"

বেলুড়ে অবস্থানকালে শ্রীমায়ের একটি দর্শন হয়। সেদিন পূর্ণিমা তিথি। চিরদিন গঙ্গার প্রতি আসক্তা সারদাদেবী গঙ্গার বাঁধানো সিঁড়িতে (মায়ের ঘাটে) বসেছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দ্রুত পদে গঙ্গায় নেমে যাচ্ছেন—তাঁর চিন্ময় দেহ গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশে গেল। বিস্মিত দৃষ্টিতে সারদাদেবী সেই দিকে তাকিয়ে ছিলেন—অকস্মাৎ দেখতে পেলেন নরেন্দ্রনাথ কোথা থেকে ছুটে এসে সেই গঙ্গাবারি দু'অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সামনে অগণিত মানুষ—সেই পবিত্রবারির স্পর্শে তারা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করছে। এই দৃশ্যটি তাঁর মনে এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এরপর কিছুদিন পাদস্পর্শ করে গঙ্গায় স্নান করতে পারেননি। বলতেন, 'এ যে ঠাকুরের দেহ, কি করে ওতে পা দি?' সেই সঙ্গে তাঁর আরও এক চেতনা জাগ্রত হল যে, ঠাকুর এসেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্যে। তাঁর প্রয়োজন আজও ফুরোয়নি। আজও তিনি জীবিতকালের মতই মানুষের মুক্তির জন্য সচেষ্ট। সেই মুক্তিপ্রয়াসে তাঁর নিজেরও একটি ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা গ্রহণের জন্যই তাঁর জীবনধারণ প্রয়োজন।

এই বাড়িতেই নাগমহাশয় (দুর্গাচরণ নাগ রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে নাগমহাশয় বলেই পরিচিত) শ্রীমায়ের প্রথম দর্শন লাভ করেন। নাগমহাশয় শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা বলে মনে করতেন এবং শ্রীমার প্রতি তাঁর আচরণও ছিল অনুরূপ। সেদিন একাদশী। নাগমহাশয় যখন এসে পৌঁছলেন তখন শ্রীমা আহারে বসেছেন। সারদাদেবী প্রদত্ত বিবরণ তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক ঃ"তখন কোন পুরুষ ভক্ত আমাকে [আমার] সাক্ষাৎ পেত না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করত। একজন ঝি এসে নাম করে আমাকে বলত, 'মা অমুকবাবু প্রণাম কচ্ছেন।' আমিও আশীর্বাদ করতাম। সেদিন ঝি বললে, 'মা নাগমহাশয় কে? তিনি প্রণাম করছেন, কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হয় রক্ত বেরোবে। মহারাজ[১]

১। স্বামী জগদীশ্বরানন্দের 'নবযুগের মহাপুরুষ' অনুযায়ী স্বামী প্রেমানন্দ। শ্রীমা কিন্তু স্বামী যোগানন্দের কথাই বলেছেন।

(স্বামী যোগানন্দ) পেছন থেকে এত বলছেন থামবার জন্য, কিন্তু কোন বাক্যই নেই—যেন হুঁশ নেই। পাগল না কি মা?' আমি বললাম,'যোগেনকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।' যোগেন নিজেই ধরে নিয়ে এল। দেখি কপাল ফুলে গেছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, চোখের জলে দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধরে বসালুম। কেবল 'মা, মা' শব্দ, যেন পাগল অথচ শান্ত, ধীর, স্থির। চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। আমার খাবার ছিল লুচি, মিষ্টি, ফল। আমি খেতে বসেছিলুম, এমন সময় এই ঘটনা। আমি কিছু খেয়ে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলুম। খেতে পারে না গো, খাবার জিনিস গিলতে পারলে না। বাইরের দিকে মন নেই, কেবল 'মা, মা' রব আর আমার পায়ে হাত দিয়ে বসে রইল। আমাকে মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার তো খাওয়া হল না। মহারাজকে বলি, একে সরিয়ে নিতে।' আমি বললুম, 'থাক, একটু স্থির হয়ে নিক।' খানিকবাদে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ও ঠাকুরের নাম করতে করতে তার হুঁশ হল। আমিও খেতে লাগলুম। ওকেও খাইয়ে দিলুম। খাওয়া হলে তাকে নীচে নিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, নাহং নাহং, তুহুঁ, তুহুঁ', যারা কাছে ছিল তাদের বললুম, 'দেখ কি বুদ্ধি।' আমার জন্যে সব করতে পারত গো।"

মায়ের প্রসাদ লাভ করে নাগমহাশয় নিচে নেমে পুলকিত কণ্ঠে বলেছিলেন, বাপের চেয়ে মা দয়াল।

আরও একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন সারদাদেবী; (ঘটনাটির স্থান কাল সম্পর্কে কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে পূর্বোক্ত ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই এটি ঘটেছিল কারণ আষাঢ় মাস আমের সময় এবং এখানে ওখানে ঘোরার উল্লেখ আছে। নাগমহাশয় কখনও জয়রামবাটী যাননি)। "একবার ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে বাড়ির গাছের ভাল ভাল আম এক টুক্‌রি নিয়ে এল। মনে ভাব, বসে আমাকে খাওয়াবে। কিন্তু মুখে কিছুই বলা নেই। টুক্‌রী মাথায় নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছে। যোগেন বলে পাঠালে, 'মাকে বল, নাগমহাশয় আম নিয়ে এসেছেন। কিছু বলছেনও না, কারও কাছে দেনও না। আমি বললুম, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।' পাঠিয়ে দিলে টুকরি মাথায় করেই এল। একজন ব্রহ্মচারী মাথা থেকে টুকরি নাবিয়ে নিলে। তখনও ঠাকুরপূজা হয়নি। আমাকে প্রণাম করেই পূর্বের মত বেহুঁশ। মুখে ঠাকুরের নাম ও 'মা, মা' রব। দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। খুব ভাল আম কতগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া। কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল। মেয়ে যোগেন এসে একখানা শালপাতা করে প্রসাদ দিলে। আমি কিছু খেলুম ও গোলাপকে বললুম 'আর একখানা শালপাতা দাও'। পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে দিয়ে

বললুম, 'খাও।' কে খাবে! তার শরীরে হুঁশ নেই, হাত যেন অবশ। আমি ধরে অনেক বলতে বলতে খেলে ত না-ই, একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘসতে লাগল। আমি নিচে বলে পাঠাতেই তারা এসে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হতেই নাকি চলে গেছে শুনলাম।"

॥ ৯ ॥

সম্ভবত জগদ্ধাত্রীপূজার আগে সারদাদেবী জয়রামবাটী ফিরে যান। পৌষ মাসে অর্থাৎ ১৮৯৪'র জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে বলরাম বসুর কন্যা ভুবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। বলরাম বসুর স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী এই নিদারুণ আঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তখন স্থির হয় তাঁর বায়ু পরিবর্তনের এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সাময়িক মুক্তিদানের জন্য স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্কল্প শ্রীমা যদি তাঁর সঙ্গে যান তবেই তিনি অন্যত্র যেতে প্রস্তুত কারণ একমাত্র তাঁরই সান্নিধ্যে তাঁর মানসিক শান্তি ফিরতে পারে। বলরাম বসুর পরিবারের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্ক এবং তাঁর তিরোভাবের পর যেভাবে বসু পরিবার শ্রীমার সেবা করে আসছেন সে কথা চিন্তা করে কৃষ্ণভাবিনীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি মাঘ মাসে দেশ থেকে কলকাতায় বলরাম বসুর বাড়িতে পৌঁছান। বিহারের অন্তর্গত আরার আট মাইল দূরবর্তী বসুদের জমিদারী কৈলোয়ারে যাওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং সেই মত তাঁরা অচিরেই যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দেবীর জননী, গোলাপ-মা, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী যোগানন্দ ও তাঁর পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী এবং স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। সেখানে তাঁরা দুমাস অবস্থান করেন।

সেবিকা শ্রীমতী সরযূবালার কাছে সারদাদেবী কৈলোয়ার প্রবাসের কাহিনী বলেছিলেন ঃ "দু'মাস আরা জেলায় কৈলোয়ার বলে এক দেশে ছিলুম, সেখানকার জলবায়ু ভাল বলে। সঙ্গে গোলাপ, বাবুরামের মা, বলরামের পরিবার—এরা সব ছিল। সে দেশে কি হরিণ, মা, সব দল বেঁধে তিন কোণা হয়ে 'ব'-এর মত চলেছে। দেখতে না দেখতে এমন ছুট দিলে, সে আর কি বলবো, যেন পাখা ধরে উড়ে যাচ্ছে। এমন দৌড় দেখিনি। আহা! ঠাকুর বলতেন, হরিণের নাভীতে কস্তুরী হয়, তার গন্ধে দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা থেকে গন্ধটি আসছে। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ছুটে মরছে।

"ও দেশের লোকের কত দুঃখ জান? ও দেশে ছোট ছোট খেজুর গাছ, তাতে রস হয়। শিয়ালে এসে রস খেয়ে ফেলে; তাই লোকেরা মাটিতে গর্ত করে সারারাত্রি তাতে দাঁড়িয়ে থাকে। গর্তের মুখে তাদের মাথার উপর মাটির খোলা দিয়ে রাখে; মাঝে মাঝে মাথা তুলে দেখে আর 'দূর দূর' করে শিয়াল তাড়ায়।"

কৈলোয়ার থেকে কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন অবস্থানের পর আনুমানিক এপ্রিল মাসে সারদাদেবী জয়রামবাটী ফিরে যান কিন্তু কিছুদিন পর সম্ভবত সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে আবার ফিরে এসে বেলুড়ে অবস্থান করেন।

স্বামী প্রেমানন্দের মা মাতঙ্গিনীদেবী আঁটপুরে দুর্গোৎসব করতেন। মাঝে কয়েকবছর বন্ধ থাকার পর (১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে) আবার নতুন করে পূজা আরম্ভ। মাতঙ্গিনীদেবীর একান্ত ইচ্ছা শ্রীমা স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাঁর পূজার আয়োজনকে সার্থক করে তুলুন। তাঁর ইচ্ছানুসারে সারদাদেবী স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতা শান্তিরাম ঘোষের সঙ্গে যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও স্বামী সারদানন্দকে নিয়ে আঁটপুর গমন করেন। স্বভাবতই মায়ের উপস্থিতি দুর্গাপূজাকে বিশেষভাবে আনন্দমণ্ডিত করে তুলেছিল এবং আঁটপুর নিবাসী ভক্তগণ তাঁর সান্নিধ্যলাভ করে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তখন আমেরিকায়, তাঁর কাছেও মায়ের উপস্থিতিতে আঁটপুরে দুর্গাপূজাব সংবাদ পৌছয় কিন্তু তিনি মাতঙ্গিনীদেবীর কাজকে সমর্থন করতে পারেননি। ঘটনাটির প্রসঙ্গ টেনে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "বাবুরামের মা'র বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গাপূজা করতে বসেছে।"

এই পত্রেই শ্রীমার প্রতি স্বামীজীব ভক্তি প্রবলভাবে উৎসারিত হয়েছে। এই পত্রেই লিখেছেন, "গিরিশ ঘোষ মাযের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য।" (শ্রীমা বলেছেন, "গিবিশবাবু কতক কতক টাকা দিযেছে বৈ কি। আর আমায় দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুব বাড়িতে।" অনুমান করি শ্রীমা ১৮৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে যখন থাকতেন তখন তাঁর যাবতীয় ব্যয়ভার গিরিশচন্দ্র বহন করতেন। তবে একটানা দেড় বছর তিনি কখনও নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে থাকেননি।)

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে স্বামীজী লেখেনঃ "আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে দেবে। মা-ঠাকরুণের জন্য একটি জায়গা, আমার টাকাকড়ি মজুত; তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমি দেখে শুনে কেনো।"

॥ ১০ ॥

আঁটপুর থেকেই শ্রীমা ফিরে যান জয়রামবাটীতে।

শ্রীমায়ের একটি আন্তরিক ইচ্ছা ছিল স্বীয় গর্ভধারিণীকে তীর্থদর্শন করাবেন। ভক্তেরা তাঁর ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁদের তীর্থদর্শনের ব্যবস্থা করে দেন। শ্রীমা তাঁর জননী ও অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলেন এবং সম্ভবত ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে (১৩০১ বঙ্গাব্দের শেষদিকে) কাশী হয়ে বৃন্দাবন পৌঁছান। কাশীতে তিনি যথারীতি বিশ্বনাথ দর্শন ও পূজাদি করেন। পূর্বে যখন তিনি কাশী এসেছিলেন তখন তাঁর প্রাণ সদ্য স্বামী বিয়োগের বেদনায় কাতর, তাই কিছুটা যান্ত্রিকভাবেই বিভিন্নস্থান ও মন্দিরগুলি দর্শন করেছিলেন। বহির্জগত তখন তাঁর কাছে শূন্য। কিন্তু এবার সারদাদেবী অনেকখানি প্রশান্ত। উভয়ে বিশ্বনাথের পূজা দেন। বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালার সময় তাঁর একটি দিব্য দর্শন হয়। তিনি বলেন, "অনাদি লিঙ্গ দেখতে পাচ্ছি না, ঠাকুর এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালি সবই তাঁর পায়ে পড়ছে। আমার অবস্থা দেখে মা আমায় জড়িয়ে ধরেন।" পূর্ববারে অসি মাধব দর্শন হয়নি। অসি মাধবের জগন্নাথ রূপ। সেই বিগ্রহ দর্শন করে তিনি বলে ওঠেন, "ও মা, কাশীতেও জগন্নাথ এসে বসে আছেন। তা বেশ হয়েছে, যিনি জগন্নাথ, তিনিই বিশ্বনাথ।"

মন্দিরের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি সধবা স্ত্রীলোক কোথা থেকে ছুটে এসে শ্রীমায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন। বিস্মিত শ্রীমা প্রশ্ন করেন, "কেন এমন করলে মা, একা মেয়েমানুষ, তুমি এখানে এলেই বা কেমন করে?"

উত্তরে সেই স্ত্রীলোকটি বলেন, "ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম—আমার ইষ্টদেবী বলছেন, 'আমায় যদি দেখতে চাস, ফুল বেলপাতা নিয়ে চলে আয় অসিঘাটে—তুই প্রথম যাকে দেখতে পাবি সেই আমি। আমি দূর থেকে প্রথম আপনাকে দেখতে পেয়েছি। তাই আপনার পায়ে অঞ্জলি দিলুম। এই ফলটিও আপনি দয়া করে গ্রহণ করুন।' স্মিত মুখে সারদাদেবী ফলটি গ্রহণ করে তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেন, 'তোমার ইষ্টলাভ হোক মা।'

কাশীতে ঠিক কদিন কাটিয়েছেন বলা যায় না। এরপর তাঁরা চলে যান বৃন্দাবনে এবং এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে অবস্থান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জননী শ্যামাসুন্দরী, ভ্রাতাগণ, গোলাপ-মা, যোগেন-মা

ও স্বামী যোগানন্দ। কলকাতায় ফিরে তাঁর আত্মীয়-স্বজন দেশে ফিরে গেলেও সারদাদেবী মাস্টারমহাশয়ের কলুটোলাস্থিত ৫১, ভবানী দত্ত লেনে প্রায় এক মাস অবস্থানের পর ১৩ মে ১৮৯৫ কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটীতে ফিরে যান।

বসুমতী (১৩৬০)-তে প্রকাশিত শ্রীমায়ের তিনখানি পত্র থেকে জানা যায় তিনি আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে জয়রামবাটীতে ছিলেন। একটি চিঠিতে শ্রীমা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাস্টারমহাশয়)-কে 'কথামৃত' রচনায় উৎসাহিত করে লিখেছিলেন "যে বিষয়গুলি অর্থাৎ ঠাকুরের যে কথাগুলি বলিবার জন্য বাছিয়া রাখিবার কথা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া বাছিয়া রাখিবেন।"

জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে সারদাদেবী মাঝে মাঝেই অদূরবর্তী কামারপুকুরে যেতেন। মাস্টারমহাশয়কে লিখিত একটি পত্র (২৬/১১/৯৫-এর পোস্ট মার্ক যুক্ত) থেকে জানতে পারা যায় সে-সময় তিনি তখন কামারপুকুরে অবস্থান করছেন, সঙ্গে ছিলেন গোলাপ-মা—সেখানে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। কিছুদিন পরে ফিরে যান জয়রামবাটীতে।

বৃন্দাবন থেকে সারদাদেবী একটি পিতলের ছোট বালগোপাল মূর্তি এনেছিলেন। জয়রামবাটীতে তিনি সেটিকে সাধারণভাবে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেলে রেখেছিলেন। একদিন তিনি ঘরে শুয়ে আছেন এমন সময় দেখেন ছোট্ট গোপাল হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর চৌকীর কাছে এসে অনুযোগের সুরে বলছে, "তুমি আমায় ফেলে রেখে দিয়েছ—খেতে দাও না, পূজা কর না। তুমি আমায় পূজা না করলে কেউ করবে না।" শ্রীমা তখন উঠে গোপালকে বাইরে এনে তার চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করলেন। পরে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁর নিত্যপূজিত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির পাশে রেখে দেন এবং তখন থেকে তাঁর নিত্যপূজা শুরু হয়।

১৮৯৬-এর এপ্রিলের শেষার্ধে বলরাম বসুর পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে শ্রীমা কলকাতায় এসে ৫৯/২, রমাকান্ত বসু স্ট্রিটে শরৎ সরকারের গৃহে অবস্থান করেন।

এই সময় স্বামীজীর একটি চিঠি মাকে পড়ে শোনানো হয়। সম্ভবতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে লেখা তারিখবিহীন (কেবলমাত্র ১৮৯৫ উল্লিখিত, পত্রসংখ্যা ১৫৬) পত্রটিই মাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল। সে পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন, "দুনিয়া ভেসে যাবে—দয়া, দীন, উপকার—মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রীপুত্র নপুং ব্রহ্মমাত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত...।

If there is inequality in nature, still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger

(প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে)...

"The poor, the downtrodden, the ignorant let these be your God (দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ — এঁরাই তোমার ঈশ্বর হোক)।"

পত্রখানি মায়ের অন্তর স্পর্শ করে, তিনি বলেন, "নরেন হল ঠাকুরের হাতের যন্ত্র। তিনি তাঁর ছেলেদের ও ভক্তদের দিয়ে তাঁর কাজ করাবেন বলে, জগতের কল্যাণ করবেন বলে নরেনকে দিয়ে এইসব লিখাচ্ছেন।"

এক মাস পরে (মে মাসের শেষার্ধে) সারদাদেবী বাগবাজারে গঙ্গার তীরে সরকার বাড়ি লেনের ভাড়াবাড়িতে চলে যান। এই বাড়িটিকে বলা হত 'গুদাম বাড়ি' কারণ একতলায় ছিল হলুদের গুদাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা বাসোপযোগী ছিল। তিনতলায় শ্রীমা, গোপালের মা, গোলাপ-মা থাকতেন এবং দ্বিতীয় তলায় স্বামী যোগানন্দ ও দু-একজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে থাকতেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, মায়ের সেবাকাজের তদারকির জন্য।

এই বাড়িতে থাকাকালে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই মাকে প্রণাম করতে আসতেন। নভেম্বর মাসে কালীপূজার পর (জগদ্ধাত্রীপূজাব আগে) গিরিশ এলেন মায়ের চরণবন্দনা করতে। কাউকে কিছু না বলে তিনি স্বামী যোগানন্দকে ডেকে নিয়ে গম্ভীরভাবে উপরে চলে গেলেন। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও তাঁকে অনুসরণ করে মায়ের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গিরিশচন্দ্র অবগুণ্ঠিতা শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে যুক্ত করে বললেন, "মা তোমার কাছে যখন আসি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট শিশু, নিজের মায়ের কাছে যাচ্ছি। আমি বয়স্ক ছেলে হলেও তোমার সেবা করতে পারতুম কিন্তু সবই উলটো ব্যাপার, তুমিই আমাদের সেবা কর, আমরা তোমার করি না। এই তো জয়রামবাটী যাচ্ছ। সেখানে পাড়াগাঁয়ে উনুনের পাশে দেশের লোকের জন্য রাঁধবে আর তাদের সেবা করবে। আমি কেমন করে তোমার সেবা করব? আর মহামায়ীর সেবার আমরা কীই বা জানি?" কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ আবেগদীপ্ত হয়ে উঠল। একটু পরে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভগবান ঠিক আমাদেরই মত মানুষ হয়ে জন্মান—এটা বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে শক্ত। তোমরা কি ভাবতে পার যে, তোমাদের সামনে পল্লীবালার বেশে জগদম্বা দাঁড়িয়ে আছেন? তোমরা কি কল্পনা করতে পার যে, মহামায়ী সাধারণ স্ত্রীলোকের মত ঘরকন্না ও আর সবরকম কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামায়া, মহাশক্তি—সর্বজীবের মুক্তির জন্য এবং মাতৃত্বের আদর্শ স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন?"

এই দিন সকলে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে শ্রীমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসেন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ পরিক্রমা শেষ করে বজবজে এসে পৌছান এবং স্টিমারে রাত্রিযাপন করে পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহে এলে অভূতপূর্ব জনসম্বর্ধনা লাভ করেন। সারদাদেবী তখন জয়রামবাটীতে। তাঁর সংবাদের মধ্যে এইটুকু জানা যায় ৪ জুলাই (১৮৯৭) তিনি কথামৃত রচনায় দ্বিধাগ্রস্ত শ্রীমকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এক সময় তিনিই [শ্রীরামকৃষ্ণ] তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা প্রকাশ না হইলে লোকের চৈতন্যলাভ হইবে নাই জানিবে।"

১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ সারদাদেবী কলকাতায় এলে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়। প্রায় দেড় বৎসর জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে রামকৃষ্ণ সংঘের নানা পরিবর্তন ঘটেছে। ১৮৯৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান বেলুড় মঠের জমির বায়না দেওয়া হয়েছে। ১৩ ফেব্রুয়ারি আলমবাজার থেকে মঠ নীলাম্বরবাবুর ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ৫ মার্চ বেলুড় মঠের জমি পাকাপাকিভাবে রেজেস্ট্রি হয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের স্থায়ী আস্তানার ব্যবস্থা হয়েছে। ১৪ মার্চ স্বামীজী বহুভক্তসহ মাতৃসন্দর্শনে যান।[১]

শ্রীমার্গারেট নোব্‌ল্ (পরে ভগিনী নিবেদিতা) ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ কলকাতায় এসে্ পৌছান। ১৭ মার্চ তিনি শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী ওলি বুলের সঙ্গে প্রথম মাতৃসন্দর্শনে যান। সেই সাক্ষাৎকারকালে শ্রীমা 'আমার মেয়ে' বলে তাঁদের সস্নেহে গ্রহণ করেন। তাঁরাই প্রথম বিদেশী যাঁরা শ্রীমায়ের দর্শন লাভ করেন। এই সাক্ষাৎকারের কথা জানিয়ে নিবেদিতা একটি পত্রে লিখেছিলেন, 'আমরা গেলেই ফল খেতে দেওয়া হয়। তাঁকেও দেওয়া হল—সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই ফল তিনি একসঙ্গে গ্রহণ করলেন !! এর দ্বারা আমরা মর্যাদা লাভ করেছি এবং আমাদের ভাবী কাজের পথ পরিষ্কার হয়েছে যা অন্য কিছুতে হতে পারত না। খুব মজার না !' অভিভূত নিবেদিতা সেদিন তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন

১। পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাগমনেব পর স্বামী বিবেকানন্দ কবে প্রথম মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন সে বিষয়ে পরস্পরবিরোধী বিববণ পাওয়া যায়।

সঠিক তারিখ পাওয়া না গেলেও তাঁর প্রথম সাক্ষাতের দুটি বিবরণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন, স্বামী শুদ্ধানন্দ বলিয়াছিলেন, আমেরিকা হইতে ফিরিয়া স্বামীজী মাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা স্বামীজীর গুণকীর্তন করিয়া বলিলেন,'তুমি যা করেছ এমনটি আর কেউ করেনি।' স্বামীজী কহিলেন, 'এ সব কি ছাইপাশ বলছ। এ সব আমি করেছি না তুমি করেছ ! তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মত লাখো বিবেকানন্দ করতে পার তা কি জানি না ?' মা হাসিতে লাগিলেন।

মায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ বলেছিলেন, স্বামীজী বিশ্বজয় করে এসে যেদিন মায়ের চরণ বন্দনা করলেন সেদিন (তাঁর ভাষায়)"রাজার মত চেহারা,ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো, জোড় হাতে বললো, 'মা সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়'।"

'A Day of Days' (একটা দিনের মত দিন)।

শ্রীমায়ের এই আচরণ শুধু নিবেদিতাকে নয় স্বামীজীকেও বিস্মিত করেছিল। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, 'মা এখন এখানে আছেন। সেদিন ইউরোপীয়ান ও আমেরিকান মহিলারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। ভাবতে পারো, মা তাদের সঙ্গে এমনকি আহার পর্যন্ত করেছেন। এটা কি দারুণ ব্যাপার নয়।'

শ্রীমতী বুল ম্যাক্সমুলারকে একটি পত্রে মায়ের সঙ্গে তাঁদের প্রথম কি কথা হয়েছিল (অবশ্যই দোভাষী মারফৎ) তা জানিয়েছেন। তাঁরা মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন গুরুর কাছে আনুগত্য বলতে কি বোঝায়? সারদাদেবী উত্তরে বলেন, "কাউকে গুরু নির্বাচন করলে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাঁর সব কথা শুনতে বা মানতে হবে কিন্তু ঐহিক বিষয়ে নিজের সদ্‌বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কাজ করলে—সে কাজ যদি গুরুর অননুমোদিত হয়, তবুও গুরুকে শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।"

৯ এপ্রিল শ্রীমাকে ভক্তেরা নীলাম্বরবাবুর বাগানে নতুন অস্থায়ী মঠে নিয়ে যান, তাঁর সঙ্গে স্বামী যোগানন্দ, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল (পরে স্বামী ধীরানন্দ) এবং গোলাপ-মা। তাঁর নৌকা বেলুড়ের ঘাটে পৌঁছলে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীগণ তাঁকে মঠে সাদর অভ্যর্থনা জানান (ইতিপূর্বে শ্রীমা কয়েকবার নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে অবস্থান করলেও মঠে তাঁর এই প্রথম আগমন)। সারদাদেবী মঠের ঠাকুরঘরে পূজা ও ভোগ নিবেদন করেন। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেলা ৪টায় যখন কলকাতায় ফেরার জন্য নৌকায় আরোহণ করছেন তখন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল মারফৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীমাকে অনুরোধ করে পাঠালেন, মা যেন একবার মঠের জন্য ক্রীত জমিতে পাদস্পর্শ করে যান। শ্রীমা সেই অনুরোধ রক্ষার্থে নৌকা-যোগেই গিয়ে পৌঁছলেন মঠের জমিতে, যেখানে আজ বেলুড় মঠ স্থাপিত। তখন সবেমাত্র স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তত্ত্বাবধানে মঠের নির্মাণকার্য শুরু হয়েছে। জমির উপর একটি মাত্র পুরাতন বাড়ি ছিল—সেখানে তখন বাস করছিলেন তিন বিদেশিনী—ভগিনী নিবেদিতা (ইতিমধ্যেই তিনি স্বামীজীর কাছ থেকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা ও 'নিবেদিতা' নাম পেয়েছেন), শ্রীমতী ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী বুল। তাঁরা সারদাদেবীকে সাদরে অভ্যর্থনা করে মঠের জমি দেখালেন। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে শ্রীমা মন্তব্য করলেন, "এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গোঁজার জায়গা হল—ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।"

মহাষ্টমীর দিনে স্বামী বিবেকানন্দ এলেন বোসপাড়া লেনে মাতৃসন্দর্শনে—তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ। তার কয়েকদিন পূর্বে তিনি পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে অমরনাথ,

ক্ষীরভবানী ইত্যাদি পরিক্রমা করে ফিরেছেন। শ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্বামীজী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,"মা, এই তোমার ঠাকুর। কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আসত বলে সেই ফকিরটা অভিশাপ দিলে, 'হেগে হেগে তিনদিনের মধ্যে এই জায়গা ছেড়ে পালাতে হবে।' আর তাই কি না আমার হল। সামান্য একটা ফকিরের শক্তি ঠাকুর রোধ করতে পারলেন না?" উত্তরে সারদা দেবী বললেন, "বাবা শঙ্করাচার্যও তো শুনতে পাই এমনি করে নিজের শরীরে রোগ আসতে দিয়েছিলেন। তোমার শরীরে রোগ আসতে দেওয়া আর নিজের শরীরে রোগ আসতে দেওয়া একই কথা। তিনি তো ভাঙতে আসেননি, গড়তে এসেছিলেন। সবই বিদ্যা, বিদ্যাকে তো মান্য করা চাই। তিনি তো হাঁচি, টিকটিকি পর্যন্ত মেনে গেছেন।" অভিমানী বিবেকানন্দের ক্ষোভ তাতেও প্রশমিত হল না, বললেন,"তুমি যাই বল না কেন, আমি মানি না?" শ্রীমায়ের তাৎক্ষণিক উত্তর, "না মেনে থাকবার কি যো আছে? তোমার টিকি যে বাঁধা।" সাশ্রুনয়নে স্বামীজী মায়ের দুটি পা জড়িয়ে ধরলেন।

উত্তর ভারত পরিদর্শন সেরে ভগিনী নিবেদিতা নভেম্বরের কয়েকদিন কলকাতায় শ্রীমার সঙ্গে একত্র বাস করেন। সেই সময় শ্রীমতী বুল ও ম্যাকলাউডও কলকাতায় ছিলেন। বিদেশিনী মহিলাদের সঙ্গে একত্রেই আহার করতেন শ্রীমা। এই সময় শ্রীমতী বুলের ইচ্ছায় শ্রীমার প্রথম ফটো গ্রহণ করা হয়—ফটোগ্রাফার ছিলেন জনৈক বিদেশী—মিঃ হ্যারিংটন। লজ্জাশীলা সারদাদেবী ফটোগ্রহণে প্রথমে রাজি হননি কিন্তু বিদেশী মেয়ের একান্ত অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তি টেঁকেনি। নিবেদিতা তাঁর বেশভূষা ঠিক করে দেন কিন্তু ফটো তোলার পর দেখা গেল তাঁর দুটি পা সম্পূর্ণ ঢাকা অবস্থায় ছবি উঠেছে। কিন্তু শ্রীমতী বুলের ইচ্ছা, মায়ের ফটো দেশে নিয়ে গিয়ে নিত্যপূজা করবেন—সুতরাং তাঁর একান্ত অনুরোধ পদাঙ্গুলি অনাবৃত রাখতে হবে। সারদাদেবী স্বভাবতই এ প্রস্তাবে প্রথমে তীব্র আপত্তি করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়ের জিদের কাছে তাঁকে হার মানতে হল এবং উন্মুক্ত পদাঙ্গুলি সমেত দ্বিতীয় ছবি তোলা হল—যেটি আজও সর্বত্র পূজিত।

১২ নভেম্বর প্রভাতে সারদাদেবী বেলুড় মঠে যান। তখন মঠের প্রাথমিক নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত। মঠভূমিতে ঠাকুরের প্রতিকৃতিসহ উপস্থিত হয়ে তিনি স্বহস্তে পূজা করেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। সম্ভবত স্বামীজী স্বয়ং তাঁকে মঠের চতুঃসীমা ঘুরিয়ে এনে বলেছিলেন, "মা তুমি আপনার জায়গায়, আপন মনে হাঁফ ছেড়ে বেড়াও।" সারদাদেবী পরে বলেছিলেন, "আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপারে ওই জাযগাটিতে—যেখানে এখন (বেলুড়)

মঠ, কলাবাগান-টাগান, তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন।" অপরাহ্ণে তিনি ফিরে আসেন কলকাতায়।

ইতিমধ্যে নিবেদিতা মায়ের আশ্রয় ছেড়ে ১৬ বোসপাড়া লেনে বসবাস শুরু করেছেন কারণ তিনি অনুমান করেছিলেন তাঁর সঙ্গে একত্র বাস করা হয়ত সারদাদেবীর বিড়ম্বনার কারণ হতে পারে।

এই ১৬ বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাসভবনে ১৩ নভেম্বর (১৮৯৮) কালীপূজার দিন (অর্থাৎ বেলুড় মঠে মায়ের পদার্পণ ও পূজার পরদিন) নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সেদিন সারদাদেবী স্বয়ং ঠাকুরের পূজা করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শুরু হল বিদ্যালয়ের যাত্রারম্ভ—বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের একটি নতুন পর্ব।

॥ ১১ ॥

৯ ডিসেম্বর (১৮৯৮) রামকৃষ্ণ সংঘের ইতিহাসে এক স্বর্ণ-অক্ষরা দিন। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ভস্মাবশেষ (যা তাঁর ত্যাগী ভক্তেরা গোপনে সরিয়ে রেখে এতদিন বলরামবাবুর গৃহে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে এসেছেন) বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে একটি বেদীর উপর স্থাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁর গৃহী ভক্তেরা পূতাস্থি ও ভস্মে একটি কলস পূর্ণ করে কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে স্থাপন করেন ও পরে তার ওপর মন্দিরও নির্মিত হয়েছে।

সেদিনের অনুষ্ঠানের পর কিছু ভক্ত অবস্থান শুরু করেন নতুন মঠ বা বর্তমান বেলুড় মঠে—অন্যেরা থেকে যান নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ২ জানুয়ারি, ১৮৯৯ নীলাম্বরবাবুর বাড়ি পরিত্যাগ করে সকলে পাকাপাকিভাবে নিজেদের বহু প্রতীক্ষিত আশ্রয় বেলুড় মঠে চলে আসেন। এর মধ্যে একদিন (২০ ডিসেম্বর ১৮৯৮) সারদাদেবী কিছুক্ষণের জন্য বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৮৯৯-এর ২৮ মার্চ সারদাদেবীর দীর্ঘদিনের একান্ত সেবক যোগানন্দ স্বামী মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন। সেই সময় ভগিনী নিবেদিতা মায়ের কক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর বর্ণনায় শ্রীমায়ের প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যায়। ম্যাকলাউডকে ৩০.৩.৯৯ তারিখের পত্রে তিনি লিখেছেন, I went to the Mother who was in tears—Jogin-ma who has nursed continually for months lay on the floor without a word or a tear. I was there a long time when we heard 'Hari om' from 50 to 60 voices down-stairs and the mother told hurriedly to go and see. (মায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম তিনি কাঁদছেন। যোগীন-মা, যিনি মাসের পর মাস [স্বামী যোগানন্দের] সেবা করেছিলেন, অশ্রুশূন্য নির্বাক হয়ে মেঝেতে পড়েছিলেন। আমি অনেকক্ষণ ছিলাম, এমন সময় নিচের তলা থেকে ৫০/৬০ জনের কণ্ঠে 'হরি ওঁ' শোনা গেল—মা তাড়াতাড়ি আমায় বললেন গিয়ে দেখে আসতে)।

স্বামী যোগানন্দের অবস্থার যখন ক্রমাবনতি হচ্ছে তখন সারদাদেবী যোগানন্দের সেবার জন্য তাঁর স্ত্রীকে আনতে চাইলে যোগানন্দজী আপত্তি করেন কিন্তু তবুও শ্রীমা তাঁকে আনিয়ে মৃত্যুপথযাত্রী যোগানন্দের সামনে উপস্থিত করে

বলেন, "একে উপদেশ দাও।" যোগানন্দজী তখন ঐহিক সম্পর্কের অতীত অনন্ত অসীমতার পথযাত্রী। তিনি মাকে বলেন, 'সে সব তুমি বুঝবে।' শেষদিন যখন আসন্ন তখন একদিন জনৈক সেবক উপরে পূজার ফুল পৌছে দিতে গিয়ে দেখেন মা পা ছড়িয়ে বসে আছেন—তাঁর দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। সেবক সারদাদেবীকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতেই তাঁর রুদ্ধ আবেগ প্রশ্ন হয়ে উঠল, 'আমার ছেলে যোগেনের কি হবে বাবা?' সেবক অবশ্য তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন,'উদ্বেগের কারণ নেই, মহারাজ সেরে উঠবেন।' উত্তরে তিনি বলেন, "বাবা আমি যে দেখেছি। ভোরবেলায় দেখলুম ঠাকুর নিতে এসেছেন।" এবার সংযমের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে গেল, দুকুল ছাপানো কান্নায় আপ্লুত হয়ে পড়লেন। একটু পরে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করে সেবককে বললেন, "কাউকে বলো না, বলতে নেই।"

অপরাহ্ণ তিনটা দশ মিনিটে যোগীন মহারাজের শেষ নিঃশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিয়রে উপবিষ্ট কৃষ্ণলাল মহারাজ উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। সেই ক্রন্দনস্বর দ্বিতলে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমাও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কণ্ঠে কেঁদে উঠলেন। জনৈক সেবক তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মায়ের পায়ের ওপর মাথা রেখে তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতেই তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "তুমি যাও, যাও। আমার যোগেন আমায় ফেলে চলে গেল—" পরদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে গভীর বেদনায় বললেন, "বাড়ির একখানা ইট খসল—এবার সব যাবে।"

যোগানন্দ স্বামীর মৃত্যুতে শ্রীমা কতখানি ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাঁকে কতখানি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর পরবর্তীকালে স্বামী অরূপানন্দের কাছে স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়ঃ

"যোগেনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগেনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত, বলত, 'মা তীর্থেটীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন।' সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকত। মেয়েদের কাছে থাকত বলে ওরা (ছেলেরা) ঠাট্টা করত। যোগেন আমাকে বলত, 'মা তুমি আমাকে যোগা যোগা বলে ডাকবে।'

"যোগেন যখন দেহ রাখলে, সে বললে, 'আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর।'

"যোগেনকে (ঠাকুর) অর্জুন বলতেন।... শরৎ [স্বামী সারদানন্দজী] আর যোগেন—এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।"

যোগীন মহারাজ কোন এক সময় শ্রীমাকে একটি লেপ তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। বহু ব্যবহারে জীর্ণ লেপটি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়। সারদাদেবী নতুন কাপড় দিয়ে সেটির আবার সংস্কার করার জন্য কোনও একজন

ভক্তকে দিয়েছিলেন কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হয়, তাহলে সেটি তো আর অবিকৃত থাকবে না, ওর সঙ্গে, ওর জীর্ণ কাপড়ের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে তাঁর স্নেহের সন্তানের স্মৃতি। ভক্তকে ডেকে পাঠিয়ে তিনি নিষেধ করলেন, বললেন, 'এই লেপ যোগীন দিয়েছিল, দেখলেই তাকে মনে পড়ে।' সুতরাং কোন সংস্কার না করেই তিনি ফেরৎ নিয়ে তুলে রেখে দেন।

২০ জুন (১৮৯৯) স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য গমন করেন—তাঁর সঙ্গে যান স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। যাত্রার দিন দুপুরে এই দুই বিদেশযাত্রী ও অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের সারদাদেবী আহারের নিমন্ত্রণ জানালেন। সকলকে পরিতোষ সহকারে আহার করানোর পর তিনি স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দজীকে আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিলেন। বেলা ৩টায় তাঁরা ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রা করলেন প্রিন্সেপ ঘাট অভিমুখে।

২ আগস্ট (১৮৯৯) সারদাজীবনে আর এক আকস্মিক মর্মান্তিক আঘাত এলো—যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ সবেমাত্র ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করে বেরিয়েছেন। হঠাৎ কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুশিয়রে উপস্থিত শ্রীমাকে তিনি বলেছিলেন, "দিদি এরা সব রইল, তুমি এদের দেখো।" সেদিনের সেই ভারগ্রহণ তাঁর জীবনকে কতখানি ক্লেশকর যন্ত্রণাদায়ক করে তুলেছিল, তা পরবর্তী কালের ঘটনায় জানা যাবে। অভয়চরণকে তিনি প্রায় নিজেব সন্তানের মতই মানুষ করেছিলেন, তাঁর উদ্যোগেই অভয়চরণ ডাক্তারী পড়াব সুযোগ পান। অভয়চরণের মৃত্যুর সময় তাঁর স্ত্রী সুরবালা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পিত্রালয়ে। বাল্যে মাতৃহারা সুরবালা দিদিমা ও মামীমার কাছে প্রতিপালিত। অভয়চরণের মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই লোকান্তরিত হলেন দিদিমা–মামীমা ও রোগে শয্যাশায়ী। সারদাদেবী কনিষ্ঠ ভ্রাতার শেয অনুরোধ রক্ষাব জন্য সুরবালাকে জয়রামবাটীতে এনে রাখলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সুরবালার মামীমা ও মারা গেলেন। পর পর এতগুলি আঘাতে সুববালার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল এবং সারদাদেবীর পরবর্তী জীবন এই বিকৃত মস্তিষ্ক ভ্রাতৃজায়াকে নিয়ে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল।

৩০ অক্টোবর সারদাদেবী কলকাতা থেকে জয়রামবাটী ফিরে যান সম্ভবত আসন্নপ্রসবা সুরবালার তত্ত্বাবধানের জন্য। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি সুরবালা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। সারদাদেবীর পরবর্তী জীবনের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় এই কন্যা—রাধারানী বা রাধু। শ্রীরামকৃষ্ণ তিরোভাবের পর তাঁর জীবনে যে শূন্যতা ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে স্বপ্নে নির্দেশ দেন, রাধুকে অবলম্বন করে জীবনধারণের

জন্য। বিকৃতমস্তিষ্কা সুরবালার পক্ষে সন্তান পালনের অনিশ্চয়তার কথা স্মরণ করে শ্রীমা কুসুমকুমারী নামক এক স্ত্রীভক্তের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন রাধুর প্রতিপালনের জন্য।

৯ ডিসেম্বর স্বামীজী বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন যে কারণে তাঁকে পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের মধ্যপথে কলকাতায় ফিরতে হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাঁর একান্ত সেবক সেভিয়ারের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হবার জন্য তিনি ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় পৌঁছে সংবাদ পেলেন সেভিয়ার ইতিমধ্যে পরলোকগমন করেছেন। শ্রীমতী সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্যে স্বামীজী অচিরে মায়াবতী যাত্রা করলেন।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব। সারদাদেবী সে উৎসবে যোগদান করেছিলেন—যোগদান করেছিলেন স্বামীজীও। শ্রীমার তখন আশ্রয় ১৬-এ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়ি—সঙ্গে শিশুকন্যাসহ সুরবালা। এই বাড়ির পাশে ছিল একটি সঙ্কীর্ণ গলিপথ। একদিন রাত্রে সেই গলিপথে চোর এসে শ্রীমায়ের রান্নাঘরে প্রবেশ করে। তখন শেষ রাত। চিরদিনের অভ্যাসমত সেদিনও সুরবালা শেষ রাতে উঠে একটি প্রদীপ নিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করে অকস্মাৎ চোরটিকে দেখে প্রবল চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যান। সকলের শুশ্রূষায় তাঁর জ্ঞান ফিরলেও মানসিক রোগ প্রবল হয়ে ওঠে। অগত্যা সারদাদেবী তাঁকে নিয়ে আবার দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করলেন। যোগীন-মা কিন্তু এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিলেন না—তিনি ব্যবস্থা দিলেন কুসুমকুমারী যেভাবে রাধুকে দেখাশোনা করছে তাতে মায়ের দেশে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। কুসুমকুমারীর সঙ্গে সুরবালা রাধুকে নিয়ে দেশে ফিরে যান—আপাতত মা থাকুন কলকাতায়। এই অবস্থায় সারদাদেবী পড়লেন দ্বিধায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জপ করতে করতে ভাবদৃষ্টিতে দেখতে পান শিশুকন্যাটি উন্মাদিনী মায়ের হাতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করছে, এমনকি তার প্রাণসংশয়ও উপস্থিত। জপ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন তিনি। যোগীন-মাকে তখনই ডেকে এনে তাঁর জপকালীন ভবিষ্যৎ দর্শনের কথা জানিয়ে দৃঢ়ভাবে দেশে যাওয়ার সঙ্কল্প প্রকাশ করলেন। সেই ব্যবস্থামত সুরবালা, রাধু ও খুড়া নীলমাধবকে নিয়ে তিনি দেশে যাত্রা করেন—তবে যাত্রার সঠিক তারিখ অজ্ঞাত। একমাত্র ভানুপিসি রয়ে গেলেন কলকাতায়। আবার সারদাদেবী কলকাতায় ফিরে আসেন দুর্গোৎসবের আগে।

২৯ আগস্ট, ১৯০১ একটি পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ মহেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়কে[১] লিখছেন, "মা ঠাকরুণ দয়া করে যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে আমি কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু মঠের সবাই বলছে যে, নীলাম্বরবাবুর বাড়ি, এমনকি বেলুড় গ্রামই এ মাসে ও পরের মাসে ম্যালেরিয়ায় ছেয়ে যায়। তারপর ভাড়াও অত্যধিক। সুতরাং মা-ঠাকরুণ যদি আসতে চান, তবে আমি তাঁকে এই পরামর্শ দিই যে, তিনি কলকাতায় একটি ছোট বাড়ি ঠিক করুন। ...ফল কথা, প্রভু তাঁকে যেরূপ চালান, তিনি সেইরূপই চলবেন। আমরা শুধু প্রস্তাব করতে পারি, আমরা যা বলব, তা একেবারে ভুলও হতে পারে। তিনি যদি থাকার জন্য নীলাম্বরবাবুর বাড়িই পছন্দ করেন, তবে ভাড়া ইত্যাদি আগে থেকেই ঠিক করে রেখো। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আমি তো এইটুকুই বুঝি।"

আবার ৭ সেপ্টেম্বর (১৯০১) স্বামীজী মহেন্দ্রনাথকেই লিখেছেন, "সারা বছরের জন্য বাড়ি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা ভেবেচিন্তে করতে হবে। একদিকে যেমন এ মাসে বেলুড়ে ম্যালেরিয়া হবার ভয় আছে, অন্যদিকে তেমনি কলকাতায় প্লেগের ভয়। তাছাড়া কেউ যদি গাঁয়ের ভিতরে যাওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকে, তবে ম্যালেরিয়া থেকে বেঁচে যেতে পারে; কারণ নদীর ধারে ম্যালেরিয়া মোটেই নেই। প্লেগ এখনও নদীর ধারে আসেনি, আর প্লেগের প্রকোপকালে এ গাঁয়ে যে-কটা বাড়ি ছিল, সবই মাড়োয়ারিদের দ্বারা ভরতি।

তাছাড়া, সবচেয়ে বেশি তুমি কত ভাড়া দিতে পারো তা জানাও, আমরা তদনুযায়ী বাড়ি দেখব। আর একটা প্রস্তাব হচ্ছে বাড়িটি কলকাতায় নেওয়া।... যত শীঘ্র সম্ভব এ দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারো ততই ভালো: (১) মা বেলুড়ে থাকবেন না কলকাতায়? (২) যদি কলকাতায় থাকেন তবে ভাড়া কত এবং কোন পাড়ায় থাকা তাঁর পক্ষে ভাল?"

সম্ভবত আশ্বিনের মাঝামাঝি সারদাদেবী কলকাতায় আসেন এবং বোসপাড়া লেনেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। সেই বৎসরই মঠে প্রথম দুর্গোৎসব হয়। দুর্গোৎসবের সময় কয়েকজন স্ত্রীভক্তসহ তাঁর বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। মঠে দুর্গোৎসবের সিদ্ধান্ত হলে প্রশ্ন ওঠে—কার নামে পূজা হবে। সে প্রশ্নের মীমাংসা করে দেন স্বামীজী: 'আমরা কপনিধারী, আমাদের নামে পূজা হবে না।' সুতরাং স্থির হল সারদাদেবীর নামেই পূজা হবে। এখনও মঠে সারদাদেবীর নামেই দুর্গাপূজা হয়। সারদাদেবীর ইচ্ছানুসারে পূজায় পশু বলিদান নিষিদ্ধ হয়। শ্রীমায়ের সেবক কৃষ্ণলাল মহারাজ পুরোহিতের কার্য পরিচালনা করেন এবং তন্ত্রধারক হন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী। স্বামীজী মার হাত দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে ২৫ টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলেন।

১। মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন দার্জিলিঙের উকিল। স্বামীজী তাঁর কাছে কিছুদিন ছিলেন। মনে হয় এই সময় মহেন্দ্রনাথ মায়েব কলকাতা অবস্থানের খরচ বহন করেন।

এই দুর্গোৎসবকালে (স্বামীজীর উপস্থিতিতে প্রথম দুর্গোৎসবই তাঁর জীবনের শেষ দুর্গোৎসব) কৌতুকজনক একটি ঘটনার কথা শ্রীমা বলেছিলেন, "নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা [দুর্গাপূজা] যেবার করায় সেবার পূজার দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা খাটছে। নরেন এসে বলে কি 'মা আমার জ্বর করে দাও।' ও মা বলতে না বলতে খানিকবাদেই হাড় কেঁপে জ্বল এল। আমি বলি, 'ও মা, এ কি হল, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম, এই জন্যে যে ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথায় ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকবো, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসবো, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজ কর্ম চুকে আসতেই আমি বললুম, 'ও নরেন, এখন তাহলে ওঠ।' নরেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম আর কি!' এই বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল।"

স্বামীজী সেবার নিজের গর্ভধারিণী মাকেও মঠে এনেছিলেন, একথা জানা যায় শ্রীমায়ের স্মৃতিচারণ থেকেঃ "সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ-বাগান ও-বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে নরেন এই সব করেছে।" নরেন তখন তাকে এসে বলে, 'ওগো তুমি করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস না—লঙ্কা ছিঁড়ে, বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এ সব করেছে। তা নয়—যিনি করবার তিনিই করেছেন—নরেন কিছুই নয়।'

সম্ভবত বছরের শেষের দিকে সারদাদেবী সুরবালা ও রাধুসহ দেশে ফিরে যান।

॥ ১২ ॥

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধি। সারদাদেবী তখন দেশের বাড়িতে। নরেন্দ্রের তিরোভাব সংবাদ তাঁর কাছে কি ভাবে পৌঁছয়, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কি হয়, এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে পরবর্তীকালের একটি পত্রে, একটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁর উদ্‌ঘাটিত হৃদয়কে খুঁজে পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গে আসার আগে পত্রটির পটভূমিকা জানা প্রয়োজন।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারির প্রথমে স্বামীজী মায়াবতী যান প্রয়াত মিঃ সেভিয়ারের বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে। সেখানে গিয়ে তাঁর এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়। মায়াবতীতে অদ্বৈত আশ্রমের 'প্রসপেক্‌টাসে' (প্রস্তাবিত কর্মপন্থায়) দেখা যায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের মনন ও অনুশীলনের জন্য। রামকৃষ্ণ সংঘেব মধ্যে অন্তত একটি কেন্দ্র নিরাকার অদ্বৈতচর্চার জন্য নির্দিষ্ট হয়। স্বামীজীর অভিপ্রায় ছিল তাই। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতে পান, একটি ঠাকুরঘর তৈরী হয়েছে—সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের পটপূজা, ধূপধুনো, ফলমূল দিয়ে ভোগারতিও চলছে। সে দৃশ্যে তিনি বিরক্ত হলেও তখনই কোন মন্তব্য করেননি কিন্তু সেদিনই সন্ধ্যায় সমবেত সকলের কাছে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলেন। কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও তিনি ঠাকুরঘরটি ভেঙে দিয়ে যাঁরা এটি তৈরী করেছিলেন তাদের মনে আঘাত দিতে চাননি। পরে বেলুড় মঠে ফিরে তিনি বলেছিলেন, "ভেবেছিলুম, অন্তত একটি কেন্দ্রেও তাঁর বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে। হায়! গিয়ে দেখি বুড়ো ওখানেও জেঁকে বসে আছে।" স্বামীজীর এই মনোভাবের দরুন পূজা বন্ধ হয়ে যায়—ঠাকুরঘরটিও বন্ধ হয—অবশেষে সেটি ভেঙে ফেলা হয়।

স্বামীজীর এই মনোভাব তাঁর যে সব শিষ্যেবা মন্দিরটি গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা নিঃসংশয়ে মানতে পারেননি। সম্ভবতঃ স্বামীজীর তিরোভাবের অল্প কিছুদিন পরে স্বামী বিমলানন্দ (তাঁর পত্রের সাল তারিখ জানা যায় না) সারদাদেবীকে একটি পত্র দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত জানতে চান। সেই পত্রের উত্তরে ৩১ আগস্ট (১৯০২) সারদাদেবী লিখেছিলেন,[১]

১। সাবদাদেবী নিজে হাতে কখনও চিঠি লিখতেন বা হযত পাবতেন না। অন্য কেউ তাঁব শ্রুতি লেখক বা লেখিকাব কাজ কবতেন। চিঠি লেখাব পব সেটি তাঁকে পড়ে শোনানো হত—তিনি অনুমোদন বা সংশোধন কবতেন।এ চিঠিটিও অন্যেব হস্তাক্ষবে. চিঠিটিব প্রাসঙ্গিক অংশ বানান ভুল সমেত উদ্ধৃত।

জয়রামবাটী
১৩০৯/১৫ ভাদ্র

নিরাপদেষু,

পরমশুভাশীর্বাদবিশেষ

বাবাজী, ১ খান পত্র পাইয়া জ্ঞাত আছি। **শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই।** তোমাদের গুরু জিনি তিনি ত অদ্বৈত—তোমরা সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি যোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।... মঠে সাবধানে থাকিবে। **আর স্বামীজীর যোর নাই।** আমরা সকলে ভাল আছি। তোমাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি—

তোমাদের মাতা
আশীর্বাদীকা

এখানে স্বামীজীর তিরোভাব সম্পর্কিত কথা দুটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমটিতে রয়েছে নির্বাক শোকস্তব্ধতা এবং দ্বিতীয়টিতে রামকৃষ্ণ সংঘ যে শক্তিতে অগ্রসর হয়ে চলেছিল তার শূন্যতা সম্পর্কে সচেতনতা। রামকৃষ্ণ-তিরোভাবের পর সারদাদেবীর আবার নতুন অসহায়তার অনুভূতি।

পত্রটিতে মায়াবতী আশ্রম সম্পর্কিত স্বামীজীর নির্দেশের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন সারদাদেবীর আত্মিক শক্তির পরিচয়বাহী।

এই চিঠি স্বামী বিমলানন্দের কাছে পৌঁছয় ৭ সেপ্টেম্বর।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জয়রামবাটী যান। কলকাতায় অবস্থানের পরবর্তী প্রামাণ্য সূত্র পাওয়া যায় ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪। মধ্যবর্তী প্রায় আড়াই বছরের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। হয়ত ইতিমধ্যে তিনি কলকাতায় এক বা একাধিকবার এসেছেন কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই আমাদের হস্তগত হয়নি। ১৯০৪-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি শ্রীমা কলকাতায় ফিরে স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থা অনুযায়ী ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের ভাড়াবাড়িতে অবস্থান করেন। শ্রীমতী ওলি বুল এই সময় থেকেই মায়ের জন্য মাসিক ৬০.০০ হিসাবে দেওয়া শুরু করেন। বাগবাজার স্ট্রিটে অবস্থানকালে সারদাদেবীর সঙ্গে ছিলেন খুল্লতাত নীলমাধব, ভানু পিসি প্রভৃতি আরও অনেকে। চিরকুমার নীলমাধব একসময় পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে পাচকের কাজ করতেন—শেষ বয়সে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি সারদাদেবীর কাছেই আমৃত্যু অতিবাহিত করেন। সে-সময়

সারদাদেবীর ভক্তগণ নানাবিধ ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন প্রায় প্রত্যহ নিয়ে আসতেন। তার বেশির ভাগ অংশ আহার করতেন নীলমাধব। ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ এ ব্যাপারে অনুযোগ করলে সারদাদেবী বলতেন, 'বাবা খুড়োর আর ক'দিন? সাধ মিটিয়ে দেওয়াই ভাল। আমরা এখন অনেকদিন বাঁচব, অনেক খেতে পাব।' এদিকে তাঁর পোষ্য সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে—সুরবালা, রাধু ছাড়াও আছেন ভানু পিসি, নলিনী প্রভৃতি স্বজনেরা এবং গোলাপ-মা। যোগীন মহারাজের মৃত্যুর পর থেকে স্বামী সারদানন্দ তাঁর যাবতীয় দেখাশোনার ভারগ্রহণ করেছেন—রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে তিনি আজও মায়ের ভারী নামেই পরিচিত।

এই বাড়ির অনতিদূরেই নিবেদিতার বালিকা বিদ্যালয়। সেই সময় তাঁর এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। সারদাদেবী যেমন বিদ্যালয়ের যাবতীয় সংবাদ গ্রহণ করতেন তেমনি নিবেদিতা, সুধীরাদেবী প্রমুখেরা তাঁর সেবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পেতেন। বিদ্যালয়ের ঘোড়ার গাড়িতেই শ্রীমা যেতেন গঙ্গাস্নানে—ছুটির দিনে সেই ঘোড়ার গাড়িতেই কখনও কখনও গড়ের মাঠে, চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে কোম্পানীর বাগানে (বোটানিক্যাল গার্ডেন্স্-এ) বা কালীঘাটে যেতেন এবং সেই সুযোগে কিছু পায়ে হেঁটেও বেড়াতেন, যা কলকাতার ভাড়াবাড়িতে সম্ভব ছিল না। এই চলে ফিরে বেড়াবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাতরোগ-প্রশমন। দক্ষিণেশ্বর থেকেই তাঁর এই রোগের সূত্রপাত—শেষের দিকে এই রোগের তীব্রতার ফলে, তাঁকে খুঁড়িয়ে চলতে হত।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের রথযাত্রার দিন সারদাদেবী এন্টালীর শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনালয়ে উৎসবে যোগদান করেন এবং কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে জন্মাষ্টমীর দিন উৎসবে উপস্থিত হন। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মীদেবী, গোলাপ-মা, নলিনী ও রাধু। যোগোদ্যানের তৎকালীন অধ্যক্ষ যোগবিনোদ মহারাজের অনুরোধক্রমে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করতে হয়। সারদাদেবী সাধারণত পুরুষভক্তদের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ আবৃত না করে উপস্থিত হতেন না। ভাদ্রের প্রচণ্ড গরমে চাদরমুড়ি দিয়ে তাঁর ক্লেশের অন্ত ছিল না কিন্তু তার জন্য মুখে কোন অভিযোগ ফুটে ওঠেনি। বাসায় ফিরে একমাত্র গোলাপ-মার কাছে তাঁর সারাদিনের যন্ত্রণার কথা জানিয়েছিলেন।

এই সময় একদিন গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে সারদাদেবী মিনার্ভা থিয়েটারে 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর নাটক'—দেখতে যান। সেদিন সাধকের (ভণ্ড সাধু) ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন গিরিশচন্দ্র। থাকোমণির সঙ্গে তাঁর কপট-প্রেমের অভিনয় দর্শন করে শ্রীমা কৌতুক বোধ করলেও হাসতে হাসতে মন্তব্য করেছিলেন 'এ বয়সে আর কেন?' অবশ্য বিল্বমঙ্গলের একনিষ্ঠ প্রেম তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের শেষে অথবা ডিসেম্বরের প্রথমে (১৩১১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি) সারদাদেবী সদলবলে পুরী যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খুড়া নীলমাধব, স্বামী প্রেমানন্দ, লক্ষ্মীদেবী, গোলাপ-মা, নিকুঞ্জদেবী (শ্রীম'র স্ত্রী), চুনীলাল বসুর স্ত্রী, আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি। একমাত্র স্বামী প্রেমানন্দ ছাড়া অন্য সকলেই বলরাম বসুর বাড়ি ক্ষেত্রবাসীর মঠে অবস্থান করেন—প্রেমানন্দজীর থাকার ব্যবস্থা হয় বলরাম বসুরই অন্য একটি বাড়ি শশী-নিকেতনে।

পুরী পৌঁছেই সকলে গেলেন জগন্নাথ দর্শনে। শ্রীমায়ের জন্য রত্নবেদী খালি করে সকল মূর্তি দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। সারদাদেবী স্বহস্তে আশুতোষ মিত্র ও নীলমাধবের মস্তক রত্নবেদীতে স্পর্শ করিয়ে বলেন, "গুরু ইষ্ট একত্রে দেখতে হয়।"

সারদাদেবীর ইচ্ছানুসারে ক্ষেত্রবাসীর মঠে একদিন পাণ্ডা এসে পুঁথি থেকে জগন্নাথ বিগ্রহের ইতিহাস ও মাহাত্ম্য পাঠ করে শোনান। সেদিন ৫০ জন পাণ্ডার পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজনেরও ব্যবস্থা ছিল।

পুরী অবস্থানকালে সারদাদেবীর পায়ে একটি ফোড়া হয়। এর জন্য তিনি অতিশয় কষ্ট পাচ্ছিলেন অথচ কিছুতেই অপারেশন করাবার সম্মতি দিচ্ছিলেন না। প্রেমানন্দ স্বামী একদিন একজন অল্পবয়সী ডাক্তার ডেকে আনলেন। পূর্ব ব্যবস্থামত তিনি সাধারণ ভক্তরূপে উপস্থিত হয়ে মাকে প্রণাম করতে চান। অবগুণ্ঠনবতী শ্রীমা তাঁর সামনে উপস্থিত হতে তিনি প্রণামের ছলে নিচু হয়ে ফোড়ার মুখটি চিরে দিয়ে 'মা, আমার অপরাধ নেবেন না' বলে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য। অবগুণ্ঠনবতী বলে তিনি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি কিন্তু তারপর আশুতোষ মিত্র যখন টিপে টিপে পুঁজ রক্ত বার করে দিলেন তখনই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুরু করলেন ভর্ৎসনা। পূর্বে সংগৃহীত নিমপাতার জলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দেবার পর শ্রীমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চাদর খুলে বললেন, 'আঃ আরাম হল।' আশুতোষ মিত্রই নিয়মিত ৩/৪ দিন ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কাজ করে তাঁকে যন্ত্রণামুক্ত করেন।

এই সময় একদিন সারদাদেবী অত্যন্ত গোপনে আশুতোষ মিত্রকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে দেন মাতা শ্যামাসুন্দরী ও মধ্যম ভ্রাতা কালীকুমারকে পুরীতে নিয়ে আসার জন্য। এই গোপনীয়তার কারণ হল, বিকৃতমস্তিষ্কা সুরবালা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ সারদাদেবীর স্নেহের অংশীদার হোক, এটা বরদাস্ত করতে পারতেন না এবং তাই নিয়ে রীতিমত অশান্তির সৃষ্টি করতেন। যথাসময়ে আশুতোষ মিত্র জয়রামবাটী পৌঁছে শ্যামাসুন্দরী ও কালীকুমারকে পুরী যাওয়ার আহ্বান জানালে কালীকুমার নিজের শ্বশুরবাড়ি গেলেন সংবাদ দিতে। ফলে পুরী যাত্রীর

দল হয়ে দাঁড়াল বিরাট—শ্যামাসুন্দরী, কালীকুমার, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ী এবং দুটি ছেলে। এ ছাড়াও গ্রামস্থ এক বৃদ্ধ সদগোপ সীতারাম ঘোষও এই দলে যোগ দিলেন, অবশ্য নিজ অর্থব্যয়ে। আবার এর কিছুদিনের মধ্যে সস্ত্রীক বরদাপ্রসাদ শ্রীম-র সঙ্গে পুরী পৌছান। সকলে পুরীতে মিলিত হবার পর শ্রীমায়ের আশঙ্কাই সত্য হল। সুরবালা দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে শ্রীমাকে যৎপরোনাস্তি অপমানসূচক কথা শোনাতে লাগলেন।[১]

কখনো কখনো সারদাদেবী সকলকে নিয়ে সমুদ্রতটে গিয়ে বসতেন। সেসময় কখনো তিনি আনন্দউজ্জ্বলা—শিশুদের খেলাধূলা দেখে পরমতৃপ্তিতে বলতেন, "শিশুদের আনন্দ ভগবানের আনন্দস্বরূপ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র। এজন্যই ঠাকুর বলতেন, শিশুর ন্যায় সরল পবিত্র হলে ঠাকুরকে পাওয়া যায়।"

আবার কখনো তিনি অন্তর্মুখী ভাবগম্ভীরা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন সমুদ্রের দিকে। একদিন অবিরত সমুদ্র গর্জনে বিরক্ত রামলালের স্ত্রী বলে ওঠেন, "সবসময় শুধু শুধু হাউ হাউ করে চেঁচাচ্ছে,শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেন, একটু সময় কি চুপচাপ থাকতে পারে না!" দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে করুণ কণ্ঠে শ্রীমা বললেন, "ওর কি কম দুঃখু বৌমা? ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুর মিলে যে যার লভ্যাগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে বন্ধন করলে, মন্থন করলে; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন, অমৃত, চন্দ্র, সূয্যি কত কি লুটে নিলে; শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার এ বুকচেরা দুঃখ কি কম গা? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুর এত চিৎকার।"

সমুদ্রমন্থনের পৌরাণিক কাহিনী মানবিকতার আলোয় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল সারদাদেবীর ব্যাখ্যায়।

অন্য আর একদিন এই সমুদ্র-বেলাভূমিতেই বলরাম বসুর শাশুড়ী ও অন্য একজন মহিলার কাছে জপের শক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন। "খুব করে জপ করবে। সংসারের কাজের তো শেষ নেই, কাজ করতে করতেই জপ করবে। 'জপাৎ সিদ্ধি'—জপ হতেই সিদ্ধি আসে। ভগবানের নাম জপতে জপতে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির অনিষ্ট শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। জপের এমনি শক্তি যে, অবিরাম নাম জপের গুণে কোন কোন সাধকের রিপুর জাগরণই হয় না।"

একদিন ইচ্ছা হল তোটা গোপীনাথ দর্শনের। সকলকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে

১। আশুতোষ মিত্রের 'শ্রীমা' গ্রন্থ অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে উপরোক্ত কয়জন পুরী গিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য *'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' গ্রন্থে লিখেছেন "কিছুদিন পরে মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা হইতে* বরদাপ্রসাদ পুরী গিয়াছিলেন। সুরবালা বরাবরই মায়ের সঙ্গে ছিলেন, শ্যামাসুন্দরী ও অপর তিন পুত্রবধূকে হঠাৎ সমাগত দেখিয়া মার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে থাকেন—'কমলানেবুর প্রাণ, তোমার ভিতর এত রস কে জানে সন্ধান, তোমার ভাল ভাজ (বরদাপ্রসাদের স্ত্রী ইন্দুমতী), মা সকলকে নিয়ে এসেছ।"

চললেন। তার কিছুদিন আগেই পায়ের ফোড়া অপারেশন হয়েছে—তখনো পায়ে ব্যথা! ভক্তদের ইচ্ছা নয়, এতটা পথ পদব্রজে শ্রীমা যান। তাঁরা বার বার অনুরোধ করতে শ্রীমা কিছুদূর যাবার পর অবশেষে একটি শকটে আরোহণ করতে বাধ্য হন। পথের মাঝখানে চটক-পর্বত—বালুকা পাহাড়। দূর থেকে সেই চটক পর্বত দেখে একজন বলে উঠলেন, 'ঐ যে চটক পর্বত।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চললেন সেই পর্বতের দিকে—উন্মাদিনীর মত দ্রুত পায়ে। কিছুদূর গিয়ে তাঁর গতি মন্থর হয়ে গেল। তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন চটক পর্বতের দিকে। এই অবস্থায় তাঁর সঙ্গী ভক্ত মহিলারা তাঁকে অতি সন্তর্পণে গাড়িতে তুলে ফেরার পথে অগ্রসর হলেন। তোটা গোপীনাথ দেখা অসমাপ্তই রয়ে গেল।

কিছুদিন পুরীবাসের ফলে সারদাদেবীর স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হয়। এখানে তিনি দু'দিন সমুদ্রস্নান করেন—গুণ্ডিচাবাড়ি, নরেন্দ্র সরোবর, জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য স্থানও দর্শন করেন। একদিন তিনি নারীভক্তদের নিয়ে সাক্ষীগোপাল দর্শনে যান। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও বিগ্রহ দর্শন করে হঠাৎ তিনি ভাবস্থ অবস্থায় বলে ওঠেন 'এ কি বৃন্দাবন?' মন্দির প্রাঙ্গণে একটি তমালবৃক্ষ ছিল—সেটিকে স্পর্শ করে শ্রীমা বলেন, 'একে দেখে বৃন্দাবন ও শ্রীকৃষ্ণের কথাই মনে পড়ছে।' সেদিনই রাত্রে ফেরার সময় তাঁকে রীতিমত দুর্ভোগে ভুগতে হয়েছিল। শেষ ট্রেনটি ধরতে না পারায় পুরী ফেরার ব্যাপারে দারুণ অনিশ্চয়তা। শেষ পর্যন্ত স্টেশন কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় পার্শেল এক্সপ্রেসে পুরী ফেরেন।

পুরী থেকেই আবার একদিন যান ভুবনেশ্বরে—সম্ভবত সেখানে এক বা দু'দিন যাপনও করেছিলেন। ভুবনেশ্বর স্টেশনে পাণ্ডা ঈশ্বর বড়ুর একান্ত অনুরোধে ভক্তদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি তাঁর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটিরে উপস্থিত হয়ে সারদাদেবী আনন্দিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এতক্ষণে প্রাণ যেন হায় করে জুড়ালো।' পাণ্ডার আন্তরিকতায় তিনি মুগ্ধ। বিন্দুসরোবরে স্নান করে লিঙ্গরাজ দর্শন করেন সারদাদেবী ও তাঁর সঙ্গিনীরা। ভুবনেশ্বরের অনাদিলিঙ্গের এক অংশ হরি, অপর অংশ হর। সারদাদেবী পত্র পুষ্প, অক্ষত বিল্বপত্র, চন্দনাদি দিয়ে হরিহরের পূজা ও আরতি করেন। সেখান থেকে গৌরীকুণ্ডে গিয়ে সকলে পুনরায় স্নান করে ঈশ্বর বড়ুর গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পরদিবস গরুর গাড়িতে সকলে উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে যান। শ্রীমা একটি গুহায় বসে কিছুক্ষণ জপ করেন। ভুবনেশ্বর প্রত্যাগমন করে তিনি পুনরায় পুরী যান।

১। সম্প্রতি লেখকের সঙ্গে ঈশ্বর বড়ুর পৌত্রের ভুবনেশ্বরে সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁর পিতামহের নাম বলেন ঈশ্বর শিঙ্গারী।

কালীকুমার, তাঁর পত্নী প্রভৃতি কয়েকজন জানুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে (পৌষ মাসে) প্রত্যাবর্তন করেন—শ্রীমা প্রভৃতি বাকি সকলে ফিরে আসেন জানুয়ারির শেষার্ধে। এই সময় তাঁর কলকাতায় অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায় নিবেদিতার একটি চিঠিতে। নিবেদিতা ছিলেন ১৭ বোসপাড়া লেনে—তখন তিনি প্রায় নিত্যই মাতৃসমীপে উপস্থিত হতেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন, "শ্রীমা তোমাকে তাঁর ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। সর্বদাই তিনি একইরকম।"

শ্যামাসুন্দরী কিছুদিন কলকাতায় অবস্থানের পর প্রসন্নকুমারের বন্ধু রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেশে ফিরে যান। সারদাদেবী কলকাতায় পৌঁছবার কিছুদিন পরে সম্ভবত মার্চ বা এপ্রিল মাসে নীলমাধবের মৃত্যু হয়। শেষ কয়েকদিন সারদাদেবী অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করেন। মৃত্যুর দিন প্রাণবিয়োগের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন শয্যাপার্শ্বে কিন্তু তাঁর আহারের সময় উপস্থিত হওয়ায় এক রকম জোর করে এবং স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে কক্ষান্তরে পাঠানো হয়। আহারের সামান্য সময়টুকুর মধ্যেই নীলমাধবের মৃত্যুমুহূর্তটি দেখা যায়। শ্রীমা কোনরকম আহার শেষ করে এসে মৃত খুল্লতাতকে দেখে সখেদে বলেছিলেন, 'ও ছাইপাঁশ খেতে কেন আমায় ডাকলে? খাওয়াটাই কি বড় হল? খুড়োকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম নি।' উচ্চকণ্ঠে কিছুক্ষণ কান্নার পর পুনরায় শান্ত মূর্তি ধারণ করে নিজের কক্ষ থেকে ফিরে এসে শবদেহের মাথায় ও বুকে করজপ করতে থাকেন। তারপর সৎকারের বন্দোবস্ত। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেন্দ্রনাথ, প্রসন্নকুমার ও আশুতোষ মিত্র শববাহক। কিন্তু আশুতোষ মিত্র কেন? গোলাপ-মা প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'মা, আশু শুদ্দুর হয়ে ব্রাহ্মণের মড়া ছুঁলে?' শান্ত কণ্ঠে সারদাদেবী বললেন, 'শুদ্দুর কে?—ছেলে। ভক্তের জাত আছে কি গোলাপ?' সমস্যার সেইখানেই ইতি।

চতুর্থ দিনে শ্রীমা চতুর্থী উপলক্ষে তিনজন শববাহককে (প্রসন্নকুমারের অশৌচ বলে তাঁকে বাদ দিয়ে) ব্রাহ্মণ বা ভক্তভোজন করান এবং প্রত্যেককে একখানি করে বস্ত্র দান করেন।

এপ্রিল মাসে শ্রীমায়ের কয়েকটি ফটো তোলা হয় চিৎপুর রোডের বি. দত্তের স্টুডিওতে—সে ছবিতে মায়ের সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মীদেবী, নলিনী, রাধু প্রভৃতি। পরের মাসে স্বামী বিরজানন্দের আগ্রহে চৌরঙ্গীস্থ ভ্যানডাইক কোম্পানীতে শ্রীমায়ের আরও একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়—সেটি সারদাদেবীর একক

ছবি—সম্মুখে দৃষ্টি রেখে আসনোপরি উপবিষ্ট, তাঁর দক্ষিণে টবে একটি ফুলগাছ।[১]

এপ্রিল মাসে নিবেদিতা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে সারদাদেবী ৪ এপ্রিল নিবেদিতাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ৫ এপ্রিল তারিখে নিবেদিতা মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "শ্রীমা গতকাল আমায় দেখতে এসেছিলেন। আমি এখন বিপদ-মুক্ত জেনে কী খুশি! আমি কখনো ভালবাসায়ভরা অমন মুখ দেখিনি।"

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ৪ মে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে দার্জিলিঙ থেকে লিখেছেন, "প্লেগটা খুব খারাপ রোগ। খুব শীঘ্রই শ্রীমা কলকাতা ত্যাগ করবেন জেনে খুশি হয়েছিলাম কিন্তু এখন শুনছি তাঁর তাড়াতাড়ি যাওয়া হচ্ছে না।... তাঁর চারিপাশ ঘিরে যে সব লোক রয়েছে তাঁরা তাঁর ভালোমানুষির উপর জোর খাটান আর তিনি সব সময় সেটা মেনে নেন।" অবশ্য তার পরের মাসেই (জুন ১৯০৫, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২ বঙ্গাব্দ) শ্রীমা বিষ্ণুপুরের পথে জয়রামবাটী যাত্রা করেন। যাবার আগে তিনি বাবুরাম মহারাজের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণের কবচটি তুলে দিয়ে মঠে তার নিত্যপূজার নির্দেশ দেন। এতদিন তিনিই নিত্যপূজা করতেন কিন্তু পল্লীগ্রামে তাঁর অসুস্থকালে যদি কেউ চুরি করে এই আশঙ্কাতেই সেটি তিনি মঠে সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন—বলেছিলেন, "ঠাকুরের কবচখানি এতদিন আমার কাছে ছিল, মঠে দিলুম। কি জানি, শরীরের ভদ্দরাভদ্দর আছে—কখন কি হয় বলা ত যায় না। হয়ত জ্বরে পড়ে আছি—হুঁশ নেই—কেউ সময় পেয়ে চুরি করে নিলে। দেশ ত দেখেছ। কাউকে বিশ্বেস নেই।"

বিষ্ণুপুরের পথে এই প্রথম যাত্রা। যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য আশুতোষ মিত্র আগেই রওনা হয়ে গেলেন। একজন ডিটেকটিভ ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন যোগীন-মার আত্মীয়। তিনি দুটি চিঠি দিলেন, একটি বিষ্ণুপুর থানায়, অপরটি কোতুলপুর থানায়। আশুতোষ বিষ্ণুপুর পৌঁছে থানার দারোগার সঙ্গে যোগাযোগ করে চটী, পাচক ও গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখলেন। শ্রীমা বিষ্ণুপুর পৌঁছে পূর্বব্যবস্থামত চটীতে পূজা ও আহারাদি শেষ করে আবার সন্ধ্যার পূর্বেই কোতুলপুর যাত্রা

১। প্রসঙ্গত শ্রীমায়ের প্রচলিত ছবিগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। শ্রীমায়ের প্রথম আলোকচিত্র তোলা হয় ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমতী ওলি বুলের (মায়ের ভাষায় সারা মেমসাহেব) ব্যবস্থাপনায়। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল তাঁর ৪৫ বছর বয়সে, সারদাদেবীরও প্রথম ফটো নেওয়া হয় ৪৫ বছর বয়সে। তবে তাঁর যে ছবিটি সর্বত্র পূজিত ও বহুল প্রচারিত সেটি কিন্তু প্রথম ছবি নয়—দ্বিতীয় ছবি। একই দিনে একই অবস্থানে তোলা হয় দ্বিতীয় ছবিটি। প্রথম ছবিতে মা নতমুখী। ইংরেজ ক্যামেরাম্যান সে ছবিটি তুলে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সেই অবস্থায় মা মুখ তুলে প্রশ্ন করেন 'হয়েছে কি?' ক্যামেরাম্যান সেই সুযোগটি হারাননি—তিনি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছবিটি তুলে নেন। এই একই দিনে নিবেদিতার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়ে তাঁর আরও একটি ছবি তোলা হয়। সেটিও বিশেষ পরিচিত ও বহু ব্যবহৃত।

করলেন। বিষ্ণুপুর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন কৃষ্ণলাল ও গণেশ মহারাজ—তাঁরা বিষ্ণুপুর থেকে কলকাতায় ফিরে যান।

পরদিন প্রত্যূষে কোতুলপুর পৌঁছে স্থানীয় দারোগার সাহায্যে চটী ও পাল্কির ব্যবস্থা হয়। পূজা, রান্না, আহারাদি শেষ করে শ্রীমা ও রাধু পাল্কিতে এবং অন্যান্য সকলে গরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু করে সন্ধ্যায় জয়রামবাটী পৌঁছান।

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে প্রসন্নকুমারের প্রথমা স্ত্রী রামপ্রিয়া অকস্মাৎ কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। গ্রামে চিকিৎসক নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থাও কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। প্রসন্নকুমার তখন কলকাতায়। জয়রামবাটীতে রামপ্রিয়ার কাছে দু কন্যা নলিনী ও সুশীলা (মাকু)। সারদাদেবী পূর্বেই অভয়চরণের কন্যা রাধারানীর (রাধু) ভার গ্রহণ করেছিলেন—এখন প্রসন্নকুমারের দুই নাবালিকা কন্যার ভারও তাঁরই ওপর ন্যস্ত হল।

স্ত্রী বিয়োগের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রসন্নকুমার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, সারদাদেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে, তাঁকে বললেন, "দিদি তুমি অনুমতি না দিলে একাজ কিছুতেই হবে না। তবে ভেবে দেখো, আমার মেয়েদের কে দেখবে? অসময়ে কে আমার সেবা করবে? তুমি অনুমতি দাও, তুমি আশীর্বাদ কর।"

সারদাদেবী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—'বিয়ে একবার। দ্যাখ দেখি মেয়েরা কেমন থাকে। আমি রয়েছি, তোর সেবার ভাবনা কি? বিয়ে করার ইচ্ছে হলেই ছেলেরা বলে, অসময়ে কে আমাকে দেখবে, শেষে হাসপাতালে মরতে হবে!'

প্রসন্নকুমার সারদাদেবীর দৃঢ়তায় তখনকার মত নিরস্ত হলেও একেবারে হাল ছাড়লেন না। অল্প কিছুদিন পরেই আবার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে বোঝাতে শুরু করলেন। অবশেষে শ্রীমা অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে বললেন, 'বিয়ে করবি তো কর, নিজের ইচ্ছেয় কর। তুই আমাকে জড়াচ্ছিস কেন? শাস্ত্রে নিয়ম আছে বটে, তবু গেরো। একদিকে মেয়েরা তোকে শত্রু ভাববে, আর একদিকে যে আসবে সে নিতান্ত ভাল মানুষটি না হলে, তোর দুই মেয়েকে শত্রু ভাববে। তোরই অশান্তি বাড়বে। আমি আর কি বলবো বল? ঠাকুর তোর ভাল করুন।'

এইটুকু সম্মতি আদায় করেই অল্প কিছুদিন পরে প্রসন্নকুমার শিহড় নিবাসিনী সুবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন।[১]

১। বামপ্রিযা দেবীব মৃত্যু ১৯০৫ সালেব শেষার্ধেব বলে উল্লেখ কবেছেন স্বামী গম্ভীবানন্দ; অপর পক্ষে দুর্গাপুবীদেবী তাঁব 'সাবদা-বামকৃষ্ণ' গ্রন্থে কয়েকটি পত্রসহযোগে এটিকে ১৯০৭-এব ঘটনা রূপে উপস্থিত কবেছেন। আমবা অবশ্য স্বামী গম্ভীবানন্দকেই অনুসবণ করেছি। তবে প্রসন্নকুমাবের দ্বিতীয় বিবাহেব বর্ণনা দুর্গাপুবীদেবী অনুসাবী।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি (মাঘ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ১ম সপ্তাহে) শ্যামাসুন্দরীরও অকস্মাৎ পরলোকপ্রাপ্তি ঘটল। সকালে একটি স্ত্রীলোকের কাছ থেকে ধান ও সর্ষের বিনিময়ে কিছু শাকসব্জী কিনে ঢেঁকিশালে ধান কোটায় সাহায্য করছিলেন তিনি। ইতিমধ্যে বারদুয়েক দাস্ত হয়। দ্বিতীয়বার শৌচ সেরে ফিরে এসে শ্রীমায়ের জনৈক সেবককে বলেন, 'ভাই আর বাঁচব না। মাথা কি রকম করছে।' সেবক সঙ্গে সঙ্গে ডেকে আনলেন সারদাদেবীকে। সারদাদেবী তাঁকে তৃতীয়বার শৌচে নিয়ে গেলেন। শ্যামাসুন্দরী ফিরে এসে বললেন, 'কুমড়োর ঘ্যাঁট খেতে ইচ্ছে করছে।' সান্ত্বনাচ্ছলে শ্রীমা বললেন, 'কুমড়ো তো ভারি জিনিস! সেরে ওঠো, খাবে।' কিন্তু বৃদ্ধা শেষবারের মত জলপান করতে চাইলে শ্রীমা তার মুখে তিনবার গঙ্গাজল দেন। তার পরই তাঁর দেহ স্পন্দনহীন। মৃত্যু আসন্ন বুঝে শ্রীমা তাঁর মাথায় ও বুকে করজপ করেন। সকাল ৯টায় তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। সংবাদ পেয়ে বরদাপ্রসাদ মাঠ থেকে ছুটে এলেন। যথাসময়ে আমোদরের তীরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল।

শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদ কলকাতায় পৌঁছলে স্বামী সারদানন্দ শ্রাদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার থেকে সকল জিনিস সংগ্রহ করে জয়রামবাটীতে পাঠান। শ্রীমায়ের ভ্রাতৃকুল সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী—শ্যামাসুন্দরীর উপযুক্ত শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। স্বামী সারদানন্দ প্রেরিত সামগ্রী দিয়ে বেশ ঘটা করেই শ্যামাসুন্দরীর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হল। পঁচিশটি পিতলের ঘড়া, ছাতা, আসন প্রভৃতি দান করা হল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ নির্বিশেষে গ্রামস্থ সকলকেই ভূরিভোজে পরিতুষ্ট করা হয়। শ্যামাসুন্দরীর অন্তিম ইচ্ছার কথা স্মরণ করে 'কুমড়োর ঘ্যাঁট' ছিল আহার্য তালিকার অন্যতম পদ।

মাতৃশোক ও পরবর্তীকালে শ্রাদ্ধের কার্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য সারদাদেবীর শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। আনুমানিক মার্চ-এপ্রিল মাসে ভক্তেরা তাঁকে কলকাতায় আনেন এবং ২/১ বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতেই তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা হয়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই নিবেদিতার স্কুল বাড়ির একটি কক্ষে গোপালের মার মহাসমাধি। তার আগে একদিন সারদাদেবী গোপালের মাকে দেখতে যান। অঘোরমণিদেবী রামকৃষ্ণ সংঘে গোপালের মা নামেই পরিচিতা। তাঁর ইষ্টদেবতা ও বিগ্রহ ছিল বালগোপাল। তাঁকে তিনি জীবিত সন্তানের মতই সেবা ও যত্ন

করতেন। পরবর্তীকালে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করার পরে তিনি তাঁকেই গোপালরূপে দর্শন করেন এবং সেই সূত্রে সারদাদেবীকে 'বৌমা' বলে ডাকতেন। সারদাদেবী যেদিন নিবেদিতা স্কুলে শেষ শয্যায় শায়িত গোপালের মাকে দেখতে যান সেদিন তিনি তাঁকে দেখে সাগ্রহে বলে ওঠেন 'বৌমা এলি মা? এলি মা?' তারপর অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলেন 'তোমাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছা হয়েছিল। ভগিনী নিবেদিতার পত্র থেকে জানা যায় গোপালগত প্রাণ অসুস্থ অঘোরমণি ১৯০৪-এর নভেম্বর থেকে নিবেদিতার আশ্রয়ে (১৭ বোসপাড়া লেনে) এসে ওঠেন। নিবেদিতা তাঁকে পরমযত্নে আমৃত্যু সেবা করেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে শেষবারের জন্য অঘোরমণিদেবী শয্যাপার্শ্বে সারদাদেবী উপস্থিত হলে তিনি বলেন 'গোপাল এসেছ?' তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন— যেন কিছু প্রার্থনা করছেন। সারদাদেবী বুঝতে পারলেন না তিনি কি চাইছেন—পার্শ্বে উপবিষ্ট সেবিকা তাঁকে জানান, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্নতাজ্ঞানে গোপালের মা তাঁর পদধূলি প্রার্থনা করছেন। সারদাদেবী এতদিন তাঁকে আপন শ্বশ্রূঠাকুরানি জ্ঞানেই সম্মান দিয়ে এসেছেন কিন্তু আজ এই মুহূর্তে দ্বিধার সময় নেই। সেবিকা আপন অঞ্চলপ্রান্তে সারদাদেবীর পদধূলি নিয়ে গোপালের মা'র মস্তকে দিলেন।

মৃত্যুর পূর্বে গোপালের মাকে তাঁর ইচ্ছানুসারে গঙ্গার তীরে নিয়ে যাওয়া হল এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যুলগ্ন উপস্থিত হয়। নিবেদিতার উদ্যোগে ১৮ জুলাই অঘোরমণি দেবীর পারলৌকিক কাজ নিষ্পন্ন হল। ঐদিনই কেদার দাস বাগবাজারে গোপাল নিয়োগী লেনে (বর্তমান ১ উদ্বোধন লেন) ৩ কাঠা ৪ ছটাক জমি বেলুড় মঠকে দান করেন এবং ঐ জমিতেই স্বামী বিবেকানন্দের বহু আকাঙ্ক্ষিত 'মায়ের বাড়ি' নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বেই শ্রীমা ফিরে যান জয়রামবাটীতে।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি স্বামী অরূপানন্দ (তখন রাসবিহারী) উপস্থিত হন জয়রামবাটীতে মাতৃসান্নিধ্যে। পূর্বপরিচিতের মতই সারদাদেবী গ্রহণ করলেন তাঁকে। অরূপানন্দ সারদাদেবীকে সেদিন প্রশ্ন করেন, "মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?"

শ্রীমা উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।"

'আমার' এই কথাটিতে রাসবিহারী সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।"

শ্রীমা বললেন—"হ্যাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামীভাবেও, এমনি ভাবেও।"

এই সময় আর একদিন কথাপ্রসঙ্গে সারদাদেবী বলেন, "যখন আমার কোন ভক্তকে মনে পড়ে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন হয় সে নিজে আসে, নয় তার

চিঠিপত্র আসে।

"এই যে তুমি এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।"

রাসবিহারীর প্রশ্ন—"তুমি কি সকলেরই মা?"

শ্রীমা—"হ্যাঁ।"

রাসবিহারী—"এই সব ইতর জীবজন্তুরও।"

শ্রীমা—হ্যাঁ, ওদেরও।"

আর একদিন অরূপানন্দের প্রশ্নের জবাবে সারদাদেবী বলেন, "মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। ভগবানের মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয়...বৈষ্ণবরা মন্ত্র দিয়ে বলে, 'এখন্ মন তোর'—তাই তো

মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে
জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।

"মানতেই সব। মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হয় না।

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, এ তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল।"

"একের কিনা মনের। নিজ মনের কৃপা হওয়া চাই।"

স্বদেশী আন্দোলনের প্রশ্নটিও সেদিন তুলেছিলেন অরূপানন্দ: "মা এদেশের দুঃখ-দুর্দশা কি দূর হবে না?"

শ্রীমা— ঠাকুর তো এসেছিলেন তারই জন্যে।"

এই সময় আর একটি বিপদ ঘটে। সুরবালা তখন পাগল। রাধুর গয়নাগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন পিত্রালয়ে। সেই সময় তার পিতা গয়নাগুলি কেড়ে নিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পাগলামি আরও বৃদ্ধি পান। শ্রীমা ২৯ জানুয়ারি জনৈক উকিলের কাছে পত্র দিয়েছিলেন—

পরম শুভাশির্বাদ পোঃ আনুড়, ২৯ জানুয়ারি, ১৯০৭

বিজ্ঞাপনাঞ্চাদৌ বিশেষ পরে বাবাজীবন আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি এই ছোটো বৌ গঙ্গাস্নান করিব বলিয়া পিত্রালয়ে সমস্ত গহনা ও ২০০ টাকা এবং বাদুর গহনাও সমস্ত হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে এবং এখন বলে ও গহনা কাহাকে দিইব নেই সেই ভাবনায় ছোট বৌ ভয়ানক পাগল হইয়া গিয়াছে, আমিও ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছি জানিবেন। ইহার উপায় কি করা হয় সত্বর সংবাদ লিখিবেন। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।"

এই সংবাদ কলকাতায় জানালে শ্রীম ও ললিত চট্টোপাধ্যায় জয়রামবাটী

উপস্থিত হন। একদিন ললিতবাবু সাহেবের পোশাক পরিধান করে, পালকি চড়ে সুরবালার পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। তাঁকে কোন সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী মনে করে, সুরবালার পিতা ভীত হয়ে মায়ের কাছে সব কিছু ফেরৎ দিয়ে যান এবং শ্রীমাও সে যাত্রা বিপদ থেকে উদ্ধার পান।

॥ ১৩ ॥

প্রায় একবছরে পরে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সারদাদেবী কলকাতায় আসেন গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে—তাঁর দুর্গাপূজায় যোগ দিতে। তখন সারদাদেবী বেশ অসুস্থ কিন্তু গিরিশের জিদ শ্রীমা উপস্থিত না থাকলে পূজা হবে না। গিরিশচন্দ্র ও তাঁর দিদি দক্ষিণাকালীর বিশেষ অনুরোধক্রমে শ্রীমাকে জানানো হল গিরিশের অভিপ্রায়ের কথা। সারদাদেবী তখন বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত দুর্বল। তবু ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করতে তিনি কলকাতা আসতে সম্মত হলেন। বিষ্ণুপুরের পথে কলকাতা রওনা হলেন তিনি। সে বছর কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেছে, রাত্রে শহর নিষ্প্রদীপ অথচ শ্রীমা এসে পৌঁছবেন সন্ধ্যায়। তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তাঁকে সঙ্গে করে আনার জন্য শ্রীম ও ললিত চট্টোপাধ্যায় গিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরে। শ্রীমার সঙ্গে সেবার এসেছিলেন রাধু ও সুরবালা। সন্ধ্যার পর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে ললিত চট্টোপাধ্যায়ের ঘোড়ার গাড়িতে সকলে এসে বাগবাজারে বলরামভবনে উপস্থিত হলেন। অদূরে গিরিশচন্দ্রের বাড়ি—সুতরাং তাঁর সুবিধার কথা চিন্তা করে বলরামভবনেই বাসের ব্যবস্থা হল।

পবদিন গিরিশভগিনী দক্ষিণাকালী শ্রীমার সঙ্গে দেখা করে কি অবস্থায় তাঁকে এই অসুস্থ শবীরেও কলকাতায় টেনে আনতে হয়েছে সেটা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানালেন. তিনি না এলে গিরিশচন্দ্র পূজা বন্ধ করে দেবেন বলেই স্থির করেছিলেন,এখন দক্ষিণা শ্রীমাকে পেয়ে নিশ্চিন্ত।

কযেকদিন পরে শুরু হল পূজা। সারদাদেবীর উপস্থিতিতেই কল্পারম্ভ। ওদিকে বলরামভবনেও বহু ভক্তের সমাগম সপ্তমীর দিন থেকে। দলে দলে লোক এসে শ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি প্রদান করে। তাঁদের ইচ্ছাপূরণের জন্য সারদাদেবীকে সে কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আবার গিরিশভবন থেকে সংবাদ পৌঁছলেই তাঁকে যেতে হয় সেখানে। সেখানেও সেই একই অবস্থা—'জ্যান্ত দুর্গার পূজা'। আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সপ্তমী অষ্টমী এই ভাবেই কাটল কিন্তু গোল বাধল সন্ধিপূজার সময়। মধ্যরাত্রে সন্ধিপূজা—দুদিনের ধকলে সারদাদেবীর শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। ভক্তেরা দেখলেন এই অবস্থায় মধ্যরাত্রে গিরিশের পূজায় তাঁর উপস্থিতি অসম্ভব। গিরিশের কাছে এই সংবাদ পৌঁছতেই তিনি ভেঙে পড়লেন। ক্রমশ সন্ধিপূজার লগ্ন উপস্থিত।

গিরিশ মুহ্যমান অবস্থায় পূজাস্থল থেকে দূরে চিন্তিতমুখে বসে আছেন—তাঁর মাতৃপূজা অসমাপ্ত থেকে গেল! অকস্মাৎ গিরিশের খিড়কির দরজায় করাঘাত—সারদাদেবীর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল 'ও দক্ষিণা, দরজা খোল, আমি এসেছি।'—বলরাম বসুর বাড়ির পশ্চিমের গলিপথ দিয়ে সারদাদেবী ও তাঁর স্ত্রী ভক্তের দল হেঁটে এসে পৌঁছেছেন গিরিশভবনে। গিরিশের কানে শ্রীমায়ের আগমনবার্তা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে উল্লাসে ফেটে পড়লেন, 'আমার পূজা সার্থক'। শ্রীমা প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়ালেন। শুরু হল পূজা। দেবী প্রতিমার পূজার সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীর চরণেও অঞ্জলি দিল সকলে—গিরিশের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তো ছিলই—থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও বাদ গেল না। এমনকি তাদের স্পর্শ করা খাবারও তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করলেন।[১] এইভাবে নবমীর দিনটিও সকলের আনন্দে ও সারদাদেবীর ক্লেশের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হল।

দুর্গাপূজার পরেই সারদাদেবী জয়রামবাটী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু কালীপূজার আগে তাঁকে যেতে দেওয়া ভক্তদের ইচ্ছা নয়। অগত্যা কালীপূজার পরে ১১ নভেম্বর (১৯০৭) বিষ্ণুপুরের পথে তাঁর দেশে ফেরার ব্যবস্থা হল। বিষ্ণুপুর থেকে গরুর গাড়িতে দেশড়ায় এবং সেখান থেকে পালকিতে জয়রামবাটী—যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য তৃতীয় ভ্রাতা কালীকুমারকে পরপর দুটি চিঠি দিয়ে জানানো হল যাতে তিনি নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে লোকজন ও পালকি নিয়ে দেশড়ায় উপস্থিত থাকেন। সারদাদেবী এবং অন্যান্য মহিলারা বিষ্ণুপুর ও কোতুলপুর হয়ে দেশড়ায় পৌঁছলেন—এবার তাঁর সঙ্গী রাধু, সুরবালা, গোলাপ-মা, কুসুমকুমারী এবং আশুতোষ মিত্র। দেশড়ায় পৌঁছেই তাঁদের চক্ষুস্থির! সেখানে পালকি বা লোকজন কিছুরই সন্ধান নেই। সেখান থেকে জয়রামবাটী যেতে হলে শিহড় ঘুরে যেতে হবে—সে পথও দুর্গম। সে ব্যবস্থায় কেউই রাজি হলেন না। সুতরাং মাঠ অতিক্রম করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। স্থির হল গরুর গাড়িগুলি মালপত্র সমেত গোলাপ-মা ও কুসুমকুমারীর জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ওঁরা প্রান্তর অতিক্রম করবেন। অন্ধকার রাত—কোথাও জনবসতি নেই—ধূ ধূ প্রান্তর। রাস্তা সকলেরই মোটামুটি পরিচিত তবে সুরবালারই অপেক্ষাকৃত বেশি—সুতরাং তিনিই হলেন পথপ্রদর্শক। তাঁর প্রদর্শিত পথে সকলে অগ্রসর হয়ে একসময় বুঝতে পারলেন তাঁরা পথ ভুল করেছেন। আমোদর নদীর যে ঘাটে তাঁদের পৌঁছুবার কথা সেখানে না পৌঁছে

১। সারদাদেবী সাধারণতঃ সকলের স্পর্শ করা রান্না করা বা আহার্য গ্রহণ করতেন না। পরদিন যখন অন্যের স্পৃষ্ট অন্ন তাঁকে দেওয়া হয় তখন তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জানালে গোলাপ-মা বলেন, 'কিন্তু কাল তো তুমি সকলের ছোঁয়া খাবার খেলে।' উত্তরে তিনি বলেন, 'কাল কি আমি আমাতে ছিলুম?'

তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন আঘাটায়। ভাগ্যক্রমে তখন নদীতে জল বেশি ছিল না। সেই আঘাটাতেই তাঁরা নদী পার হয়ে এগিয়ে চললেন বটে কিন্তু সেটা জয়রামবাটী না শিহড় অভিমুখে সেটা বোঝা গেল না। তবু তাঁরা এগিয়ে চললেন এবং এইভাবেই চলতে চলতে একটা ক্ষীণ আলোকরেখা দেখা গেল। কিছু আশ্বস্ত হয়ে তাঁরা অগ্রসর হয়ে চিৎকার করে আলোকবাহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। এবার আলোকরেখা তাঁদের দিকেই অগ্রসর হতে লাগল এবং প্রদীপ হাতে তাঁদের কাছে পৌছলেন একটি স্ত্রীলোক—শ্রীমায়ের পরিচিতা। তিনি বললেন, 'তোরা ঠিকই এসেছিস, তবে একটু আড় (বাঁকা) হয়ে আসার জন্যে গ্রামের বাইরে পৌছেছিস। তিনি স্বয়ং আলো নিয়ে তাঁদের গ্রামে পৌছে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই শিহড় ঘুরে গরুর গাড়ি ও মালপত্র এসে পৌছল, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

কালীকুমার দুটি পত্রেরই প্রাপ্তি স্বীকার করলেন কিন্তু পালকি বা লোকজন না পাঠানোর নানাবিধ অজুহাত দেখাতে লাগলেন। যাইহোক, একে অসুস্থ, শরীর তদুপরি ক্লেশকর ভ্রমণ এবং পথ পর্যটনে ক্লিষ্ট সারদাদেবী আর বিশেষ বিতর্কের মধ্যে গেলেন না।

এদিকে স্বামী সারদানন্দ শ্রীমায়ের জন্য কেদার দাস প্রদত্ত জমিতে মাতৃভবন নির্মাণের জন্য অতিমাত্রায় উদ্‌গ্রীব। তাঁর হাতে তখন স্বামীজীর পুস্তক বিক্রয় বাবদ মাত্র ২৭০০ টাকা সম্বল। হিসাব করে দেখা গেল তা দিয়ে ভিতটুকু মাত্র হতে পারে। স্বামী সারদানন্দ জেদী মানুষ— তিনি পাঁচ হাজার সাতশো টাকা ঋণ নিয়ে গৃহনির্মাণ কার্য শুরু করলেন। অবশ্য এই টাকাতেও গৃহনির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়নি। সারদানন্দজী আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে এগারো হাজার টাকায় 'মায়ের বাড়ি' সম্পূর্ণ করলেন। একতলায় দুখানি ঘর, দ্বিতলে ৩ খানি এবং ত্রিতলে একখানি ঘর তৈরী হল। নিচের তলাটিতে হল 'উদ্বোধন' পত্রিকার অফিস আর দ্বিতল ও ত্রিতলের ঘরগুলি মা এবং তার ভক্ত ও পোষ্যদের জন্য নির্দিষ্ট হল। বৎসরের শেষভাগে ''উদ্বোধন'-এর কার্যালয় স্থানান্তরিত হল কিন্তু গৃহপ্রবেশের সময় শ্রীমা জয়রামবাটীতেই ছিলেন।

১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমার্ধে ব্রহ্মচারী যোগবিনোদ মাতৃসমীপে উপস্থিত হন কামারপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে শ্রীমার উপস্থিতির জন্য অনুরোধ নিয়ে। সারদাদেবী সানন্দে সে প্রস্তাবে রাজি হয়ে উৎসবে যোগ দিয়ে বিশেষ প্রীত হন।

২৪ মার্চ ভ্রাতাদের সম্পত্তি বাঁটোয়ারার জন্য সারদাদেবীর আহ্বানে সারদানন্দজী জয়রামবাটী উপস্থিত হন—তাঁর সঙ্গে গেলেন গোলাপ-মা (তিনি ইতিমধ্যে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন), যোগীন-মাওএকজন ব্রহ্মচারী। প্রধানত

বৈষয়িক কাজের জন্য এলেও সারদানন্দজী বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ আলোচনায় ও স্বামীজীর 'জ্ঞান-যোগ' সম্পাদনার কাজে, তবে তাঁর ব্যক্তিত্বই ছিল সারদাদেবীর নিশ্চিন্ততার পক্ষে যথেষ্ট।

অবশেষে জমির মাপজোকের জন্য কোয়ালপাড়া থেকে কেদারনাথ দত্তকে (পরে স্বামী কেশবানন্দ) আহ্বান জানানো হল। গ্রাম্য শরিকানার যা নিয়ম—ভাইয়েরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, পরস্পর কাদাছোঁড়াছুঁড়ি চলতে থাকে। এক এক জনের এক এক রকম জিদ কিন্তু সারদানন্দের উপস্থিতির ফলে গোলমাল খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না। সমস্ত সম্পত্তির দলিল এযাবৎ থাকত কালীকুমারের কাছে। প্রসন্নকুমার প্রথমেই চাইলেন দলিল ভাগ। এই নিয়ে শুরু হল বিবাদ—সারদানন্দজী রায় দিলেন—জমি ও দলিল একই সঙ্গে ভাগ হবে। প্রসন্নকুমারের সেটা মনঃপূত না হলেও তিনি মেনে নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু অল্পসময়ের জন্য সারদানন্দজী বাইরে যেতেই শুরু হল দু'ভায়ে ধস্তাধস্তি—একজন দলিল কেড়ে নিতে চায়—অন্যজন তা আঁকড়ে বসে থাকে। ইতিমধ্যে সারদানন্দজী উপস্থিত হতেই প্রসন্নকুমার নিরস্ত হলেন। দলিল কালীকুমারের হেপাজতেই রয়ে গেল।

কিন্তু এই বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশেও সারদাদেবী স্থির, অচঞ্চলা। তিনি যথানিয়মে যাবতীয় সাংসারিক কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর ধৈর্য দেখে বিস্মিত স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের তো দেখেছ, পান থেকে চূণ খসতে আমরা চটে আগুন হই। কিন্তু মাকে দেখ। তাঁর ভায়েরা কি কাণ্ডই করছেন; অথচ তিনি তেমনটিই আছেন—ধীর স্থির।"

অশান্তির মধ্যেই ভাগ-বাঁটোয়ারার কাজ শেষ হল—সালিশী দলিলও লেখা হল—সালিশ হিসাবে স্বাক্ষর করলেন স্বামী সারদানন্দ, তাজপুবেব শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং জিবটার শম্ভুচন্দ্র রায়। সারদাবাবু শ্রীমায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, তিনি কোন ঘরে থাকতে চান, অর্থাৎ সেই ঘরটি বাদ রেখেই সম্পত্তি ভাগ হবে। শ্রীমা উত্তরে বলে পাঠালেন, 'ইঁদুরে গর্ত করে, সাপ সেই গর্তে বাস করে।' সারদাবাবু আবার লোক পাঠালেন সারদাদেবীর কাছেঃ 'জমিজমা, ঘর বাড়ি সবই তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে— তিনি জয়রামবাটী এলে কোন ঘরে থাকবেন?' এবার উত্তর এল ঃ "দুদিন প্রসন্নর ঘরে, দুদিন কালীর ঘরে থাকব।" মায়ের ব্যবহৃত ঘরখানিও ভাগ হয়ে গেল—বরদাপ্রসাদ দলিল লেখার পর যথাসময়ে কোতুলপুরে রেজিস্ট্রি হল। সারদাদেবী স্বেচ্ছায় সব স্বত্ব ত্যাগ করে কলকাতায় আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাত্রার দিন স্থির হল ২১ মে শুক্রবার।

২৩ মে রবিবার (১৯০৯) সারদাদেবী প্রথম পদার্পণ করলেন অশেষ চেষ্টার

পর তাঁর জন্য নবনির্মিত মাতৃমন্দির 'মায়ের বাড়িতে'। এতদিনে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন সার্থক হল। দ্বিতলে ঠাকুরঘরের পাশে তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষ কিন্তু তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'ঠাকুরকে ছেড়ে আমার থাকা চলে না—থাকা উচিতও নয়।' সুতরাং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ঠাকুরের জন্য নির্দিষ্ট ঘরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। ঠাকুরের জন্য তৈরী বেদীটি সুন্দর করে সাজানো হল—বেদীর ওপর রেশমী চন্দ্রাতপটি তৈরী করে দিলেন ভগিনী নিবেদিতা।

শ্রীমায়ের জন্য সারদানন্দজী একটি নতুন খাট তৈরী করে রেখেছিলেন। ঠাকুর ঘরে শ্রীমায়ের থাকার ব্যবস্থা হলে খাটটিকে সেই ঘরে আনা হল আর তার পাশে রাধুর জন্য একটি পুরাতন পালঙ্ক। প্রথম রাত্রিটি সেই নতুন খাটে শোওয়ার পর তিনি বললেন, এই নতুন খাটে শুয়ে তাঁর অস্বস্তি বোধ হচ্ছে কারণ রাধুকে পাশে না নিয়ে তিনি শুতে পারেন না। অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুসারে নতুন খাটটি অন্যত্র সরিয়ে রাধুর পালঙ্কেই তাঁর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হল।

জুন মাসে (১৯০৯) সারদাদেবী আক্রান্ত হলেন পানিবসন্তে। স্বামী শান্তানন্দের স্মৃতিকথায় দেখা যায় কাশী থেকে ফিরে তিনি মায়ের বাড়িতে সারদানন্দজীকে প্রণাম করতেই তিনি জানালেন, "মায়ের বসন্ত হয়েছে।" শ্রীমা সেরে ওঠার পর আরও কয়েকজন এই সংক্রামক রোগের শিকার হন।

জুলাই মাসে বিদেশিনী ভক্ত দেবমাতা (লরা গ্লেন) এসেছিলেন—শ্রীমায়ের নিকট সান্নিধ্য লাভের জন্য। প্রথমে স্থির হয় তিনি উদ্বোধনে মায়ের কাছেই থাকবেন কিন্তু পর পর কয়েকজন বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ায় তাঁর আবাস শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নিবেদিতার স্কুলে।

কথা ছিল, তিনি এসে পৌঁছবার পর কেউ একজন এসে তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছে দেবেন কিন্তু দেবমাতা তার জন্য অপেক্ষা করেননি। তিনি নিজ আবাসে পৌঁছেই নিজে মালপত্র নিয়ে (শ্রীমা এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের জন্য ফল, বস্ত্র ও কিছু প্রণামী) বেরিয়ে পড়লেন। পথ চলতি মানুষকে জিজ্ঞাসা করতে করতে তিনি মায়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখেই শ্রীমার সানন্দ মন্তব্য 'ওমা, দেবমাতা!' দেবমাতা লিখেছেন, 'তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করলাম নিজেকে—প্রণামীর সঙ্গে।...তাঁর শ্রীহস্ত আমার মাথায় রাখলেন। তাঁর স্পর্শে আমার অন্তর থেকে নবজীবনের তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে আমার সমগ্র সত্তাকে প্লাবিত করল।' দেবমাতা কিছু খুঁটিনাটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন যা সারদাদেবীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করে। একবার কোন ভক্ত দুটি বাছাই করা সেরা আম নিয়ে এসেছেন শ্রীমায়ের জন্য। আম দুটি নিয়ে তিনি দেবমাতাকে সে দুটি দিতে চাইলেন। তখন আমের মরশুম প্রায় শেষ—দেবমাতা জানতেন, মা আম খুব ভালবাসেন তাই সবিনয়ে বললেন 'আম দুটি আপনি রাখলে আমার বেশি

আনন্দ হবে।' সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা উত্তর দিলেন, "আমি রাখলে তোমার আনন্দ, আর তুমি নিলে আমার আনন্দ, কার আনন্দ বেশি হবে বলে তোমার মনে হয়?" দেবমাতা বলেছিলেন, 'মা আপনার আনন্দই বেশি হবে কারণ আপনার অনেক বড় মন।' দেবমাতা সারদাদেবীর কতকগুলি পত্র সযত্নে রক্ষা করেছিলেন—তারই দু'একখানি এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

(ক) আমার আদরের কন্যা,

তোমার ভালবাসাভরা পত্রগুলি পাইয়াছি। ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই বলিয়া কিছু মনে করিও না। তোমার কথা সব সময়ে মনে পড়ে। তুমি যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতে সেই জায়গাটিতে চোখ পড়িলেই তোমার সুন্দর মধুর চেহারাটি সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে।'[১] এ বাড়ির সকলে তোমার কথা খুব বলিয়া থাকে। তোমার শেষ পত্রে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভাল আছেন জানিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

আশীর্বাদিকা

তোমার একান্ত স্নেহশীলা মাতাঠাকুরানী

(খ) আমার আদরের কন্যা,

তোমার পয়লা নভেম্বরের পত্র পাইয়াছি। চিঠি পাইয়া যে কী আনন্দ হইল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি এখানে (পুরীতে) বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছি। আরও দু'একমাস থাকিব। আশাকরি আমাকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিবে। আমি এখন আগের চেয়ে ভাল আছি। বোস্টন কেন্দ্রে স্থান পরিবর্তন হইয়াছে এবং ঠাকুরের ভাব দিন দিন ছড়াইয়া পড়িতেছে জানিয়া আমি সবিশেষ আনন্দিত হইযাছি। আদরের কন্যা আমার। আমি সকল সময় তোমার কথা ভাবি।...আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ জানিও।

তোমার স্নেহের মাতাঠাকুরানী।[২]

১। দেবমাতার কাছে ৮ সেপ্টেম্বব (১৯০৯) চিঠিতে নিবেদিতা লিখেছেন "শ্রীমা তোমার কথা প্রায়ই বলেন। প্রথম রাত্রে [তুমি চলে যাওয়ার পব] তোমার শূন্য স্থানটি দেখছিলেন বেদনার্ত অন্তরে।"

এই চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন মিঃ হ্যালক মায়ের কাছে মন্ত্র নিয়েছেন।

২। দেবমাতার কাছে লেখা সব পত্র তারিখবিহীন এবং ক্রম-পর্যায় অনুসারী নয়। এই পত্রখানি অবশ্যই ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লিখিত কারণ সেই সময় তিনি দীর্ঘকাল বায়ু পরিবর্তনের জন্য পুরী গিয়েছিলেন।

(গ) আমার আদরের কন্যা,

তোমার সব পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। সেগুলি যে আমার কত ভাল লাগিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না।...আমার স্নেহের কন্যা, তুমি নিশ্চয় জানিবে, ঠাকুর তোমার সঙ্গে আছেন এবং তোমার উপরে দৃষ্টি রাখিতেছেন। এই মাসের ১৬ তারিখে আমি দেশে যাইব।...এখানে সকলে ভাল আছে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লইবে।

তোমার একান্ত স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী।[১]

(ঘ) আমার পরম আদরের কন্যা,

তোমার ১৬ আগস্টের পত্র পাইয়াছি। যখন তোমার কথা ভাবিতেছিলাম তখনই তোমার পত্র আসিল। সুতরাং বুঝিতে পার আমি কতখানি আনন্দ পাইয়াছি।

তুমি আবার সুস্থ হইয়াছ এবং পরম উৎসাহে ঠাকুরের কাজ করিতেছ জানিয়া আমি আরও খুশি হইয়াছি। আমি আগের চাইতে এখন একটু ভাল আছি।

সারদানন্দ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা, সত্যকাম, কুসুমদেবী, গণেন, নিবেদিতা ও সুধীরা ভাল আছে। তাহারা প্রায়ই তোমার কথা বলে। আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানিও। আদরের কন্যা আমার!

ইতি
তোমার স্নেহময়ী মাতাঠাকুরানী।[২]

১। এই পত্রটি অবশ্যই ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরে লেখা কারণ ১৬ নভেম্বর (১৯০৯) শ্রীমা জয়রামবাটী যাত্রা করেন।

২। এই পত্রখানি অবশ্যই ১৯০৯-এর পরবর্তী কোনকালে লেখা কারণ উল্লেখিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেবমাতার পরিচয় উদ্বোধনে তাঁর উপস্থিতিকালেই হওয়া সম্ভব।

॥ ১৪ ॥

নিবেদিতার পত্র থেকে জানা যায় এই সময় কারামুক্ত বিপ্লবীরা প্রায়ই আসতেন শ্রীমাকে প্রণাম করতে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে মাতৃসমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন। সারদাদেবী তাঁদের সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের প্রশংসা করে বলেছিলেন, "কী সাহস! ঠাকুর আর নরেনই এঁদের ভয়হীন করে তুলেছেন। সব তাঁদের দোষ।"

৪ আগস্ট (১৯০৯) আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসু মাতৃপদপ্রান্তে উপস্থিত হন। ৫ আগস্ট এই সংবাদ জানিয়ে নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে লিখেছেন, "শ্রীমা সম্পূর্ণ সুস্থ। তাঁর পাদস্পর্শ করার জন্য গতকাল বৌ [অবলা বসুকে নিবেদিতা 'বো' বা 'বৌ' বলতেন আর জগদীশচন্দ্রকে বলতেন Bairn অর্থাৎ 'বাচ্চা' বা শিশু] ব্যাপারটা খুব চমৎকার না? বড় বড় স্বদেশপ্রেমিকরাও আজকাল এটা করছেন। সকলেই এখন স্বীকার করেন স্বামীজীর মাধ্যমেই আহ্বান এসেছিল। যখন আমি সেদিন বললাম, 'মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে একদিন তুমি অনেক সন্তান লাভ করবে, সেটা এখন ফলে যাচ্ছে—পুরো দেশটাই এখন তোমার' তখন তিনি বললেন, 'তাই তো দেখছি।'

২১ আগস্ট সারদাদেবী যোগোদ্যানের উৎসবে যোগদান করেন।

২৯ আগস্ট মিঃ লেগেটের মৃত্যু হয়। সংবাদ পেয়ে শ্রীমা নিবেদিতা মারফৎ শ্রীমতী লেগেটকে ভালবাসা ও সহানুভূতি জানিয়ে বলেন, "ওঁরা ভাগ্যবান মানুষ।"

১২ সেপ্টেম্বর শ্রীমা গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে মিনার্ভা থিয়েটারে 'পাণ্ডব গৌরব' নাটক দেখতে যান। সারদাদেবী কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীভক্তকে নিয়ে সেদিন অভিনয় দেখতে যান। স্বামী শান্তানন্দও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। শান্তানন্দজী লিখেছেন, (উদ্বোধন, ৬০ বর্ষ, পৃ ৭০২) গিরিশচন্দ্র সারদাদেবীকে বলেছিলেন, 'মা অনেকদিন হল থিয়েটারে আছি। আর ও-সব ভাল লাগে না, ছেড়ে দেব মনে করছি। তবে আপনি যদি অনুমতি করেন তাহলে একদিন আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই আর ওই হবে আমার শেষ অভিনয়।"[১]

১। স্বামী শান্তানন্দের রচনায় এই কথাগুলির উল্লেখ থাকলেও গিরিশচন্দ্রের এটি শেষ অভিনয় নয়। তিনি শেষবার মঞ্চাবতরণ করেন ৩০ আষাঢ়, ১৩১৮ (জুলাই, ১৯১১ খ্রীঃ) 'বলিদান' নাটকে। তা ছাড়া গিরিশের মুখে 'একদিন আপনাকে আমার অভিনয় দেখাই' একথাগুলিও প্রযুক্ত হতে পারে না কারণ, সারদাদেবী ইতিপূর্বে 'বিল্বমঙ্গল' নাটক দেখেছেন—সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

কঞ্চুকীর ভূমিকায় গিরিশের অভিনয় দেখে সারদাদেবী আনন্দিত হন। তাঁর মঞ্চাবতরণে শ্রীমা বলে ওঠেন, "ওঃ, এই বুঝি গিরিশ, তা বেশ সেজেছে তো। মোটেই চেনা যাচ্ছে না কিন্তু।"

মঞ্চে কালীমূর্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেবতাদের সপ্ত বজ্র ও মহামায়ার শক্তি মিলে অষ্ট বজ্রের সম্মেলন হয় তখন দেবী-সহচরী যোগিনীগণের কণ্ঠে 'হের হরমনমোহিনী, কে বলে রে কালো মেয়ে' গানটি শুনে সারদাদেবী গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে গেলেন—তাঁর সমস্ত শরীর স্থির। এই ভাবসমাধিস্থ অবস্থায় তিনি দীর্ঘক্ষণ ছিলেন।

৬ অক্টোবর সারদাদেবী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে সম্বর্ধনায় যোগ দেন। ৫ অক্টোবর নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে লিখেছেন, "শুক্রবাব বিকালে আমরা আমাদের প্রিয় শ্রীমা সারদাদেবীকে একটা জমকালো অভ্যর্থনা জানাব আশা করছি!" সারদাদেবী রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতির সঙ্গে স্কুলে উপস্থিত হয়ে গাড়ি থেকে নামামাত্র নিবেদিতা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যান। সেদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্রী সরলাবালা সরকার স্মৃতিচারণ করেছেন, "মা'র চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য [ভগিনী নিবেদিতা] আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার [নিবেদিতা] একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং বলেন, 'বেশ তো শিখেছে মেয়েরা।' পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া যান।"

১৯০৯-এর ২৩ মে সারদাদেবী উদ্বোধনে প্রথম প্রবেশ করে জয়রামবাটী ফিরে যান ১৬ নভেম্বর। এই সুদীর্ঘ প্রায় ছ'মাস কালের মধ্যে তিনি কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দর্শন করেন—রামরাজাতলাতেও যান ঠাকুর দর্শন করতে। ফেরার পথে রামকৃষ্ণপুরে নবগোপাল বসুর বাড়ি ঘুরে আসেন। এইছ'মাসে যেমন সাময়িক কিছু রোগভোগ করেছেন তেমনই অনেক মধুর স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এই কালের সঙ্গে। সন্ধ্যারতির পরই তিনি সারদানন্দকে নির্দেশ দিতেন কিছু গান শোনাবার। সারদানন্দজী তবলা ও তানপুরা সহযোগে গান ধরতেন, "এস এস মা", "শিবসঙ্গে সদারঙ্গে", "দনুজদলনী নিজজন প্রতিপালিনী" ইত্যাদি— দ্বিতলে বসে সারদাদেবী নিবিষ্ট চিত্তে গান শুনতেন। একদিন ১, লক্ষ্মী দত্ত লেনের দত্তবাড়িতে শ্রীমায়ের উপস্থিতিতে কীর্তন গানের আসর বসল। গায়ক

যতীন মিত্র। শ্রীমার সঙ্গে যথারীতি তাঁর মহিলা ভক্তমণ্ডলী। চিকের আড়ালে বসে সবাই গান শুনছেন। মিত্র মহাশয় সেদিন গাইছিলেন মাথুর। চিকের আড়ালে বসে গান শুনতে শুনতে শ্রীমা ভাবস্থ। যতীনবাবু মাথুর শেষ করে যখন বিদায় নেবার উদ্যোগ করছেন তখন সারদাদেবী গোলাপ-মা মারফৎ বলে পাঠালেন, মাথুর পালা শেষ করা উচিত 'মিলন'-এ। যতীনবাবু শুরু করলেন মিলনের পালা। সে গান শেষ করে তিনি শ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন কিন্তু সারদাদেবী সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। বুদ্ধিমতী গোলাপ-মা কোনরকমে হাত ধরে তুলে সামান্য জলযোগান্তে গাড়িতে তুললেন—লক্ষ্য করলেন মায়ের হাত-পা স্ববশে নেই। উদ্বোধনে পৌঁছে শ্রীমাকে দু'জনে ধরে ধরে ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন, শ্রীমার চৈতন্য তখনও অন্তর্লীন—সেখানেও তিনি নিষ্পলক দৃষ্টিতে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গোলাপ-মা বললেন, "সেই বৃন্দাবনে মার ভাব দেখেছিলাম আর আজ এই দেখলুম।" সে রাতে কোনভাবেই তাঁর মন বাহ্যভূমিতে নামছে না দেখে সকলে একসঙ্গে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে লাগলেন। তাইতেই ক্রমশঃ শরীরে স্পন্দন দেখা গেল—পরে স্পষ্ট স্বরে বললেন, 'কেন বাবা!' ভক্তদের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। তারপর যথাবিধি ঠাকুরের ভোগ করে স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

নিবেদিতা শ্রীমায়ের কাছে প্রত্যহ আসেন যান। শ্রীমা যেন তাঁর কাছে এক পরম বিস্ময় অথচ কথাবার্তায় আচার-আচরণে তিনি সাধারণের মতোই। নিবেদিতা ম্যাকলাউডকে একটি পত্রে (৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯) লিখেছেন, "মা এখনও দেখতে তেমনি ছেলেমানুষটি, সর্বদা কর্মমুখর যদিও তাঁর বয়স এখন ৬৫ [প্রকৃতপক্ষে ৫৫]। আমার বয়স যদিও ৪৫ কিন্তু আমাকে তাঁর চেয়ে বয়স্ক দেখায়। তাঁর শরীর ভাল নেই। নিবিড় উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের ফল।"

অগ্রহায়ণের প্রথম পর্যন্ত সারদাদেবী ছিলেন কলকাতায়। তখন সামান্য শীত পড়তে শুরু হয়েছে। তাই ভক্তেরা তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি পশমী গেঞ্জি শরৎ মহারাজ-প্রদত্ত ১০ টাকায় কিনে আনলেন। গেঞ্জি পেয়ে সারদাদেবীর খুব আনন্দ —তিন দিন সেটি ব্যবহারও করলেন কিন্তু চতুর্থদিন থেকে সেটি আর গায়ে উঠল না। ভক্তদের বললেন, 'মেয়েমানুষের কি জামা পরতে আছে বাবা? তবু তোমাদের মন রাখতে ৩ দিন পরেছি।'

১৬ নভেম্বর সারদাদেবী যাত্রা করলেন জয়রামবাটী অভিমুখে।

১৪ ডিসেম্বর উদ্বোধন বাড়ি প্রসারিত করার জন্য পার্শ্ববর্তী এক কাঠা চার ছটাক জমি সংগৃহীত হল এক হাজার আটশ টাকায়।

॥ ১৫ ॥

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সারদাদেবী ফিরে এলেন কলকাতায়—নিজের বাড়িতে। ২৮ জুলাই ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা একটি পত্রে জানিয়েছেন, "শ্রীমা এখন এখানে এবং সেই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দিদিও। সান্ধ্য আসরে এখন শুধু দক্ষিণেশ্বরের গল্প—অতীতের কাহিনী—সুতরাং বেশ ভাল লাগে। যোগীন-মা র ক'দিন জ্বর হয়েছে। ন'দিদি (গিরিশচন্দ্রের ভগিনী যাকে তুমি সব সময় কুমারী ঘোষ বলো) সেদিন আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলেন। [মায়ের] বাড়িটি যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ।"

ঐ একই দিনে অর্থাৎ ২৮/৭/১০ শ্রীমা শ্রীমতী ওলি বুলকে একটি পত্র দেন, নিবেদিতার কাছে তার অসুস্থতার সংবাদ শুনে। ইংরেজি চিঠিটি হয়ত কেউ লিখে দিয়েছিল শ্রীমায়ের নির্দেশমত। এখানে তার বাংলা তর্জমাটি উদ্ধৃত হল ঃ

"মা, তুমি খুবই অসুস্থ, একথা শুনে খুবই চিন্তায় আছি। তোমার কন্যা *নিবেদিতার কাছে শুনলাম তুমি এখন একটু ভালো আছ। ঠাকুরের কাছে তোমার* রোগমুক্তির প্রার্থনা করি। তুমি ভালো হয়ে উঠলে আমার কত আনন্দ হবে কি বলব!...

"শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে তোমার হয়ে আমি তুলসী আর বেলপাতা দিয়েছি আর তিন সন্ধ্যা তাঁর সামনে বসে তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি।...

"এখন এই সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে পূজার সময় নিবেদিত পুষ্পচন্দন তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। আমার গভীর ভালবাসা আশীর্বাদ অনুভব করো। তোমাকে খুব ভালবাসি, অন্তর থেকে আশীর্বাদ করি। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে আছি, তবু সদাই মনে হয়, তুমি কাছেই আছো।

তোমার মা।"

৪ঠা আগস্ট ম্যাকলাউডের কাছে নিবেদিতার লেখা একটি পত্রেও সারদাদেবীর সংবাদ পাওয়া যায় ঃ "*শ্রীমা সর্বদাই মধুরিমায় পূর্ণ। গতরাত্রে তাঁর* চমৎকার শ্বেতপাথরের ঘরে একটি ভাষণ শোনার জন্য তিনি সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন। সেখানে অনেক পুরুষও উপস্থিত ছিল। শ্রীমা ও তাঁর মেয়েরা পাশের শয়নকক্ষে চিকের আড়ালে বসেছিলেন।

...কয়েক সপ্তাহ এখানে থেকে তাঁকে বিশ্রামপ্রাপ্ত এবং আগের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে। আমার মনে হয় গ্রামে তাঁর লোকজন তাঁকে এতো বেশি পরিশ্রম

কবায় যে তাঁর শরীর ক্ষয় হয়ে যায়।"

বলরামবাবুর স্ত্রীর অনেক দিনের ইচ্ছা কোঠারে তাঁদেব জমিদারীতে শ্রীমাকে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে গিয়ে একান্তভাবে তাঁর সেবা করেন। এবার তিনি সেই প্রার্থনা জানালেন সারদাদেবীর কাছে। বলরামবাবু ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশের কথা স্মরণ করে শ্রীমা কোঠাব গমনে সম্মতি জানালেন। **১৯১৫-র** ৫ ডিসেম্বর কোঠারে যাওয়ার দিন স্থির হল—সঙ্গে যাবেন গোলাপ-মা, সুরবালা, রাধু এবং স্বামী আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ), কৃষ্ণলাল মহারাজ, রামবাবু, আশুতোষ মিত্র প্রভৃতি আরও দু'একজন ভক্ত। নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে তাঁরা ভদ্রক স্টেশনে পৌছে সেখানকার কাছারিবাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পালকি ইত্যাদিতে সকলে উপস্থিত হলেন ভদ্রক থেকে আট-নয় ক্রোশ দূরবর্তী কোঠারে। তখন কোঠারের জল হাওয়া বেশ ভাল—সকলেই বেশ আনন্দে দিন যাপন করছিলেন কিন্তু বাদ সাধলেন সুরবালা। তাঁর পাগলামির মাত্রা বেড়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে তাঁকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কোঠারে অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল সদর ও অন্দর মহলের স্বাতন্ত্র্য রেখে। সদর অংশে থাকতেন পুরুষ ভক্তের দল—খাবার সময় তাঁরা উপস্থিত হতেন অন্দর মহলে। শুকুল মহাবাজ, কৃষ্ণলাল মহারাজ ও আশুতোষ বরাবরই নিরামিষাশী—অপর একজন ভক্ত মাত্র মাস দুয়েক আগে নিরামিষ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। কারণ শ্রীমা যখন স্বয়ং নিবামিষ আহার করেন তখন তিনিও স্থির করেন আর আমিষ গ্রহণ কববেন না।

একদিন সকলে যখন মধ্যাহ্ন-আহাবে বসেছেন তখন গোলাপ-মা ঐ ভক্তটিকে শ্রীমার নাম করে মাছ খেতে বলেন কিন্তু ভক্তটি কিছুতেই সম্মত হলেন না—বার বার শ্রীমাব আদেশেব কথা জানানো সত্ত্বেও ভক্তটি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল হয়ে রইলেন। তখন শ্রীমা স্বয়ং এসে উক্ত ভক্তের পাতে দুটি চিংড়ি মাছ দিয়ে বললেন "যা বলবার আছে বিকেলে বোলো—এখন খাও।" ভক্তটি বাধ্য হয়েই সেদিন মাছ খেলেন। বিকেলে একসময়ে শ্রীমা তাঁকে ডেকে পাঠালেন খিড়কির দরজায়, প্রশ্ন করলেন "মাছ খাওয়া কেন ছেড়ে দিয়েছ?"

ভক্তটি উত্তর দিলেন, "আপনি কেন খান না?"

সারদাদেবী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমি কি একমুখে খাই? তুমি কি মনে কর? বোকামি করো না—মাছ খাবে। আমি বলছি খাবে।"

এই জোরের কাছে পরাস্ত হলেন ভক্তটি। তারপর থেকে আবার পূর্বের মতই আমিষ গ্রহণ করতে শুরু করেন।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে কোঠারে মহা-সমারোহে

সরস্বতীপূজার ব্যবস্থা হয়। পূজা উপলক্ষে রাত্রে প্রতিমার সামনে উৎকলদেশীয় যাত্রাগানের বন্দোবস্ত হল। অবশ্য এই যাত্রাগানে কোন সংলাপ ছিল না—শুধু গান এবং নৃত্যকলার মাধ্যমে অভিনয়, আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে নৃত্যনাট্য। সুতরাং ভাষার বিপত্তির জন্য রসগ্রহণে কারও অসুবিধা হয়নি। শ্রীমা সারারাত্রি জেগে এই পালা দর্শন করে এমনই মুগ্ধ হন যে তাঁর ইচ্ছায় পরদিন একই পালা পরিবেশিত হল। তৃতীয় দিনে প্রতিমা বিসর্জন। সরস্বতী-পূজার দিনে বলরাম বসুর পুত্র রামবাবু এবং শিলং থেকে আগত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, হেমেন্দ্রকুমার মিত্র, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন।

তখন কোঠারের পোস্টমাস্টার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ঘটনাক্রমে তিনি একসময় খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু পরে তাঁর মধ্যে দেখা যায় অনুতাপ। স্বধর্মে ফেরার ইচ্ছা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে। তাঁর আগ্রহ ও মানসিক অনুশোচনার কথা জানতে পেরে রামকৃষ্ণ বসু (বলরামবাবুর পুত্র) ও কৃষ্ণলাল মহারাজ সারদাদেবীকে সব বিষয়টি জানান। ভক্তদের মুখে আনুপূর্বিক সব শুনে শ্রীমা বিধান দিলেন দেবেন্দ্রবাবু যেন সরস্বতীপূজার পূর্বদিনে বলরামবাবুর গৃহদেবতা [কোঠারস্থ] রাধাশ্যাম চাঁদজীর সম্মুখে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন তাহলেই তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণত্বে ফিরতে পারবেন। সেই অনুসারে দেবেন্দ্রবাবু প্রায়শ্চিত্ত করে কৃষ্ণলাল মহারাজের কাছ থেকে গায়ত্রী মন্ত্র ও যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেন। মুণ্ডিত মস্তক দেবেন্দ্রনাথ মাতৃসমীপে আগত হয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই শ্রীমাও প্রতিপ্রণাম করেন সরস্বতী পূজার দিন সারদাদেবী তাঁকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে প্রসাদস্বরূপ একটি নতুন কাপড় দেন।

কোঠারে অবস্থানকালে একদিনের একটি ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন আশুতোষ মিত্র। সরস্বতীপূজার পর একদিন বিকালে মাতৃসঙ্গ প্রত্যাশী আশুতোষ গিয়েছিলেন খিড়কি মহলে। সেখানে দেখেন শ্রীমা একাকী বসে আছেন—পা দুটি ছড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি উন্মুক্ত কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিহীন—আশুতোষের উপস্থিতি তিনি জানতে পারলেন না। আশুতোষ মায়ের ভাব ভঙ্গ না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ১৫/২০ মিনিট পরে তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ এসেছ?" আশুতোষ বললেন, "বেশিক্ষণ নয়, আপনি কতক্ষণ এখানে এসেছেন মা?"

শ্রীমা—"বদ্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগে না—তাই দুপুরবেলা ওরা সব শুলে বেরিয়ে নিরিবিলিতে বসে আছি।"

"বার বার আসা—এর কি নিস্তার নেই? যেখানে শিব, সেখানেই

শক্তি—শিবশক্তি একত্তরে। বার বার সেই শিব সেই শক্তি। নিস্তার নেই। তবু ত লোকে বোঝে না—কত কষ্ট ঠাকুর করেছেন, তাদের জন্যে। কি সব তপিস্যে—তপিস্যের দরকার কি? তবু তপিস্যে—খালি লোকের জন্য। লোক কি পারবে? তাদের তেজ কই, শক্তি কই? তাই ত ঠাকুরকে সব করতে হয়। কাঁকুড়গাছির একটা গান জান?"

আশুতোষ—"কোন গানটা মা?

শ্রীমা—"'এসেছে কাঙালের ঠাকুর, কাঙালের তরে'—সত্যিই বাছারা আমার কাঙাল। একবার মা বলে ডাকলে কি থাকা যায়? অমনি ঠাকুরকে আসতে হয়।"

আশুতোষ—"চৈতন্যদেবেও কি এই ঠাকুব?"

শ্রীমা—"হ্যাঁ, হ্যাঁ এই ঠাকুর বার বার—একই চাঁদ রোজ রোজ। নিস্তার নেই—ধরা পড়ে আছেন। তাঁরই জীব। তিনি দেখবেন না ত কে দেখবে? ও পাড়ার লোক এসে? বলেছেন, 'যখনি ডাকবি মোবে, এসে দেখা দিব তোরে!' এইটা মনে রেখো—কখনো ভুলো না—ডাকলেই পাবে—তিনি যে কল্পতরু।"

আশুতোষ—"আমি জানি আমার মাকে।"

শ্রীমা—"ঠাকুরই তো মা বুলি শিখিয়েছেন। মা বলা কি ছেল আর? তাঁর ছিষ্টি—তিনি প্রসব করছেন, আবার খেযে ফেলছেন। খেয়ে ফেলছেন মানে কি? মুক্ত করে দিচ্ছেন। তাঁর লীলা, তাঁর খেলা। ...

"বলে, 'বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সহিবে ক'দিন,—একি খালি জীবের—এ যে ঠাকুরের। তাই বসে বসে ভাবছিলুম। দেখলুম শেষ নেই। কি কষ্ট ঠাকুরের কে বুঝবে?"

আশুতোষ—"খালি ঠাকুরের কেন মা? আপনারও তো। ঠাকুর আর আপনি তো এক।"

শ্রীমা—"ছিঃ, ওকথা বলতে আছে, বোকা ছেলে? আমি যে তাঁর দাসী। পড়নি? 'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, তুমি ঘরণী আমি ঘর; যেমন করাও তেমনি করি।' সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। এক একবার মনে হয় জীবের ধার কি শোধ হবে না? আবার ভাবি—না, এ ধার ত শোধ হবার নয়—দাঁতে কুটো কেটেও নয—জীব যে তাঁর।"

আশুতোষ—"তাই বুঝি যে আসছে মন্ত্র নিতে, তাকেই দিচ্ছেন।"

শ্রীমা—"কত শোক তাপ পেয়ে, কত জ্বালা যন্ত্রণায় জীব ছটফট করে আসছে। ঠাকুর না হলে কে তাদের জ্বালা ঘোচাবে? তিনি যে ব্যথার ব্যথী। তিনি যে নিজে তার চেয়েও জ্বালা পাচ্ছেন, তাই তো তাদের জ্বালা বুঝছেন।"

"একবার দেখি কি জান? দেখি না, ঠাকুর সব হয়ে রয়েছেন। যেদিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর—কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া আর কেউ



জগন্মাতা শ্রীশ্রীমা সারদা



জগজ্জননী মা সারদা



মায়ের কাছে ভগিনী নিবেদিতা



শতরূপে মা সারদা



রাধুকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীশ্রীমা চলেছেন জয়রামবাটীর পথে



বাঁদিক থেকে গৌরী মা দুর্গা রাধু, শ্রীশ্রীমা সারদা মাণু কুসুম ও হরির মা



জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে বধূ



শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে মাকু (ছেলে কোলে)



প্রণাম লহ শ্রীচরণে



দাঁড়িয়ে—গণেন্দ্রনাথ ও আশুতোষ। বসে—নলিনী শ্রীশ্রীমা রাধু ও লক্ষ্মী।

নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই ছিষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না, তিনিই পাচ্ছেন। তাইত যে এসে কেঁদে পড়ে তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিষে তাঁকেই করি।

"এরা সব ঘুমুতে বলে। ঘুম কি আর আছে, না আসে ? মনে হয় যতক্ষণ ঘুমুব ততক্ষণ জপ করলে জীবের কল্যাণ হবে। এক এক বার মনে হয়, এই শরীরটুকু না হয়ে একটা খুব বড় শরীর হত তাহলে কত জীবের কল্যাণ হত।

"একটা ডেও পিঁপড়ে যাচ্ছে—রাধি তাকে মারবে—দেখলুম কি তা জান ? সেটা পিঁপড়ে ত নয়, ঠাকুর—ঠাকুরের সেই হাত পা, মুখ, চোখ, সব সেই। রাধিকে আটকালুম—ভাবলুম, সব জীব ত ঠাকুরের! আমি আর কি করতে পাচ্ছি—কজনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন। সকলকে দেখতে পাত্তুম, তবে ত হত।"

সন্ধ্যা হল—মাঙ্গলিক শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। শ্রীমাও উঠলেন ঠাকুরকে সন্ধ্যা দেবার জন্য।

কোঠারে থাকাকালে সারদাদেবীর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়। তাঁর নিজেরও একান্ত ইচ্ছা ছিল, রামেশ্বর দর্শন, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রামেশ্বর থেকেই তাঁদের গৃহদেবতা রামশিলা সংগ্রহ করে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং সারদাদেবী সাগ্রহে এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন। কলকাতায় স্বামী সারদানন্দের কাছে খবর পৌঁছলে তিনি সানন্দে যাবতীয় ব্যবস্থা করেন এবং মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে পত্রযোগে মায়ের জন্য উপযুক্ত আয়োজনের কথা জানান। রামকৃষ্ণানন্দও মায়ের তীর্থদর্শনের ভার গ্রহণ করেন। শ্রীমার সঙ্গী হলেন কৃষ্ণলাল মহারাজ, গোলাপ-মা, রামবাবুর মা (বলরামবাবুর স্ত্রী), খুড়িমা ও রাধু। ইতিমধ্যে তিনি আশুতোষ মিত্র মারফৎ সুরবালাকেও জয়রামবাটী থেকে আনিয়ে নিয়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। কোয়ালপাড়ার কেদার দত্তের স্ত্রীও তাঁদের সঙ্গ গ্রহণ করেন। ১৯১০-র ফেব্রুয়ারি মাসে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে তাঁদের যাত্রা শুরু হল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ব্যবস্থামত গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে 'কেলনার' কোম্পানীর তৎকালীন বাঙালী ম্যানেজার স্টেশনে উপস্থিত হয়ে সকলকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। পরদিন আবার সকলে মাদ্রাজগামী ট্রেনে করে গন্তব্য পথে এগিয়ে চললেন। বিকালের দিকে গাড়ি যখন ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী হল তখন পাহাড়ের ধাপে বাড়িগুলি ট্রেন থেকে দেখে শ্রীমা আনন্দে উচ্ছ্বসিত—'দেখ দেখ ঠিক যেন ছবির মত।' পরদিন দুপুরে তাঁরা

পৌছলেন মাদ্রাজে। স্টেশনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং কয়েকজন দক্ষিণদেশীয় ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন। সকলে জয়ধ্বনি সহকারে শ্রীমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। মাইলাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সামনেই একখানি ভাড়াবাড়ির ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই বাড়িতে সঙ্গিনীদের নিয়ে প্রায় একমাস শ্রীমার অবস্থান। অবশ্য সেখানে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। এই সময় দেবমাতাকে লিখিত সারদাদেবীর একখানি পত্র বিশেষ মূল্যবান ঃ

সুন্দর বিলাস, মাদ্রাজ, ভারত

আদরের কন্যা আমার,

তোমার ১৭ জানুয়ারি ও ৯ ফেব্রুয়ারির দুইখানি পত্র পাইলাম। ওয়াশিংটন ও বোস্টনের কাজের বিবরণ খুব আগ্রহের সহিত আমি শুনিয়াছি। ভবিষ্যতে ঐ বিষয়ে আরও জানিবার ইচ্ছা রহিল।

দুইমাস কোঠারে কাটাইয়া আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি যে বাটীতে অবস্থান করিতে আমি এখন সেখানে আছি। দেড় মাস হইল এখানে আসিয়াছি। ইহাব মধ্যে আমি রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলাম এবং সেখানে চার দিন ছিলাম। বলরামবাবুর পরিবারের লোকেরা এখন আমার সঙ্গে আছে।সবাই ভাল আছে, কেবল উহাদের পরিবারের একজন মহিলা আন্ত্রিক জ্বরে ভুগিতেছে। সে সুস্থ হইয়া উঠিলেই আমরা কলিকাতা রওনা হইব। কাল আমাকে বাঙ্গালোর যাইতে হইবে। সেখানে দু'একদিন থাকিব তারপর এখানে ফিরিয়া আসিব।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এখন একটু ভাল। অন্যান্য সাধুরা ভাল আছেন।

তুমি, স্বামী পরমানন্দ এবং ওয়াশিংটন ও বোস্টনের সকল ভক্ত আমার আশীর্বাদ জানিও।

ইতি

তোমার স্নেহের মাতাঠাকুরানী

সারদাদেবীর অন্য পত্রগুলির মত এটিও তারিখবিহীন কিন্তু কতকগুলি বিষয় এই পত্রটি থেকে মোটামুটি নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। সারদাদেবী কলকাতা থেকে কোঠার রওনা হন ৫ ডিসেম্বর। সেখানে দু'মাস অবস্থানের পর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মাদ্রাজ পৌছান। মাদ্রাজ থেকে মাদুরা হয়ে রামেশ্বর যান। আবার বাঙ্গালোরে তাঁর উপস্থিতির তারিখ ২৪ মার্চ। 'কাল আমাকে বাঙ্গালোরে যাইতে হইবে' কথাগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় পত্রখানি ২২ বা ২৩ মার্চ লিখেছিলেন। শ্রীমা লিখিত (বা কথিত) 'দেড়মাস' অবস্থানের সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা হয়।

মাদ্রাজ থেকে প্রথমেই তিনি যান রামেশ্বরের পথে মাদুরায়। মাদ্রাজ থেকে ট্রেন-যোগে পরদিন সকালে সকলেই মাদুরা পৌছেছিলেন। তীর্থদর্শনের সুষ্ঠু

ব্যবস্থাপনার জন্য স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের গৃহে সকলে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেইদিনই অপরাহ্ণে সকলে মীনাক্ষী মন্দিরের পার্শ্বস্থ প্রস্তর নির্মিত 'শিবগঙ্গা' নামক সরোবরে স্নান করেন এবং মন্দিরে দেবীদর্শন করেন। মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি 'মণ্ডপম্'—তার মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত 'সহস্র স্তম্ভ' ও 'বসন্ত মণ্ডপম্'। এগুলি দর্শন করে তাঁরা মন্দিরে পূজা দেন এবং স্থানীয় প্রথানুযায়ী শিবগঙ্গার তীরে সকলে নিজের নিজের নামে প্রদীপ ভাসান। এছাড়া তিরুমল নায়েকের সুপ্রসিদ্ধ প্রাসাদ ও তেপ্‌পা কুলম নামে সুবৃহৎ সরোবর দেখেছিলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে মাদুরা থেকে রামেশ্বর অভিমুখে যাত্রাপথে মণ্ডপম-এ উপস্থিত হন এবং স্টীমারে সমুদ্রের খাড়ি অতিক্রম করে পাম্বান পৌঁছান। সেখান থেকে ট্রেনে রামেশ্বরে উপস্থিত হন রাত ১১টায়। পূর্ব ব্যবস্থামত পাণ্ডা গঙ্গারাম পীতাম্বর কর্তৃক সংগৃহীত ভাড়াবাড়িতে সকলে রাত্রি যাপন করে পরদিন মন্দিরে দর্শন ও পূজা দান করেন। রামেশ্বরে বালুকাময় প্রস্তরের লিঙ্গমূর্তি—কঠিন প্রস্তর মূর্তি নয়। গর্ভমন্দিরে রক্ষিত সেই লিঙ্গমূর্তিটি স্বর্ণমুকুটে আচ্ছাদিত। আগত ভক্তেরা সেই স্বর্ণমুকুটের উপর স্নান জল ঢেলে দেন। তবে অতি প্রত্যূষে অনাবৃত মূর্তিরও দর্শন পাওয়া যায়। রামেশ্বরে বিগ্রহের স্নান ও ভোগের ব্যবস্থা হয় গঙ্গাজলে।

পাম্বান দ্বীপ ও রামেশ্বর মন্দির ছিল তখন রামনাদের রাজার অধীন। তিনি স্বামীজীর ভক্ত। স্বামীজী এখানে এসে দর্শকের খাতায় যে মন্তব্য লিখেছিলেন এবং যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন বিগ্রহের সম্মুখস্থ দেওয়ালের গাত্রে এখনও তা' উৎকীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। সেই বিবেকানন্দের গুরুপত্নী শ্রীমা রামেশ্বর দর্শনে আসছেন শুনে তিনি তাঁর কর্মচারীদের তারযোগে তাঁর মন্দির ও বিগ্রহ দর্শনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীমা বিগ্রহ দর্শনে উপস্থিত হলে রাজাদেশ অনুযায়ী উপরের স্বর্ণ-আবরণ সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই অনাচ্ছাদিত লিঙ্গমূর্তি দর্শন করে সারদাদেবী অস্ফুট স্বগোতক্তি করেন, "যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।" নিকটবর্তী ভক্তদের কানে কথাটি পৌঁছলেই তাঁরা সচকিতে প্রশ্ন করেন, "মা কি বললেন?" সহাস্যে শ্রীমা উত্তর দিলেন, "ও একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।"[১] সারদাদেবী মনের সাধ মিটিয়ে রামেশ্বরকে

১। কলকাতায় ফেরার পর দেশে যাবার পথে কোয়ালপাড়ায় কেদারবাবু শ্রীমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'মা, রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন?' উত্তরে সেদিনও সারদাদেবী বলেন, 'বাবা যেমনটি রেখে এসেছিলাম, ঠিক তেমনিটি আছে।' *সদা উৎকর্ণ গোলাপ-মার কানে কথাটা পৌঁছতেই তিনি প্রশ্ন করেন, 'মা কি বললেন। শ্রীমা উত্তর দিলেন* 'কই কি বলব? বলছি এই তোমাদের কাছে যেমন শুনেছিলাম ঠিক তেমনিটিই দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল।' কিন্তু গোলাপ-মাও সহজে ছাড়ার পাত্রী নন, তিনি উত্তর দিলেন, 'না মা আমি সব শুনেছি। এখন আর কথা ফেরালে কি হবে?' পরে তিনিই সকলের কাছে শ্রীমায়ের এই মন্তব্য জানিয়ে দেন।

গঙ্গাজলে স্নান করান। এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আনীত একশো আটটি স্বর্ণনির্মিত বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করেন। রামেশ্বরে সারদাদেবী ত্রিরাত্র যাপন করেন এবং প্রতিদিনই মন্দিরে গিয়ে পূজার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দিনে মন্দিরে বিশেষ পূজার আয়োজন হয় এবং পুঁথি থেকে পাণ্ডাদের মুখে রামেশ্বর মাহাত্ম্য শ্রবণ করে তাঁদের ভোজন করান। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটি করে জলের ঘটি দিয়ে তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করেন। পুরাণ কথা শোনার সময় হাতে পান ও সুপারি নিয়ে বসার প্রথা প্রচলিত। কথা শেষ হলে সেইগুলি কথককে দান করতে হয়। শ্রীমা সেইসব আচার-আচরণ যথাযথভাবে পালন করেন।

কর্মচারীদের উপর রাজার আদেশ ছিল, মন্দির সংলগ্ন রত্নাগারটি, যা সাধারণ দর্শকরা দেখার সুযোগ পায় না যেন সারদাদেবীকে দর্শন করানো হয়। শুধু তাই নয় যদি তার থেকে কোন বস্তু শ্রীমা গ্রহণ করতে চান, তাহলে তা যত মূল্যবানই হোক না কেন, তৎক্ষণাৎ যেন তাকে সেটি প্রদান করা হয়। কর্মচারীদের মুখে রাজার নির্দেশের কথা শুনে সারদাদেবী বুঝতে পারলেন না, তাঁর চেয়ে নেবার মত কি আছে! তাঁর যা কিছু প্রয়োজন সবই তো শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মিটিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সরাসরি রাজার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করাও উচিত হবে না মনে করে তিনি বলেন, 'রাধু যদি কিছু নিতে চায় তো নিতে পারে।' রত্নাগার দর্শন প্রসঙ্গ শ্রীমার মুখ থেকেই শোনা যাক ঃ

"রামনাদের রাজা আমি এখানে এসেছি শুনে দেওয়ানকে হুকুম দিলেন মন্দিরের রত্নাগার খুলে আমাকে দেখাতে ; আর যদি আমি কোন জিনিস পছন্দ করি তখনই যেন তা আমাকে উপহার দেওয়া হয়। আমি আর কি বলব ? কিছু ঠিক করতে না পেরে বললাম, 'আমার কি প্রয়োজন ? আমার যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করছে', আবার তারা ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে বললাম, 'আচ্ছা রাধুর যদি কিছু দরকার হয় নেবে এখন', রাধুকে বললাম, 'দেখ তোর যদি কিছু দরকার হয় নিতে পারিস।' তারপর যখন হীরে জহরতের জিনিস সব দেখছে তখন কেবলই আমার বুক দুর দুর করছে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করছি 'ঠাকুর রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।' তা রাধু বললে, 'এ আবার কি নেব ? ও সব আমার চাই না। আমার লেখবার পেন্‌সিলটা হারিয়ে ফেলেছি—একটা পেন্‌সিল কিনে দাও।' আমি একথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তার দোকান থেকে দু পয়সার একটা পেনসিল কিনিয়ে দিলুম।"

ধনুস্কোডিতে শ্রীমার যাওয়া হয়নি তবে তিনি বিধিমত রূপার তীরধনুক সহ দু'জন সেবককে পাঠিয়ে দেন পূজা দিতে।

রামেশ্বরে ত্রিরাত্রি যাপনের পর আবার সকলে ফিরে আসেন মাদুরায়। সেখানে একদিন বিশ্রাম করে পুনরায় মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়

মাদ্রাজের আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হল—মায়ের উপস্থিতির ফলে সেবারের উৎসব হয়েছিল বিশেষ আকর্ষণীয়।

২৪ মার্চ (১০ চৈত্র) সারদাদেবী বাঙ্গালোর যান। মায়ের বর্ণনা অনুযায়ী "বাপ রে কত লোক। রেলপথ থেকে নামতে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। এত উঁচু হয়ে গেল রাস্তা। ঠাকুরেরও শেষটায় কত লোক। আমি তো এত বলি 'কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নাও, তারা প্রত্যাশা করে।' আমার তো কিছু প্রত্যাশা নেই। তা ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। আর আমারও শেষ হয়ে এল। এখন যে ক'দিন আছি, এমনি হবেই।"

তখন বাঙ্গালোরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ শহরের মধ্যে একটি নির্জন ও শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ছিল—বর্তমানে চতুর্দিকে অনেক বাড়ি তৈরী হলেও বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের মাঝখানে অবস্থিত বলে আশ্রমটির নির্জনতা বিঘ্নিত হয়নি। শ্রীমা ও তাঁর সঙ্গিনীদের জন্য আশ্রমস্থ মন্দিরের একাংশে থাকার ব্যবস্থা হল—আর সাধুভক্তদের জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছিল। স্থানটি ফুলফলে শোভিত অতি মনোরম। সামনেই বুল টেম্পল রোড—বুল টেম্পলে সুবৃহৎ বৃষভ মূর্তি—সেখানে প্রত্যহ ভক্ত ও দর্শনার্থীর ভিড়।

শ্রীমার আগমনবার্তা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোক তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে আশ্রমে উপস্থিত হতে শুরু করল। শ্রীমা প্রত্যেককেই নীরবে আশীর্বাদ করেন কারণ তাদের ভাষা তিনি জানেন না। একদিন অপরাহ্নে স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁকে নিকটবর্তী কেভ টেম্পলে (গুহা মন্দিরে) বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীমা গাড়িতে সেখানে গিয়ে দর্শনাদি সেরে গাড়িতেই আবার আশ্রমের ফটকে এসে দেখেন আশ্রমপ্রাঙ্গণ জনসমাকীর্ণ। মায়ের গাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো এবং পরমুহূর্তে সেইখানেই শুরু হল প্রণাম পর্ব। অভিভূত সারদাদেবী বরাভয় মুদ্রায় দক্ষিণ হস্তটি উত্তোলন করে সেইখানেই ৫ মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। অবশেষে ধীরে ধীরে আশ্রমবাটিতে প্রবেশ করে ঠাকুরের সামনে বড় ঘরটিতে বসলেন। দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দও তাঁর সঙ্গে সেখানে এলেন। কারও মুখে কোন কথা নেই। নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই চলেছে পরস্পর ভাব বিনিময়। নীরবতা ভঙ্গ করে সারদাদেবী এক সময় বিশুদ্ধানন্দজীকে বললেন, "এদের ভাষা তো জানি না। দুটি একটি কথা বলতে পারলে এরা কত শান্তি পেত।" বিশুদ্ধানন্দজী[১]

১। বাঙ্গালোরে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন আশুতোষ মিত্র। তিনি 'শ্রীমা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন সেসময় বাঙ্গালোরের মঠাধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ)। তিনি শ্রীমাকে মাদ্রাজে এসে বাঙ্গালোরে যাবার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর সঙ্গে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা পর্যন্ত ছিলেন। তুলসী মহারাজের অনুরোধেই মা টিলার ওপরে বসে জপ করেছিলেন।

মায়ের অভিপ্রায়ের কথা ইংরেজিতে অনুবাদ করে উপস্থিত সকলকে জানালে তাঁরা তাদের ভাষায় বললেন, "না, না, এই বেশ। এতেই আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে গেছে। এ ক্ষেত্রে মুখের ভাষার আর কোন প্রয়োজন নেই।"

সকল সময়ে মুখের কথাই ভাববিনিময়ের মাধ্যম এ কথা অন্ততঃ সারদাদেবীর ক্ষেত্রে খাটে না। আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্য দেশ থেকে আগত মহিলারাও অন্তর দিয়েই তাঁর অন্তর স্পর্শ করতেন—ভাষাহীনতাও হয়ে উঠত বাঙ্ময়। দেবমাতা যখন কলকাতায় শ্রীমাকে দর্শন করতে আসেন তখন তাঁর অনুভূতির বিবরণ দিয়েছেনঃ "আমরা একে অন্যের ভাষা জানতাম না। যখন পরস্পরের বক্তব্য বুঝিয়ে দেবার মত কেউ উপস্থিত থাকতেন না তখন তিনি হৃদয়ের অকথিত গভীরতর ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতেন। সে ভাষা বুঝতে আমাদের কারোরই কোন অসুবিধা হত না।"

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালের আরও একটি ঘটনা।

আশ্রমের পশ্চাদ্দিকে আশ্রমের জমির ওপরেই একটি টিলা ছিল। একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দু' একজন মহিলা ভক্তকে নিয়ে শ্রীমা সেই টিলার উপর উঠে সূর্যাস্ত দর্শন করছিলেন। শশী মহারাজেব কাছে খবর পৌঁছতেই তিনি বিহ্বলভাবে বলে উঠলেন, "এ্যাঁ, মা পর্বতবাসিনী হয়েছেন।" বলেই সেই দিকে ছুটলেন। একে স্থূল দেহ তার ওপর দ্রুত চলা এবং টিলার ওপরে ওঠা। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে শ্রীমায়ের সামনে উপস্থিত হলেন—মায়ের পায়ের ওপর মাথা রেখে স্তব করতে শুরু করলেন!

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

আর মাঝে মাঝে শুধু একটিই কথা 'কৃপা' 'কৃপা'। সারদাদেবী তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে তাঁকে শান্ত করেন। মঠাধ্যক্ষের (স্বামী নির্মলানন্দের) অনুরোধে পশ্চিমাস্য হয়ে তিনি কিছুক্ষণ জপ করেন। সেই টিলাটি আজও তীর্থক্ষেত্ররূপে পবিগণিত।

আব একদিনের কথা। একদিন শ্রীমা বড়ঘরের এক পাশে অতি সাধারণ পরিচ্ছদে (অবশ্য সর্বদাই তাঁর পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ) বসেছিলেন এবং সেই সময়ে সেই দেশের কিছু ভক্ত মহিলা তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা বহুমূল্য বস্ত্র-অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে সেখানে এসে ঘরের মাঝখানে আসন গ্রহণ করেন। কিছু পরে আরও কয়েকজন দর্শনার্থিনী উপস্থিত হয়ে ঘরের কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্টা সালঙ্কারা মহিলাকেই শ্রীমা মনে করে তাঁকে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই সেই ধনীজায়া উঠে দাঁড়িয়ে সে-দেশীয় ভাষায়

অনেক কথা বললেন, কিন্তু ততক্ষণে অভ্যাগতারা তাঁকে ঘিরে ধরেছে সকলেই তাঁর পাদস্পর্শের জন্য উদ্‌গ্রীব। অগত্যা কোনক্রমে তিনি তাঁদের সরিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন। শ্রীমা তাঁদের কোন কথাই বুঝতে পারেন না কিন্তু মূকাভিনয়ের মধ্যেই ঘটনাটি বুঝে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের বিড়ম্বনায় হাসতে লাগলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ বাঙ্গালোরে অবস্থানের পর সারদাদেবী ফিরে এলেন আবার মাদ্রাজে। সেখানে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে তিনি এবং অন্যান্য সকলে রওনা হলেন কলকাতা অভিমুখে। পথে আবার রাজমহেন্দ্রীতে যাত্রা ভঙ্গ—গোদাবরীতে স্নানের জন্য। এখানে জেলা জজ এম.ও. পার্থসারথী আয়েঙ্গারের গৃহে একদিনের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করে গোদাবরী-স্নান সারলেন। রাজমহেন্দ্রীতে একদিন অবস্থানের পর আবার ট্রেনে পুরী এসে পৌঁছান এবং তিন-চার দিন 'শশী নিকেতনে' অবস্থান করেন। ১১ এপ্রিল (১৯১১) সকলে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা এবং তীর্থ দর্শন সেরে কলকাতা ফেরার পর যেদিন তিনি বেলুড় মঠে পদার্পণ করেন সেদিন তাঁকে সমারোহ সহকারে বিপুল অভ্যর্থনা জানানো হয়। প্রবেশ দ্বারের দুদিকে স্থাপিত হল মঙ্গলঘট। পথের দু'ধারে শতাধিক ভক্ত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে করজোড়ে তাঁকে বরণ করেন। মঠের প্রবেশদ্বারে তাঁর গাড়ি পৌঁছলে ৯টি বোমা ফাটিয়ে শুভ মুহূর্ত ঘোষিত হয়। শ্রীমা ও তাঁর স্ত্রী ভক্তগণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে ভক্তগণ সমস্বরে 'ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা সারদাদেবী পদব্রজে তাঁর স্ত্রী ভক্তদের নিয়ে যখন অগ্রসর হলেন তখন স্বামী ব্রহ্মানন্দের কঠোর নিষেধ ছিল সেই সময় কেউ তাঁকে প্রণাম করবে না। কিন্তু সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করেই এক গৈরিকধারী সন্ন্যাসী অকস্মাৎ তাঁর পাদস্পর্শ করে একরকম ছুটেই উধাও হয়ে গেলেন। নিজের জারী করা নিয়ম লঙ্ঘনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কিন্তু ক্রোধে ফেটে পড়লেন না, তিনিও সকৌতুকে চিৎকার করে উঠলেন 'ধর, ধর, কে?' আসামী অচিরেই ধরা পড়লেন—স্বামী সুবোধানন্দ (খোকা মহারাজ)।

মঠবাড়ির উপরের একটি কক্ষে সারদাদেবীর বসার ব্যবস্থা হয়েছিল, নিচের ঘরে চলেছে কালীকীর্তন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তন্ময় হয়ে শুনছেন—অকস্মাৎ তাঁর শরীর নিস্পন্দ চক্ষু নিষ্পলক, সমস্ত দেহ স্থির—শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও নেই—তিনি সমাধিস্থ। এই অবস্থায় কালীকীর্তনের আসরেও দেখা দিল বিশৃঙ্খলা—সবাই তখন ছুটেছেন রাজা মহারাজের সমাধি-অবস্থা দেখার জন্য। *সকলের ব্যগ্র নয়ন তাঁর দিকে। সময় কেটে যাচ্ছে—অবস্থার কোন পরিবর্তন* নেই। উপরে সারদাদেবীর কাছে সংবাদ পৌঁছল—তিনি একজন সাধুকে ডেকে

অত্যন্ত গোপনে তাঁকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে সেটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কানের কাছে বার বার উচ্চারণের নির্দেশ দিলেন। (একসময় শ্রীমা যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে থাকতেন তখন রাত্রে তাঁর সমাধি হলে তাঁর কানে কি মন্ত্র শোনাতে হবে সমাধিভঙ্গের জন্য সেটা সারদাদেবীকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হয় সেই মন্ত্রটিই তিনি এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন;) সাধুটি নিচে নেমে শ্রীমায়ের নির্দেশমত রাজা মহারাজের কানে সেই মন্ত্র বার বার উচ্চারণের পর তিনি সহসা নিদ্রোত্থিতের মত চেতনা লাভ করে বলে উঠলেন—'হাঁ চলুক, চলুক।' আবার নতুন উৎসাহে শুরু হল কালীকীর্তন।

ঠাকুরের পূজার পর তাঁর প্রসাদ শ্রীমাকে নিবেদন করা হল। তিনি সামান্য একটু মুখে দিয়ে নিচে রাজা মহারাজ ও অন্যান্য ভক্ত সন্তানদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। থালা হাতে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী নিচে নেমে নাচতে শুরু করে দিলেন। উপস্থিত ছিলেন গিরিশচন্দ্র—তিনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শরচ্চন্দ্রের হাত থেকে থালা নিয়ে বললেন, 'ঠাকুরের প্রসাদ, মা'র স্পর্শে তা মহাপ্রসাদ হয়েছে। আমি থাকতে এ প্রসাদ কাউকে বিতরণ করতে দেব না।' কয়েকজন ভক্তকে প্রসাদ বিতরণের পর তিনি আবার থালা ফেরৎ দিলেন শরচ্চন্দ্রের হাতে।

আহারান্তে বিশ্রামের পর সায়াহ্নে যখন তিনি কলকাতা ফিরে যান তখন আবার তাঁর সম্মানে ন'টি বোমা ফাটানো হয়।[১]

পরদিন ১২ মে ভগিনী নিবেদিতা শ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ লাভ করেন। এইটিই উভয়ের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকার।[২] নিবেদিতা সেইদিনই মায়াবতী যাত্রা করেন।

দাক্ষিণাত্য থেকে সারদাদেবী ফিরে আসার পর শ্রীমতী সরযূবালা সেন একদিন

১। দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে আসার পর শ্রীমা কবে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন তার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। তিনি কি ট্রেন থেকে নেমে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা মঠে উপস্থিত হয়েছিলেন? প্রচলিত জীবনীতে প্রদত্ত বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ঘোড়ার গাড়িতে গিয়েছিলেন। বাগবাজার থেকে সাধারণত তিনি নৌকা যোগেই মঠে যাতায়াত করতেন। প্রধান ফটকে পৌঁছানোর কথায় বোঝা যায় তিনি হাওড়া ঘুরে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়েছিলেন। অনুমান করি হাওড়া স্টেশনে নেমে তিনি সোজা বেলুড় মঠে পৌঁছেছিলেন এবং সেদিনটি ছিল ১১ এপ্রিল।

২। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা তাঁর 'ভগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "১১ই এপ্রিল শ্রীমা দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর পুরী হইয়া কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ দিনই নিবেদিতা উদ্বোধনে গিয়া তাঁহার পাদবন্দনা করেন।" কিন্তু ম্যাকলাউডের কাছে ১২ এপ্রিলের পত্রে নিবেদিতা লিখেছেন, "শ্রীমা তাঁর দীর্ঘ-তীর্থযাত্রার পর গতকাল কলকাতা ফিরেছেন। আমি এখনও তাঁকে দেখতে যেতে পারিনি।" মনে হয় ১২ এপ্রিল মায়াবতী যাওয়ার পূর্বে তিনি শ্রীমার আশীর্বাদ লাভ করার জন্য উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁর কাছে রামেশ্বর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা কি দেখে এলেন বলুন।' শ্রীমা দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, "অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। সেখানকার মেয়েরা খুব লেখাপড়া জানে। আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললুম, 'আমি লেকচার দিতে জানি না, যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।"

গৌরী মা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।"

১৭ মে সারদাদেবী যাত্রা করলেন জয়রামবাটীর পথে।

॥ ১৬ ॥

১৯ মে সারদাদেবী জয়রামবাটী পৌঁছান। এই সময় রাধুর বিবাহ স্থির হয়। সেই সংবাদ কলকাতায় জানালে স্বামী সারদানন্দ যোগীন-মা ও গোলাপ-মাকে নিয়ে জয়রামবাটী উপস্থিত হন—বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। ১০ জুন তাজপুরের মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাধুর বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। রাধুর বয়স তখন বারো বছর আর মন্মথনাথের ১৫ বছর। বিবাহে রাধুকে প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কার যৌতুক দেওয়া হয়েছিল। পাত্রপক্ষও সুযোগ বুঝে নানা দাবী উপস্থিত করে। শ্রীমা সকল দাবীই পূরণ করেন। পরদিন বর ও কন্যাপক্ষকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি এবং অনিমন্ত্রিত গরীব দুঃখীরাও বাদ গেল না। সারদাদেবী একান্তে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে গরীব দুঃখীদের সঙ্গে দেখা করে আহারাদি ঠিকমত হয়েছে কি না ইত্যাদির সংবাদ নেন।

শ্রীমায়ের একটি বড়ো কালো বাক্স ছিল—সেটি তিনি রাধুকে দিয়েছিলেন। বরকন্যা বিদায়ের সময় সেই বাক্সটিও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে যে অতিরিক্ত হাজার টাকা ছিল সেটা তিনি বিস্মৃত হয়েছিলেন। বরকন্যা চলে যাবার পর ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন, 'এক হাজার টাকা রাধুর বাক্সে দিয়ে দিলে?' তখন তাঁর খেয়াল হতে বিভূতিবাবুকে তাজপুরে পাঠালেন। তিনি গিয়ে টাকা ফেরৎ আনেন।

রাধুর বিবাহ-উপলক্ষে যাঁরা জয়রামবাটীতে উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে স্বামী অরূপানন্দ অন্যতম। একদিন (২৬ মে, ১৯১১) সারদাদেবী কথাপ্রসঙ্গে জনৈক সন্ন্যাসী-ভক্তের সংবাদ জানতে চান। অরূপানন্দ বলেন—"তাঁর প্রাণটা তোমার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়েছে তিন-চার মাস ধরে।"

এ সংবাদে সারদাদেবী রীতিমত বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, "সে কি? সাধু সব মায়া কাটাবে। সাধুর মায়াতে জড়াতে নেই। কি কেবল 'মাতৃস্নেহ মাতৃস্নেহ' করে, মায়ের ভালবাসা পেলুম না—ওসব কি? বেটা ছেলে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরা—ও সব আমি ভালবাসি না। মানুষের আকৃতিটা তো? ভগবান তো পরের কথা। আমাকে কুলের ঝি বউ নিয়ে থাকতে হয়।..."

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে অরূপানন্দ প্রশ্ন করেন "বেদান্তবাদী সাধু যারা, তারা কি সব নির্বাণে যাবে?"

শ্রীমা—"তা বই কী। মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে—ভগবানে মিশে

যাবে। বাসনা হতেই দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্বাসনা হল সব ফুরাল।

"কোন ছেলে এল, খেলে-দেলে চলে গেল। মায়া কি? হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, 'আপনি নরেন-টরেন, ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা আপনার মনে খাচ্ছে-দাচ্ছে, আছে। আপনি ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?' ঠাকুর তার কথামত সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন।...একবার ভাবো দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন। ঠাকুর তখন বাহ্যে গিয়েছিলেন। রামলাল শৌচ করাতে পারলে না। কাকে শৌচ করাবে? সব শরীর জড়, কাঠ—শক্ত! তখন রামলাল বলতে লাগল, 'যেমনটি ছিলে তেমনটি হও, যেমনটি ছিলে তেমনটি হও।' বলতে বলতে শেষে দেহে মন এল। দয়ার মনকে নামিয়ে রাখতেন।...

"দেবতা বল, যা বল—সব এসে পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে। সূক্ষ্মদেহে তো আর খাওয়া-পরা কথাবার্তা কিছু নেই, তাই বেশিদিন থাকতে পারে না।"

অরূপানন্দ প্রশ্ন করেন, "খাওয়া-পরা কথাবার্তা নেই, তবে কি নিয়ে সময় কাটে?"

শ্রীমায়ের উত্তর—"কাঠের পুতুলটির মত যুগযুগান্তর ধরে যেখানে আছে সেখানেই থাকে। রামেশ্বরে যেমন দেখলুম, রাজাদের সব পাথরের মূর্তি পোষাক-পরা রয়েছে। আবার ভগবানের দরকার হয় তিনি নিয়ে আসেন সেখান থেকে। বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কি না—জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য তো, মিথ্যা হবার জো নেই।"

অরূপানন্দের প্রশ্ন—"তবে আমাদেরও কি কাঠ-মাটির পুতুলের মতো হয়ে থাকতে হবে?"

শ্রীমা—"না, তোমরা তাঁর সেবা করবে। দুটি থাক আছে। একটি এখানকার মতো ভগবানের সেবাদি নিয়ে থাকে। অপরটি ঐ রকম পুতুলের মতো যুগযুগান্তর ধরে ধ্যানমগ্ন।"

অরূপানন্দের প্রশ্ন—"মা ঠাকুর বলতেন যে, ঈশ্বরকোটি নির্বাণের (নির্বিকল্প সমাধির) পরও ফেরে, আর কেউ পারে না, এর মানে কি?"

শ্রীমা—"ঈশ্বরকোটি নির্বাণের পরও মনটি গুছিয়ে আনতে পারে।"

অরূপানন্দ—"যে মন লীন হয়ে গেল, সে মন কি করে ফিরে আসে?এক ঘটি জল পুকুরে ফেলে দিলে কি করে সেই জলটুকুই বেছে আনবে?"

শ্রীমা—"সব্বাই পারে না। যাঁরা পরমহংস তাঁরা পারেন। হাঁস, জল দুধ একত্র করে দাও, দুধটুকু বেছে খাবে।" ১

অরূপানন্দ—"সবাই কি নির্বাসনা হতে পারে?"

শ্রীমা—"পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে—পুনঃ-পুনঃ জন্মাচ্ছে।..."

অরূপানন্দ—"মা এই অনন্ত সৃষ্টিতে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে? এই যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, ওতে কোন জীবের বাস আছে কি না কে বলবে?"

শ্রীমা—"মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব। ও সব গ্রহ নক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।"

২১ আগস্ট (৪ ভাদ্র, ১৩১৮), ১৯১১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহাসমাধি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘকাল মাদ্রাজে সাংগঠনিক কর্মে ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবপ্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শ্রীমায়ের দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে তাঁর তীর্থদর্শন যাতে সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হয় তার জন্য স্বয়ং সঙ্গে থেকেছেন এবং শ্রীমায়ের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়েছেন। মায়ের নিকট-সান্নিধ্য এই সময় তিনি বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন। মাদ্রাজে মঠ সংগঠনের জন্য অতি পরিশ্রম এবং দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধনার ফলে তিনি তৎকালে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় এনে মায়ের বাড়িতে রাখা হয়—চিকিৎসকরাও তাঁদের সাধ্যমত চেষ্টা করেন কিন্তু যাবতীয় প্রচেষ্টা নিষ্ফল করে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল মাতৃচরণ দর্শন। সেই অনুরোধ নিয়ে জয়রামবাটীতে লোক পাঠানো হল কিন্তু তিনি আসতে রাজি হলেন না—সন্তানের অনিবার্য মৃত্যু মা হয়ে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা তাঁর ছিল না—তদুপরি তখন তাঁর সংসার বিরাট, সেই বিরাট সংসার নিয়ে 'উদ্বোধন'-এ উপস্থিত হলে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি ঘটবে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন মাতৃভাবে বিশেষভাবে আপ্লুত। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে সামান্য সুস্থ অবস্থায় সুগায়ক পুলিন মিত্রকে ডেকে এনে একটি গান রচনা কবতে বললেন যার প্রথম পঙ্ক্তিটি তিনি নিজেই রচনা করে দিলেন—'পোহাল দুঃখ রজনী'। পুলিনকৃষ্ণ নিজে গান রচনা না করে ভার দিলেন গিরিশচন্দ্রের উপর। সম্পূর্ণ গানটি রচনা করলেন গিরিশচন্দ্র ঃ

'পোহাল দুঃখ রজনী'
গেছে 'আমি আমি' ঘোর সুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
হের জ্ঞান অরুণবদন বিকাশে, হাসে জননী।
বরাভয়-করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চ তান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি শমনবিজয়, মা'র নামে পূর্ণ অবনী।

কহিছে জননী, কেঁদনা
রামকৃষ্ণ পদ দেখনা
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা
হের মম পাশে করুণায় দুটি আঁখি ভাসে
ভুবনতারণ গুণমণি ।।

রামকৃষ্ণানন্দজীর অন্তিম সাধ অপূর্ণ থাকেনি। পুলিন মিত্র মহাশয় গানে সুরারোপ করে তাঁকে যখন গানটি শোনাচ্ছিলেন, তখনই তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বলে উঠলেন, 'মা এসেছ!' সেটিই তাঁর অন্তিম নিঃশ্বাস পড়ার মুহূর্তে শেষ কথা।

মায়ের কাছে শশী মহারাজের মহাসমাধির সংবাদ পৌঁছলে তিনি কেঁদে উঠে বলেন, "শশীটি আমার চলে গেছে—আমার কোমর ভেঙে গেছে।" আগস্ট থেকে অক্টোবর—মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে আরও একটি মৃত্যু। ১৩ অক্টোবর দার্জিলিঙে নিবেদিতা অন্তিম নিঃশ্বাস ফেললেন। শ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের হৃদয়ের সম্পর্ক উদ্বোধনের সান্ধ্য আসরটি তিনি এবং লক্ষ্মীদেবী মাতিয়ে রাখতেন একদিন নিবেদিতা সাজলেন সিংহিনী আর পিঠে চেপে বসলেন জগদ্ধাত্রীর সাজে লক্ষ্মীদেবী। সরলা বালিকার মত মা সব দৃশ্য উপভোগ করেছেন। মায়ের বাড়িটি ছিল নিবেদিতার ধ্রুব মন্দির।নিবেদিতার মৃত্যুর পরে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীমায়ের অশ্রু ঝরে পড়ত, বলতেন, 'যে হয় সুপ্রাণী তার জন্যে কাঁদে মহাপ্রাণী।' স্বয়ং উত্থাপন করতেন নিবেদিতা প্রসঙ্গ। সারদাদেবী একবার তাঁকে একটি পশমের পাখা তৈরী করে উপহার দেন। সেটি পেয়ে নিবেদিতা আনন্দে উচ্ছ্বসিত। 'কি সুন্দর, কি চমৎকার!' শ্রীমা বললেন, 'একটা সামান্য জিনিষ পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা কি সরল বিশ্বাস। যেন সাক্ষাৎ দেবী। সামান্য জিনিষ পেয়ে আনন্দ কি শুধু নিবেদিতার একার? একবার নিবেদিতা শ্রীমাকে দেন একটি জার্মান সিলভারের কৌটা। সারদাদেবী তাতে রাখতেন ঠাকুরের পবিত্র কেশ; বলতেন, 'পূজার সময় কৌটাটি দেখলে নিবেদিতার কথা মনে পড়ে।' আর একবার নিবেদিতা তাঁকে দিয়েছিলেন একটি এণ্ডির চাদর। সেটি জীর্ণ হয়ে গেলেও সারদাদেবী ফেলে দিতে রাজি নন—তার ভাঁজে ভাঁজে কালো জিরে দিয়ে সযত্নে রক্ষা করতেন। বলতেন, 'কাপড়খানিকে দেখলে নিবেদিতার কথা মনে পড়ে। আহা, কি মেয়েই ছিল!'

২৩ নভেম্বর শ্রীমা কলকাতা যাত্রা করলেন। কলকাতা অভিমুখে জয়রামবাটী পরিত্যাগের দু'চার দিন আগে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ কেদারবাবু (পরে স্বামী কেশবানন্দ) জয়রামবাটী থেকে শ্রীমায়ের কোয়ালপাড়া আশ্রমে আসার নির্দিষ্ট সময় জানবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলে শ্রীমা তাঁকে বলেন, 'দেখ, বাবা,

তোমরা যখন ঠাকুরের জন্যে ঘর এবং আমাদের বিশ্রামের জন্য স্থান একটু করেছ তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। আমাদের যা' কিছু সবের মূলে ঠাকুর। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে বেচাল হবে না। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে?'

কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন ধ্যানজপ পূজাপাঠের চেয়ে চরকায় সুতা কাটা, তাঁত বোনা প্রভৃতি স্বদেশীয়ানার দিকেই বেশি ঝোঁক। ফলে আশ্রমটির উপর পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ নজর ছিল। প্রায়ই পুলিশ দল এসে আশ্রমে নবাগতদের খোঁজ খবর নিয়ে যেত। কেদারবাবু মায়ের এই কথার সরাসরি প্রতিবাদ না করে বিনীতভাবে বললেন, 'স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না হত!' কেদারবাবুর এই যুক্তির উত্তরে শ্রীমা বলেন, "ও বাবা, নরেন আমার থাকলে কোম্পানী কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, 'মা আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি এবং সেখানেও দেখলুম, ঠাকুরের কি মহিমা, কত সজ্জনলোক আমার কাছে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো আগ্রহ সহকারে শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে।' তারাও তো আমার ছেলে—কি বল?"[১]

অতি প্রত্যূষে সারদাদেবী এবং রাধু, তার স্বামী মন্মথ, মাকু পালকিতে কোয়ালপাড়া যাত্রা করলেন—সুরবালা, নলিনী, ভূদেব প্রভৃতি অন্যান্য সকলে গরুর গাড়িতে। তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সঙ্গে গেলেন ব্রহ্মচারী প্রকাশ। সেখানে পৌঁছে শ্রীমা স্নান সেরে নিজের ও শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো পাশাপাশি রেখে পূজা করলেন। তাঁর আদেশে হোমাদি নিষ্পন্ন করলেন কিশোরী মহারাজ। কোয়ালপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মন্দির। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে শ্রীমা, লক্ষ্মীদেবী ও নলিনী কেদারবাবুর বাড়ি গেলেন পায়ে হেঁটে। এই সংবাদ প্রকাশ মহারাজের কানে পৌঁছতেই তিনি বিরক্তির সঙ্গে সকলকে ভর্ৎসনা শুরু করলেন, "তোমরা মায়ের মর্যাদা কিছুই জান না। আমাকে না বলে তাঁকে হাঁটিয়ে

১। সারদাদেবীর কথাগুলি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে—তিনি বলেছেন, 'শুধু স্বদেশী করে কি হবে' অর্থ আধ্যাত্মিকতা বর্জিত স্বদেশ প্রেম জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারে না, তা নিছক জাতি বিদ্বেষের পটভূমিকা রচনা কবে মাত্র। অথচ সে জাতির মধ্যেও রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ গুণগ্রাহীর দল—বিশ্বমাতার কাছে সকল সন্তানই সমান।

নিয়ে গেলে কেন। যাই হোক ফেরার সময় তাঁকে পালকি করে নিয়ে এসো।" তারপর নিজেই পালকি বেহারা যোগাড় করে রওনা হলেন কেদারবাবুর বাড়ির দিকে। পথের মাঝখানেই দেখা পেলেন শ্রীমায়ের—তিনি তখন ফিরে আসছেন। প্রকাশ মহারাজকে দেখে আর তাঁর উদ্যোগের কথা শুনে বিরক্ত শ্রীমা বললেন, "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হল আমার বৈঠকখানা। এই সব ছেলেরা [কোয়ালপাড়ার] আমার আপনার লোক। আমি এ দেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভেতর পুরে রাখো—আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামত পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না—শরৎকে লিখে দাও। অপ্রতিভ প্রকাশ মহারাজ শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে নিষ্কৃতি পেলেন—শ্রীমা এবং অন্যান্য সকলে পদব্রজেই আশ্রমে ফিরলেন।

সন্ধ্যা ৬টার আগেই যাত্রা শুরু করতে হবে। পথের জন্য খাবারের ব্যবস্থা তার আগেই শেষ করতে হবে। তার জন্য সকলে শশব্যস্ত কিন্তু চেষ্টা করেও সেটা সম্ভব হল না। অগত্যা স্থির হল, শ্রীমা যাত্রা শুরু করুন, যেভাবে হোক তাঁর খাবার রাস্তাতেই পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রকাশ মহারাজ রীতিমত বিরক্ত কিন্তু সকল কথা শুনে শ্রীমা বললেন, 'তুমি মাথা গরম করে এত রাগারাগি করছ কেন? এ আমাদের পাড়াগাঁ, কলকাতার মতো এখানে কি সব ঘড়ির কাঁটায় হয়ে ওঠে? দেখছ, সকাল থেকে ছেলেরা কি খাটাই খাটছে। তুমি যাই বল না কেন, এখান থেকে না খেয়ে যাওয়া হবে না।' তাঁর নির্দেশই পালিত হল শেষ পর্যন্ত। রাত আটটায় খাওযা-দাওয়া শেষ করে আটখানি গরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হল।

অবশেষে ১৪ নভেম্বর (১৯১১) কলকাতায় নিজের বাড়িতে পৌঁছলেন সারদাদেবী। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আবার মায়ের বাড়ি জনমুখর মন্ত্রপ্রার্থীর দল ভিড় করে আসতে আরম্ভ করল—আর দ্বার তো সর্বদাই কৃপাপ্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। এ ব্যাপারে সাধুদের উদাসীনতা দেখে নিজেই বলেছেন, "তোমরা কি মনে কর যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন তাহলে যাদের ভার নিয়েছি, তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে?... যাদের নিজের বলে নিয়েছি তাদের তো আর ফেলতে পারি না।"

স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে সারদাদেবী চিরদিনই আগ্রহী। বার বার নিবেদিতার স্কুলে উপস্থিত হয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার সম্পর্কে তিনি সচেতন। মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক সংসারের বাঁধাধরা গণ্ডি ছেড়ে ত্যাগ ও তপস্যার দিকে অগ্রসর হয়ে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাক—সর্বান্তঃকরণে তিনি তা চেয়েছেন। অনেক শিষ্য-শিষ্যাকে কন্যাদের

আশ্রমে রেখে সৎ শিক্ষা দানের পরামর্শ দিয়েছেন। সেই রকম একটি পত্র উদ্ধৃত হল ঃ

পোঃ বাগবাজার
১২ জানুয়ারি ১৯১২

তোমার পত্র হস্তগত হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম।... তোমার কন্যাকে শ্রীমতি গৌরদাসীর নিকট রাখিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম, তাহার মঙ্গল হইবে। অধিক আর কি লিখিব, আমার শুভাশীর্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—

শ্রীশ্রী সন্নিধানে সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণী
তোমার মা।

৮ ফেব্রুয়ারি ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের তিরোধান। ৯/২/১২ তারিখের অর্থাৎ তিরোভাবের পরদিন স্বামী অরূপানন্দের সঙ্গে গিরিশপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। অরূপানন্দজী বললেন, "সন্ধ্যা ৬টার পরে যে [গিরিশচন্দ্র] শুলেন, আর তেমন চৈতন্য হয় নাই। এর খানিকক্ষণ আগে কেবল 'চল' 'চল' করছিলেন। 'একটু ধর না রে বাপ'—এই সব। শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট অরূপানন্দজী তখন বলেছিলেন 'কি আপনি কেবল চল চল কর্চ্ছেন? আপনি এখন ঠাকুরের নাম করুন যাতে ভাল হবে। অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় গিরিশ বলেছিলেন, "তা কি আর আমি জানি না?"[১]

অরূপানন্দের বর্ণনা শুনে শ্রীমা বললেন, "যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হল যেন ঐ চিন্তাতেই ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে। কেউ তাঁর বাহু হতে, কেউ পা হতে, কেউ লোম হতে হয়েছে। সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।"

চতুর্থীর দিন সকালে গিরিশচন্দ্রের বাড়ি থেকে লোক এলো শ্রীমাকে নিয়ে যেতে কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। "সে [গিরিশ] নেই, আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল, কী ভক্তি বিশ্বাসই ছিল।"

এইসময় একদিন একজন উন্মাদ ব্যক্তি এসে শ্রীমার কাছে ভারী গোলমাল শুরু করে। মনে হয় অনেক অকথা কুকথাও বলেছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি কথা-প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেন, "তিনি (ঠাকুর) কাউকে জানতেও দেননি কত সাবধানে রেখেছিলেন। এখন তেমনি বাজারে ঢাক পিটিয়ে দিয়েছে।মাস্টারই

১। গিরিশবাবুর গঙ্গাযাত্রার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু ভ্রাতা অতুলচন্দ্র বলেছিলেন, 'আমার ভাইকে আবার গঙ্গাযাত্রা!' তিনি যেতে দেননি। গিরিশচন্দ্র যে এই কারণেই কথাগুলি বলছিলেন, অরূপানন্দজী সে কথা বুঝতে পারেননি।

ঐরূপ করলে, 'কথামৃত'-এ ছাপিয়ে দিয়ে মাথা বিগড়ে দিয়েছে। গিরিশবাবুর ঠাকুরের ওপর ঐ রকম জোর। গালমন্দ দিয়েছে কি না তাই ওরাও অমন করতে চাইছে।"

অপূর্বানন্দ বললেন, "তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছে করেই দাও।"

শ্রীমার উত্তর, "দয়ায় মন্ত্র দি। ছাড়ে না, কাঁদে। দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দি। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।"

২৪/২/১২ তারিখে পোল্যান্ডের এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা এসেছিলেন, সারদাদেবীর কাছে। এই মেয়েটি ভারতে এসেছিলেন বেদান্ত শিক্ষা করতে। কিছুক্ষণ আলাপের পর (স্বামী অপূর্বানন্দ দোভাষীর কাজ করেছিলেন) তিনি বলেন, তাঁদের দেশের 'বাহাই' সম্প্রদায়ের শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরূপ—সর্বধর্ম সমন্বয়। মহিলাটি বিদায় নেবার পর সারদাদেবী বলেন, "ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কূলকিনারা নেই।"

উদ্বোধন ২৫/৬/১২ তারিখে অরূপানন্দ সারদাদেবীকে প্রশ্ন করলেন, "মা, এই যে কেউ কেউ বলেন, মঠের সেবাশ্রম, হাসপাতাল, বই বেচা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সাধুরা যে করছে, এ ভাল নয়। ঠাকুর কি এই সব করেছিলেন? নূতন নূতন যারা ব্যাকুলতা নিয়ে মঠে ঢুকছে তাদের ঘাড়ে এই সব কর্ম চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্ম করতে হয় ত পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্তন—এই সব করবে। অন্য সব কর্ম বাসনা জড়িয়ে ঈশ্বর থেকে বিমুখ করে।"

সারদাদেবী বললেন, "তোমরা ওদের কথা শুনো না। কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায়? ঠাকুরের কথা বলছে—তাঁর কথা আলাদা। আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছে বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? শরীরে অসুখ হয়ে পড়বে। আর কেই বা এখন সাধুদের এত ভিক্ষা দিচ্ছে? তোমরা ওসব কথা কিছু শুনো না। ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।

"মণি মল্লিক সাধু দেখে এসে ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর বললেন, 'কি গো, কেমন সব সাধু দেখলে?' সে বললে, 'হাঁ, দেখলুম তো, তবে—সব্বাই পয়সা চায়।' ঠাকুর বললেন, 'কি আর পয়সা চায়? হয়তো একটা পয়সা, গাঁজা কি তামাক খাবে—এই পর্যন্ত। তোমার ঘিয়ের বাটি, দুধের বাটি, গদি—এ সব চাই। আর তার একটা আধটা পয়সা মাত্র—হয়তো একটু তামাক কি গাঁজা খাবে। এও

চাই নে? সব ভোগ তোমরাই করবে? আর তারা এক পয়সার তামাকও খাবে না?'"

অরূপানন্দ বললেন, "বাসনা থেকেই ভোগ।"

শ্রীমা উত্তর দিলেন, "তাই তো বাসনা থেকেই সব। বাসনা না থাকলে কিসের কি? এই যে আমি এসব নিয়ে আছি—কই আমার তো কোন বাসনা হয় না—কিছুই নয়।"

অরূপানন্দ—"মা আমাদের ভিতর কত কি তুচ্ছ বাসনা উঠছে, এ সব কি করে যাবে?"

সারদাদেবী—"তোমাদের ও সব কোন বাসনা নয়। ও কিছু নয়। মনের খেয়ালে অমনি উঠছে, যাচ্ছে। ও সব যত বেরিয়ে যায়, তত ভাল।[১]

"যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ও সব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, তবে সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয়, আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।"

৭/৭/১২ তারিখে শ্রীমার কাছে অরূপানন্দ প্রশ্ন করেন "মা কর্মের ফল কি খণ্ডন হয়? শাস্ত্রে বলে জ্ঞান হলে খণ্ডন হয়। তাও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়।"

শ্রীমার উত্তর. "কর্ম হতেই সুখদুঃখ সব। তাঁকেও কর্মফল ভোগ করতে হয়েছিল। ঠাকুরের বড়ভাই বিকারের সময় জল চেয়ে খাচ্ছিলেন। একটুখানি খেতেই ঠাকুর হাত থেকে গ্লাসটি টেনে নিলেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুই আমাকে জল খেতে দিলি নি, তুইও এমনি কষ্ট পাবি তোর গলায়ও এমনি যাতনা হবে।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি তো তোমার মন্দ করিনি। তোমার অসুখ, জল খেলে অনিষ্ট হবে, তাই দিইনি। তবে কেন তুমি আমায় এমন শাপ দিলে?' তিনি কেঁদে বললেন, 'কি জানি ভাই, আমার মুখ থেকে ওকথা বেরিয়ে পড়ল। এ তো অন্যথা হবে না।'...

"কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপ তপ করলে কর্মফল অনেকটা খণ্ডন হয়। যেমন সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা করেছিল বলে লক্ষ পাঁঠায় মিলে তাঁকে

১। কোন এক সময য একজন ত্যাগী ভক্ত সাবদাদেবীকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন "মা, সাধন ভজন তো কবা যাচ্ছে, চেষ্টাও কম কবছি না কিন্তু মনে আবর্জনা যেন কমছে না।" উত্তবে শ্রীমা বলেন, "লাটাইতে সুতো যে ভাবে গুটিয়েছে—লাল সুতো, কাল, সাদা—খোলবার সময় তেমনি করে করে খুলবে তো।"

এক কোপে কাটলে। তার আর পৃথক লক্ষ বার জন্ম নিতে হল না। দেবীর আরাধনা করেছিল কি না! ভগবানের নামে কমে যায়।”

এই দিনই অরূপানন্দজী তাঁকে আরও একটি প্রশ্ন করেন, ‘আচ্ছা মা, তুমি জয়রামবাটীতে বলেছিলে, সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে, একটি একটি করে হয়নি।’

উত্তরে শ্রীমা বলেন, ‘তিনি কি আর একটি একটি সৃষ্টি করেছেন? এ যেন তাঁর একটা কল চলছে—এই যেমন ময়দার কল। কলওয়ালা দেখছে, কলটি যাতে নষ্ট না হয়। সে কি কোথাও একটি একটি করে গম গুঁড়ো হচ্ছে দেখছে? তেমনি তাঁর কলটি তিনি ঠিক রাখছেন। কোথায় কে কি খুঁটিনাটি করছে তা কি তিনি অত দেখছেন? তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, তাঁকে সর্বক্ষণ দেখতে হচ্ছে। অত খুঁটিনাটি দেখলে কি চলে?’

১৬ অক্টোবর, ১৯১২ —মঠে দুর্গাপূজা, দেবীর বোধন। সারদাদেবীর বিকালে মঠে আসবার কথা কিন্তু সন্ধ্যা হতে চলল—তখনও তিনি এসে পৌঁছননি। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বাবুরাম মহারাজ ছুটোছুটি করছেন। তখনও মঙ্গলঘট ও কলাগাছ স্থাপিত হয়নি দেখে বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ‘এখনও এ সব হয়নি, মা আসবেন কি!’ বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের গাড়ি মঠে পৌঁছল। গোলাপ-মা তাঁকে হাত ধরে নামালেন। চারদিকে সুবন্দোবস্তের দিকে তাকিয়ে শ্রীমা বললেন, “সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুণ এলাম।” মঠের উত্তর দিকে বাগানবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল—সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর পাশের ঘরটি নির্দিষ্ট হল যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও লক্ষ্মীদিদির জন্যে।

বোধনের দিন রাত্রে গিরিশচন্দ্রের ভগিনী দক্ষিণাকালী (ন’দিদি নামে সমধিক পরিচিত) আকস্মিকভাবে মারা যান। পরদিন বিকালে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে বললেন, “আর মানুষ, এই আছে, এই নাই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্মাধর্মই সঙ্গে যাবে। পাপপুণ্য মৃত্যুর পরেও সঙ্গে যায়।”[১]

সারদাদেবী বোধনের দিন উপস্থিত হয়ে একাদশী পর্যন্ত মঠে অবস্থান করেন। মহাষ্টমীর রাত্রে ‘জনা’ নাটক এবং বিজয়ার রাত্রে ‘রামাশ্বমেধ’ যাত্রাভিনয় হয়। শ্রীমা দোতলায় বসে নাটক দুটি দেখেন। মহাষ্টমীর দিন রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ১০৮টি পদ্মফুল দিয়ে শ্রীমাকে পূজা করেন। নবমীর দিন গোলাপ-মা, সারদাদেবীর বার্তা বহন করে সারদানন্দের কাছে গিয়ে বলেন, ‘শরৎ, মা-ঠাকরুণ

১। পরে একদিন (২৯ শ্রাবণ, ১৩২৫) গিরিশ-ভগিনী প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন, “আহা গিরিশ ঘোষের বোন আমাকে বড় ভালবাসত, বাড়িতে যা রান্নাবান্না করত আমার জন্যে আগে

তোমাদের সেবায় খুব খুশি। তোমাদের তাঁর আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।' সারদানন্দের পাশেই বসেছিলেন স্বামী প্রেমানন্দ। শ্রীমায়ের প্রীতিতে উৎফুল্ল হৃদয়ে উভয়ে কোলাকুলি করেন।

নিরঞ্জনের সময় যে নৌকায় বিসর্জনের জন্য প্রতিমা তোলা হয়েছিল সেই নৌকায় ডাক্তার কাঞ্জিলাল দেবীমূর্তির সামনে নানা মুখভঙ্গী ও রঙ্গব্যঙ্গ করছিলেন যা উপস্থিত অনেকেই উপভোগ করেছিলেন কিন্তু এই লঘুতা জনৈক ব্রহ্মচারীর পছন্দ হয়নি। শ্রীমা দোতলায় বসে সবই দেখেছিলেন। ব্রহ্মচারীটির বিরক্তির প্রতি শ্রীমায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জনৈক সাধু। সারদাদেবী কাঞ্জিলালকে সমর্থন করে বলেন, "না, না, এসব ঠিক। গান-বাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ—এ সব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।" ২২ অক্টোবর তিনি ফিরে যান উদ্বোধনে।

রেখে নিয়ে আসত। কতরকম রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে নিয়ে এসে বসে বসে আমাকে খাওয়াতো।...তার ভালবাসা মুখ-দেখান ছিল না। বড় ঘরের বৌ ছিল, টাকা পয়সা ছিল, সে সব পাঁচজনে নিয়ে নষ্ট করলে। অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসল। তাছাড়া এক বৎসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করেছিল। শেষে মরবার সময় আমার জন্যে একশ' টাকা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকতে হাতে করে দিতে লজ্জাবোধ করেছিল—কি বলে মাত্র একশ'টি টাকা দেয়, দেহ রাখবার পরে তার ভাই এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যায়। আহা! বোধনের দিন দুপুরে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল।... যাবার সময় বললে, তবে আসি মা। আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললাম, হাঁ যাও।... সে যেতেই মনে হল বললুম কি? যাও বললুম? এমন কথা তো কাউকে বলি নে। আহা! আর এল না। কেনই বা অমন কথা মুখ দিয়ে বেরুল!"

॥ ১৭ ॥

পূজার পরে ৫ নভেম্বর (১৯১২) সারদাদেবী উপস্থিত হন কাশীতে। প্রথম বেলা ১টায় তিনি পদার্পণ করেন অদ্বৈত আশ্রমে। কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে ও বিশ্রাম করে তাঁর আবাসস্থল 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ চলে যান। 'লক্ষ্মীনিবাস' তখন কিরণ দত্তরা নতুন তৈরী করেছেন। এখানে তিনি প্রায় আড়াই মাস ছিলেন। এবার তাঁর কাশীবাসের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছিলেন ডাক্তার নৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান সেরে হাতে কিছু মিষ্টি নিয়ে শ্রীমাকে প্রণাম করতে আসতেন তিনি। শ্রীমায়ের বিভিন্ন স্থান দর্শনের জন্য নিজের গাড়িটি দিয়েছিলেন নৃপেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু শম্ভুবাবু। শ্রীমায়ের সঙ্গে সেবার ছিলেন গোলাপ-মা, ভানুপিসি, কোয়ালপাড়ার কেদারবাবুর মা, শ্রীম'র স্ত্রী ও শ্যালিকা, শ্রীম স্বয়ং এবং বিভূতিবাবু প্রভৃতি কয়েকজন।

লক্ষ্মীনিবাসের প্রশস্ত বারান্দা দেখে আনন্দিত শ্রীমা মন্তব্য করেছিলেন, "ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।"

পরদিন সারদাদেবী পালকিতে ॑ বিশ্বনাথ ও ॑ অন্নপূর্ণা দর্শনে যান। ৯ নভেম্বর ॑শ্যামাপূজার পরদিন সকালে মিশন সেবাশ্রমে পদধূলি দেন। সে-সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, চারুবাবু, ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমা'র পালকির সঙ্গে পদব্রজে স্বামী অচলানন্দ রোগীদের আবাস পরিদর্শন করান ও সেগুলির পরিচয় দেন। সেগুলি দেখা শেষ হলে তিনি দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে আসন গ্রহণ করেন। কথাপ্রসঙ্গে সেবাশ্রমের বাড়ি, বাগান ও ব্যবস্থার প্রশংসা করেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" তিনি জানতে চান, "এটি প্রথমে কি করে আরম্ভ হল? এ ভাবটি প্রথমে কার মাথায় ঢুকেছিল?" কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ) চারুবাবু প্রভৃতির যত্ন ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করে বলেন, "বাড়ি তৈরীর সময় বুড়ো বাবা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছেন।" মহারাজ কেদারবাবার যত্ন উদ্যম ও পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করেন। আনন্দপ্রকাশ করে সারদাদেবী বলেন, "স্থানটি এতো সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতেই থেকে যাই।" 'লক্ষ্মীনিবাসে' ফিরে আসার পর একজন ভক্ত সেখান থেকে এসে সেবাশ্রমের অধ্যক্ষের কাছে ১০ টাকা জমা দিয়ে বলেন, "শ্রীশ্রীমার সেবাশ্রমে

দান এই দশটাকা জমা করে নেবেন।"

সেবাশ্রম যে প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরেরই কাজ সেটা শ্রীমা'র মুখ থেকে শোনার পর সকলেই বিশেষ উৎসাহিত। রাজা মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে মায়ের অভিমত শোনালেন, আবার ঠিক সেই সময়ে শ্রীম বা মাস্টারমশাই-ও এসে পৌঁছেছেন। শ্রীম সাধনভজন ছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কাজের বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর মতে এ সব কাজ রামকৃষ্ণ ভাবধারার অনুকূল নয়। আজ স্বয়ং শ্রীমায়ের অনুমোদনে উৎসাহিত ব্রহ্মানন্দজী কয়েকজন ব্রহ্মচারী মারফৎ তাঁকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, "মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ। আপনি কি বলেন?" সব শুনে শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলে একযোগে প্রশ্ন শুরু করলেন, 'আপনি কি বলেন?' এবার শ্রীম হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'আর অস্বীকার করবার জো কি?'

রাজা মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) প্রতিদিন সকালে 'লক্ষ্মীনিবাসে' গিয়ে গোলাপ-মা'র কাছে সারদাদেবীর সংবাদ নেন—তারপর নিচের তলায় বসে সকলের সঙ্গে কিছু রহস্যালাপ করেন। একদিন এইরকম রঙ্গব্যঙ্গে মত্ত ব্রহ্মানন্দজীকে সারদাদেবী গোলাপ-মা মারফৎ প্রশ্ন করে পাঠালেন "আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?"

উত্তরে ব্রহ্মানন্দজী বললেন, "মার কাছে যে জ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই। তারপরই শুরু করলেন বাউলের সুরে গান ঃ

শঙ্করী চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে
মগ্ন হয়ে রও রে সব যন্ত্রণা এড়াও রে।।
এ তিন সংসার মিছে, মিছে ভ্রমিয়া বেড়াও রে
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে।।
কমলাকান্তের বাণী, শ্যামামায়ের গুণ গাও রে
এতো সুখের নদী, নিরবধি, ধীরে ধীরে বও রে।।

গান গাইতে গাইতে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় রাজা মহারাজ নৃত্য শুরু করলেন এবং শেষ হওয়া মাত্র 'হো হো হো' বলে সবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীমা নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। চারদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একটি করুণ কণ্ঠের গান তাঁর কানে এলো। গানটির বেদনা ও আর্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন সারদাদেবীকে সচেতন করে তুলল। সবলাবালাকে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে গানটি শুনলেন ঃ

মা আমার কোথায় গেলে
অনেকদিন দেখি নাই মা, নে আমারে কোলে।

তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে তনয়া বলে।।

গানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চোখে অশ্রুপ্রবাহ। গান থামিয়ে মেয়েটি মাকে প্রণাম করে বলল, মা আমার অনেক দিনের সাধ আজ পূর্ণ হল। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে বলতে পারছি না। আশীর্বাদ করে তার পরিচয় জানতে চাইলেন সারদাদেবী। মেয়েটি ভিখারিনী—দশাশ্বমেধ ঘাটে বিহারী মন্দিরের কাছে বসে ভিক্ষা করে। শ্রীমায়ের ইচ্ছায় আবার গান ধরল সেঃ

মা আমায় দয়া করে
শিশুর মত ক'রে রাখো।
শৈশবেব আনন্দ ছেড়ে
বড় হতে দিও নাকো।

"কি চমৎকার গানটি"—সারদাদেবী উচ্ছ্বসিত। প্রসাদ পেয়ে মেয়েটি সেদিনের মত বিদায় নিল।

আবার একদিন মেয়েটি এলো—একটি পেয়ারা নিয়ে, সেটি সেদিন সে ভিক্ষায় পেয়েছে, শ্রীমাকে নিবেদন কবা তার উদ্দেশ্য। সাগ্রহে পেয়ারাটি গ্রহণ করলেন শ্রীমা, বললেন, "ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি তো; আমি খাব এখন।" তারপর চাইলেন আবার গান শুনতে—"তোমার গান বড় মিষ্টি। তুমি একটি গান গাও।"

মেয়েটি গান ধরলঃ

"গোপাল সাজিয়ে দিই বাপ তোরে।
একবার তেমনি তেমনি তেমনি করে
নাচরে ঘুরে ফিরে।।

গান শুনে সারদাদেবীর ক্লান্তি নেই—"গানটি বেশ, আর একটি বল না।" উপযুক্ত এবং মর্মগ্রাহী শ্রোতা পেয়ে ভিখারিনীও আগ্রহের সঙ্গেই আবার গান শোনাল।

এই কাশীতেই একদিন এলো গেরুয়াপরা একটি বিধবা মেয়ে—সারদাদেবীকে গান শুনিয়ে গেলঃ

থাকরে জবা বনের শোভা
বনের ফুল তুই বনে ফুটি,
তোরে হেরলে, শিবের বক্ষে
মনে হয় মার চরণ দুটি।

সেই সময় কাশীতে ছিলেন বিখ্যাত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তী। বেশ কয়েকদিন ধরে মাতৃসমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে গান শুনিয়ে যেতেন।

একদিন একটি কৌতুকজনক ঘটনা ঘটল। শ্রীমা বারান্দায় বসে আছেন—তার সঙ্গে আছেন গোলাপ-মা এবং আরও কয়েকজন মহিলা ভক্ত। তিন-চারজন মহিলা দর্শনার্থী উপস্থিত হলেন কিন্তু কে মা সেটাই তাঁরা স্থির করতে পারছেন না। তাঁদের মধ্যে একজন গোলাপ-মাকে বেশ ভব্য দেখে তাঁর দিকেই এগিয়ে গেলেন প্রণাম করতে। গোলাপ-মাকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গেই কথা বলতে উদ্যত হলে গোলাপ-মা বুঝতে পারলেন তাঁরা তাঁকেই মা মনে করে ভুল করেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি শ্রীমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'ঐ, উনিই মা-ঠাকরুণ।' মা'ব নিতান্ত সাদাসিধা পোশাক তাই তাঁরা ভাবলেন স্বয়ং শ্রীমাই বোধহয় রহস্য করে অন্যের কাছে পাঠাতে চাইছেন। তাঁরা গোলাপ-মা'র দিকেই সকলে এগিয়ে গেল কিন্তু গোলাপ-মা কথাটার পুনরুক্তি করায় তাঁরা এবাব অগ্রসব হলেন মায়ের দিকে। ইতিমধ্যে রঙ্গপ্রিয়া সারদাদেবী কৌতুকের গন্ধ পেয়ে গোলাপ-মাকে দেখিয়ে বললেন, 'না, না, উনিই মা-ঠাকরুণ।' তাঁরা আবার গোলাপ-মা'র দিকে অগ্রসর হতেই ঝেঁঝে উঠলেন তিনি—"তোমার কি বাছা, বুদ্ধি বিবেচনা নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ কি দেবতার মুখ—মানুষের চেহারা কি অমন হয়!' এবার সকল সন্দেহের অবসান হল। সকলের কৌতুক হাস্যের মধ্যে দিয়ে তাঁরা যথাস্থানে পৌঁছলেন।

মাতৃসদনে 'কাশীখণ্ড' পাঠ হত। ১১/১২/১২ সন্ধ্যায় পাঠের পর স্বামী অপূর্বানন্দ শ্রীমাকে প্রশ্ন করলেন, "কাশীতে মলে কি সবারই মুক্তি হয়?"

শ্রীমা উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রে বলে—হয়।"

পরদিন সকালেও তাঁর সেই এক প্রশ্ন, "বল কাশীতে মলে মুক্তি হয় কি না?"

শ্রীমা বললেন, "শাস্ত্রাদিতে আছে—এত লোক আসছে—মুক্তি হয়। তাঁর শরণাগত যে তার মুক্তি হবে না তো হবে কি?"

অরূপানন্দ—"শরণাগত যে তার তো মুক্তি হবেই। যে শরণাগত নয়, ভক্ত নয়, বিধর্মী—এদের মুক্তি হবে কি না?"

শ্রীমা—"তাদেরও হবে। কাশী চৈতন্যময় স্থান। এখানে সব জীব চৈতন্যময়—পোকাটা মাকড়টা পর্যন্ত। ভক্তাভক্ত যে এখানে মরবে—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত—তারই মুক্তি হবে।"

অরূপানন্দ—"সত্য বলছ?"

শ্রীমা—"হাঁ, সত্য বই কি! নইলে আর স্থান মাহাত্ম্য কি?"

প্রসঙ্গান্তরে অরূপানন্দ বলেন, "মা আমি এ সব যা জিজ্ঞাসা করি, ও অমনি বলি, আমি ও-সবের জন্য অত ভাবি না। আমার মনের ভাব অন্যরকম। আমি নিজে জানতে চাই, তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কি না!"

শ্রীমা—"আপনার মা নয়ত কি? আপনারই মা।"

অরূপানন্দ—"তুমি তো বললে, আমি যে ভাল বুঝতে পারছি না। গর্ভধারিণী মাকে যেমন আপনা হতেই মা বলে জানি, এমন তোমাকে মনে হয় কই?"

শ্রীমা—"আহা, তাই তো।" পরক্ষণেই বললেন, "তিনিই মা-বাপ বাছা, তিনিই মা-বাপ হয়েছেন।"

কাশীখণ্ডে আছে, কাশীতে মাছ খাওয়া উচিত নয়। অরূপানন্দ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে একদিন (১৪ বা ১৫ ডিসেম্বর, ১৯১২) বললেন, "তা মাছ খেলে প্রাণীহত্যা হয় তো।"

শ্রীমা বললেন, "ও সব মানুষের খাদ্য, মানুষ খাবে না তো কি করবে?"

অরূপানন্দ—"খাদ্যের নাম করে প্রাণীকে ব্যথা দেবে?"

শ্রীমা—"তা বিচার করে দেখলে ওতেও হিংসা হয় বই কি—প্রাণী তো? কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হল। ঠাকুর আমাকে করতে বললেন। আমি বললুম 'ওগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।' শুনে ঠাকুর বললেন 'সে কি! আমি খাব, আমার জন্যে করবে।' তখন রোখ করে করতে লাগলুম।"

সবসময় মনের এক অবস্থা থাকে না। "তুমি (অপূর্ব নন্দজীকে) সব খাবে। তোমার ও সব বিচার করবার দরকার নেই।"

এর আগে দু'বার সারদাদেবী যদিও কাশী এসেছিলেন কিন্তু তাঁর অবস্থিতিকাল বেশিদিন ছিল না। এবারই তিনি দীর্ঘকাল কাশীতে থেকে সেখানকার যাবতীয় দর্শনীয় স্থান ও বস্তু ঘুরে ঘুরে দেখেন। ২৮ অগ্রহায়ণ (১২ বা ১৩ ডিসেম্বর ১৯১২) শ্রীমা পালকিতে কালভৈরব, বেণীমাধব, ত্রৈলঙ্গস্বামী, নাগপুর ও গোয়ালিয়র রাজার মন্দির, সঙ্কটা, মণিকর্ণিকা প্রভৃতি দর্শন করে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীনিবাসে ফিরে আসেন। অন্য আর একদিন বৈদ্যনাথ ও তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করে বলেছিলেন, "এ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ।" পরে একদিন কেদারনাথ দর্শন করে মন্তব্য করেন, "এই কেদার আর সেই কেদার (হিমালয়স্থ) এক—যোগ আছে। একে দর্শন করলেই তাঁকে দর্শন করা হয়। বড় জাগ্রত।"

একদিন সঙ্গিনী নিয়ে দু'জন সাধুকে দর্শন করতে যান—একজন নানকপন্থী বৃদ্ধ সাধু, অন্যজন চামেলীপুরী। চামেলীপুরীকে গোলাপ-মা প্রশ্ন করেন, "কে খেতে দেয়?" তিনি সহাস্যে উত্তর দেন, "এক দুর্গা মাঈ দেতা। আউর কোন দেতা?" বৃদ্ধ চামেলীপুরীর উত্তরে শ্রীমা অভিভূত। বাসায় ফিরে বলেন, "আহা বুড়োর মুখটি মনে পড়ছে—যেন ছেলেমানুষটির মত।" পরদিন কিছু লেবু, সন্দেশ ও একখানি কম্বল তাঁকে পাঠিয়ে দেন। অন্য সাধুদের দর্শনের প্রস্তাবে বলেন, "আবার কি সাধু দেখব? ঐ তো সাধু দেখেছি—আবার সাধু কোথায়?"

ঐ সময় রাসলীলায় অদ্বৈত-আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অভিনীত হয়। শ্রীমা

তার ভক্ত সঙ্গিনীদের নিয়ে অভিনয় দর্শন করে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। অভিনয়ান্তে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার ভূমিকায় অভিনয়কারী বালকদ্বয়কে টাকা দিয়ে প্রণাম করেন। অদ্বৈত আশ্রমে একদিন ভাগবতপাঠের আসরেও উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া প্রায় রোজই লক্ষ্মীনিবাসে তাঁকে ভাগবত শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।

সারদাদেবী একদিন সারনাথ দর্শনেও গিয়েছিলেন। শ্রীমতী ম্যাকলাউড শ্রীমায়ের কাশীতে অবস্থানের কথা শুনে নিজেও কাশীতে এসে একটি হোটেলে উঠেছিলেন। শ্রীমা সারনাথ যাবেন খবর পেয়ে তিনি হোটেল থেকে একটি ফিটন গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা কবেন কিন্তু গাড়িটি পৌঁছতে অনেক বিলম্ব হয়। তখন সারদাদেবী আর অপেক্ষা না করে অন্য আর একটি ভাড়াগাড়িতে রাধু, ভূদেব প্রভৃতিকে নিয়ে সাবনাথ রওনা হয়ে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাকলাউড প্রেরিত গাড়িটি এসে পৌঁছলে ডাক্তার নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দু'জন সেবককে নিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাড়াতাড়ি সেই গাড়িতে সারনাথ পৌঁছান। ততক্ষণে সারদাদেবী বৌদ্ধ যুগের মূর্তি ও স্মারকচিহ্নগুলি দেখছিলেন। কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটকও একই সময় মূর্তিগুলি দেখে ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। তাদের দেখে শ্রীমা মন্তব্য করেন, "যারা করেছিল তারাই আবার এসেছে আর অবাক হয়ে বলছে 'কি আশ্চর্য সব করে গেছে!'" শ্রীমা নিজেও ভাস্কর্যগুলির অনুপম সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দে অভিভূত।

সারনাথ থেকে ফেরার পথে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ফেরার সময় সকলেই ফিটনে ওঠার জন্য সারদাদেবীকে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তাতে রাজি হলেন না, বললেন, 'না না ও গাড়িতে রাখাল এসেছে—বাখাল ওরাই যাবে। আমার এ গাড়িতে কোন কষ্ট হবে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজা মহারাজের বিশেষ অনুরোধে শ্রীমা ফিটনেই উঠলেন, আর ভাড়াগাড়িতে রাজা মহারাজ প্রমুখ অন্যান্যরা। শ্রীমায়ের গাড়ি আগে আগে চলতে লাগল—পিছনে ভাড়াগাড়িটি। পথে ভাড়াগাড়ির ঘোড়া ক্ষেপে গিয়ে একটি বাঁক ঘোরার সময় খানায় গিয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টার পর সকলকে উদ্ধার করে দেখা গেল, সকলের অল্পবিস্তর আঘাত লাগলেও তেমন গুরুতর কিছু হয়নি—দু'এক জায়গায় সামান্য ছড়ে গেছে মাত্র। খবর শুনে সারদাদেবী আক্ষেপ করে বললেন, 'এ বিপদ আমারই অদিষ্টে ছিল, রাখাল জোর করে তা নিজের ঘাড়ে টেনে নিল। না হলে ছেলেপিলে গাড়িতে—কি যে হত!'

মনঃপূত হয়নি। একজন স্পষ্টই বলে ফেললেন, 'মা আপনি দেখছি (সংসারের) মায়ায় বদ্ধ।' অস্ফুট কণ্ঠে সারদাদেবী উত্তর দিলেন, 'কি করব মা, নিজেই তো মায়া।'

সে বছর মায়ের জন্মতিথি ছিল ৩১ ডিসেম্বর। লক্ষ্মীনিবাস এবং অদ্বৈত আশ্রম উভয়স্থানেই মহাসমারোহে জন্মতিথি পালিত হল। 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ সকালের দিকে তাঁর পূজার পর নতুন শাড়ী পরে সাধু, ভক্ত ও অন্যান্য মহিলাদের প্রণাম ও পূজা গ্রহণ করেন। ওদিকে অদ্বৈত আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী ও ডাক্তার নৃপেন্দ্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও ভোগরাগের আয়োজন—অদ্বৈত আশ্রম ও সেবাশ্রমের সাধু-ভক্ত-কর্মী মিলিয়ে দুশোজন প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীমায়ের জয়ধ্বনিতে সেদিন আশ্রমপ্রাঙ্গণ মুখরিত।

ঐদিন বিকালে পূর্ব্বব্যবস্থামত সাধুদের অনুরোধে সারদাদেবী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং মণ্ডপে বসে সকল সাধুকে একখানি করে সূতিবস্ত্র দেন। কেবল স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেন তসরের কাপড় ও চাদর। শান্তানন্দজী হাসতে হাসতে বলেন, "মা, আমাদের সকলকে সূতির কাপড় দিলেন আর মহারাজকে যে তসরের জোড় দিলেন।" শ্রীমা-ও সহাস্যে উত্তর দেন, "রাখাল যে আমাব ছেলে।"

সেবার (জানুয়ারি, ১৯১৩) স্বামী শান্তানন্দ একদিন শ্রীমাকে প্রশ্ন করেন "কিরূপ ভাবে,কিরূপ স্থানে গিয়ে সাধনভজন করতে হবে?"

উত্তরে সারদাদেবী বলেন, "কাশী তোমাদের স্থান। সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে।"

শান্তানন্দ বললেন, "অনুরাগ না থাকলে শুধু নামজপ করলেই কি হবে?"

শ্রীমার উত্তর "জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।"

কলকাতা ফেরার দু'তিন দিন আগে শ্রীমা শেষবারের মত অদ্বৈত আশ্রমে আসেন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী শান্তানন্দ। আশ্রমে পৌঁছেই তিনি সোজা ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁর বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে ছিল একখানি নিজের ফটো। ঠাকুরকে প্রণাম করে শ্রীমা নিজের ছবিখানি বার করে একটি কুলুঙ্গিতে স্থাপন করেন এবং অঞ্চলের গ্রন্থি থেকে কয়েকটি ফুল ছবিটির পাদদেশে রাখেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে চন্দ্র মহারাজকে বলেন, "বাবা চন্দ্র. এ ছবিটিতেও রোজ দুটি দুটি ফুল দিও।" চন্দ্র মহারাজ মাকে প্রণাম করে তাঁর আদেশ

শিরোধার্য করে নেন এবং তখন থেকে অদ্বৈত আশ্রমে মায়ের নিত্যপূজা শুরু হয়।

শ্রীমা চলে যাবার পর চন্দ্র মহারাজ ঘরে ঢুকে দেখলেন কুলুঙ্গিতে শ্রীমা নিজের ছবি রেখেছেন। তখন তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে সকল কথা জানিয়ে বলেন, "তারকদা লক্ষণ বড় সুবিধার নয়। মনে হচ্ছে, মা সরে পড়বার আয়োজন করছেন।" হরি মহারাজও সেবার সেবাশ্রমে ছিলেন, শিবানন্দজী তাঁকেও সব কথা জানান।

॥ ১৮ ॥

১৬ জানুয়ারি (১৯১৩) সারদাদেবী কলকাতায় ফিরে এলেন শেষবারের মত তীর্থ দর্শন করে। বাগবাজারে নিজের বাড়িতে একমাসের কিছু বেশি সময় অবস্থান করে ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে সারদাদেবী যখন বিষ্ণুপুরের পথে জয়রামবাটী যেতেন তখন প্রতিবারই বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বর সেনের বাড়ি দু'এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন, কখনো কখনো ২/১ দিন থেকেও যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একসময় সারদাদেবীকে বলেছিলেন, "বিষ্ণুপুর গুপ্ত-বৃন্দাবন।" একসময় বিষ্ণুপুর ছিল নিতান্ত অখ্যাত জায়গা কিন্তু অতীতের বৈষ্ণবরাজাদের বহু গৌরবময় কীর্তি বক্ষে ধারণ করে রেখেছিল। কালক্রমে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হলে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বাইরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—পুরাতন টেরাকোটার ভাস্কর্যগুলি তখন পর্যটকদের কাছে দর্শনীয় বস্তু হিসাবে গৃহীত হয়। বিষ্ণুপুর তার লুপ্ত মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শ্রীমা একবার যাত্রাপথে একদিন বিষ্ণুপুরের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে বিশ্রাম করেন—সেই সময় তিনি মন্তব্য করেন, "ঠাকুরের কথাই দেখছি সত্য হল।" এবার মায়ের আগমন সংবাদ পূর্বেই কোয়ালপাড়ায় পৌঁছেছিল। সকলেই অধীর আগ্রহে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন—কেউ কেউ বিষ্ণুপুরের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর প্রতীক্ষায় ছিলেন। শ্রীমায়ের গাড়ি তাঁদের দৃষ্টিপথে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে শ্রীমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। একজন ছুটে গেলেন আশ্রমে মায়ের আগমন সংবাদ দিতে—অন্য একজন গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে সরিয়ে নিজেই গাড়ি হাঁকাতে শুরু করলেন। সারদাদেবী আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "বাঃ তুমি তো বেশ গাড়ি হাঁকাতে জানো দেখছি। তা সব কাজই শিখে রাখা ভাল।" গাড়ি আশ্রমে পৌঁছলে কেদারবাবুর মা শ্রীমায়ের হাত ধরে গাড়ি থেকে নামালেন। সকলে প্রণাম করে চলে যাবার পর সারদাদেবী বাঁড়ুজ্জে পুকুরে স্নান সেরে এসে পূর্বোক্ত ছেলেটিকে বললেন, ফুল তুলে আনতে। ফুল-তোলা চন্দন-ঘষার কাজ যখন চলছিল তখন কেদারবাবু শ্রীমায়ের পাশে বসে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "মা আপনার সব ছেলেই বিদ্বান—আমরা এই কয়টি আপনার একেবারে মূর্খ সন্তান।" সস্নেহে শ্রীমা বললেন, "সে কি গো! ঠাকুর যে লেখাপড়া তেমন কিছু জানতেন না। ভগবানে

মতি হওয়াই আসল। তা তোমার দ্বারা এদেশে অনেক কাজ হবে। এই সব ছেলেরা কত কাজ করছে। ভাবনা কি? ঠাকুর এবার এসেছেন, ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। তোমাদের ভালবাসি—তোমরা আমার আপনার লোক।"

পূজা, প্রসাদ গ্রহণ ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সেইদিনই শ্রীমা জয়রামবাটী চলে যান।

১৪ মার্চ (১৯১৩) শ্যামবাজারে ললিতবাবু (ডাক্তার) ও প্রবোধবাবু জয়রামবাটী গিয়েছিলেন মাতৃদর্শনে। তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে মা খাদ্যাখাদ্য বিচার করে অভিমত দেন, "আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নেই, ভক্তির বড় হানি হয়। বরং অন্যশ্রাদ্ধের অন্ন খাবে, তবু আদ্যশ্রাদ্ধের নয়, ঠাকুর নিষেধ করতেন। আর যা কিছু খাবে ভগবানকে দিয়ে খাবে। অপ্রসাদী অন্ন খেতে নেই। যেমন অন্ন খাবে তেমন রক্ত হবে। শুদ্ধ অন্ন খেলে শুদ্ধ রক্ত হয়, শুদ্ধ মন হয়, বল হয়। শুদ্ধ মনে শ্রদ্ধা ভক্তি হয়, প্রেম হয়।"

ললিতবাবু জানতে চান, "মা, আমরা তো গৃহী, আত্মীয়স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করব?" শ্রীমা উত্তরে বলেন, "শ্রাদ্ধে গিয়ে কাজকর্ম দেখবে, খাটবে, যেন তারা কিছু মনে না করতে পারে। কিন্তু সেদিনটা কোনরকমে খাওয়াটা এড়াতে চেষ্টা করবে। নেহাৎ না পারলে শ্রাদ্ধে বিষ্ণু বা দেবতাদিগকে যা নিবেদন করা হয় তাই গ্রহণ করবে। প্রসাদী হলে আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন ভক্তেরা খেতে পারে।" ললিতবাবু বলেন, "অনেক সময় শ্রাদ্ধের জন্যে আনা জিনিসপত্র বাড়তি থাকে—তা খাওয়া চলে?"

শ্রীমা—"তা চলতে পারে, তাতে দোষ নেই। গৃহী আর কি করবে।"

প্রবোধবাবু উত্থাপন করলেন ত্যাগ-প্রসঙ্গঃ "মা তিনি যে ত্যাগ ভালবাসতেন—আমাদের ত্যাগ কোথায়?"

শ্রীমা—"হবে ক্রমে ক্রমে। এজন্মে খানিকটা হল। পরজন্মে আবার হবে। খোলটাই তো বদলায়, আত্মা তো একই থাকে।... তিনি বলতেন, "আমি ইচ্ছা করলে কামারপুকুরটাকে সোনার করে দিতে পারি, সেজবাবুকে [মথুরবাবু] বলে। কিন্তু ওতে কি হবে? ওগুলো তো অনিত্য।"...

সন্ধ্যায় কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের কথা উঠল। অপূর্বানন্দ প্রশ্ন করলেন "কেউ কেউ স্বামীজীকে বলেছিল 'শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার কি?'... স্বামীজী কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন, 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়, সুতরাং উপবীতে অধিকার আছে।'"

অন্য কিছু কথার পর শ্রীমা বললেন, "আর কিছু বুঝি না, সপ্তর্ষির মধ্য থেকে একটি ঋষি এসেছিলেন এইটি জানি। আর ঠাকুরের ভক্তেরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী। জ্ঞানীর সন্ন্যাস হতে পারে। এই যে গৌরদাসী, মেয়েদের তো সন্ন্যাস নেই। গৌরদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মত ক'টা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ি

ঘোড়া সব করে ফেলল। ঠাকুর বলতেন 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়।'—সে তো পুরুষ।

৩০ মার্চ দুপুরে সবাই খেতে বসেছে। সুরবালাদেবী একটি ছেলেকে পাতা ও গ্লাস দিয়েছেন—কিন্তু জল দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি বেড়াল এসে সেই গ্লাসের জলে মুখ দিল। সুতরাং আবার জল পালটে দিতে হল। দ্বিতীয়বারও সেই একই কাণ্ড—সেবারও সুরবালা জল পালটে দিলেন মুখ বুজে কিন্তু তৃতীয়বার এই ঘটনা ঘটতে তিনি আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না—বিড়ালটিকে তাড়া করে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'পোড়ারমুখো বেড়ালকে মেরে ফেলব।' শ্রীমা তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "না না, পিপাসার সময় বাধা দিতে নেই। আর ও জলে তো মুখ দিয়ে ফেলেছে।"

সুরবালা ঝেঁঝে উঠলেন, "তোমায় আর বেড়ালকে অতো দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকেই বড় দয়া করছেন! মানুষকে দয়া কর না।"

শ্রীমা শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "আমার দয়া যার ওপর নেই, সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার ওপর নেই, তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।"

৭ মে (১৯১৩) কালীকুমারের পুত্রের বিবাহ। ভূদেবের বয়স তখন তেরো বছর আর পাত্রীটি নিতান্তই বালিকা। শ্রীমা নিজে বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নন। ভ্রাতা কালীকুমার তাঁর দুটি ছেলেরই বিবাহ দিয়েছিলেন বাল্যাবস্থায়। কনিষ্ঠপুত্র রাধারমণের যখন বিবাহ হয় তখন তার বয়স এগারো। সারদাদেবী তখন বাগবাজারে নিজ বাটীতে। ভ্রাতাদের অভিপ্রায় তাঁর কাছে অস্পষ্ট ছিল না, সে সময় তিনি বলেছিলেন, "ছোট ছোট ছেলেদের বিয়ে দিচ্ছে আর আমার কাছে আদায় করে নিচ্ছে। আখেরে যে কষ্ট পাবে তা জানে না।"

বাঙালী সমাজে, বিশেষ করে গ্রামবাংলায় বাল্যবিবাহ প্রথা সমাজের যে কতখানি ক্ষতি করছে সে বিষয়ে সারদাদেবী অবহিত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে এ নিয়ে তাঁকে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা যায়। মাদ্রাজের বিশ-বাইশ বছরের দুটি কুমারী মেয়ে নিবেদিতা স্কুলে ছিল। তাঁদের কথা উল্লেখ করে সারদাদেবী বলতেন, "আহা! তারা কেমন সব কাজকর্ম শিখেছে। আর আমাদের? এখানে (জয়রামবাটীতে) পোড়া দেশের লোক আট বছর হতে না হতেই বলে, পর গোত্র করে দাও, পর গোত্র করে দাও।"

সম্ভবত জুন-জুলাই মাসে সারদাদেবী আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তখন আনুড়ের ডাকঘর থেকে জয়রামবাটীতে চিঠি বিলি হত সপ্তাহে দু' দিন। তার ওপর সেবার আমোদরের বন্যায় ডাক যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘকাল শ্রীমার সংবাদ না পেয়ে সারদানন্দজী বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে মায়ের সংবাদ জানার জন্য কলকাতা থেকে লোক পাঠালেন। তিনি এসে মায়ের

আমাশয় রোগের কথা জানতে পেরে কোতুলপুর ডাকঘর থেকে চিঠি পাঠালেন কলকাতায়। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার জন্য ডাঃ কাঞ্জিলাল এবং সেবা-শুশ্রূষার জন্য নিবেদিতা স্কুল থেকে সুধীরাদেবী জয়রামবাটী গিয়ে পৌঁছলেন। দু'একদিন পরে যোগীন-মার ভগিনী কালীদাসী এবং মাস্টারমহাশয়ের স্ত্রীও গিয়ে পৌঁছলেন। সকলের সেবাযত্নে শ্রীমা সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্যদিকে। জয়রামবাটী তখন নগণ্য ক্ষুদ্র গ্রাম—তদুপরি বন্যার জন্য শাকসব্জী দুষ্প্রাপ্য। এতগুলি লোকের আহারাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রীতিমত কঠিন হয়ে দাঁড়াল। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটও অগম্য। অগত্যা সারদাদেবী সংবাদ পাঠালেন কোয়ালপাড়ায়—একমাত্র তাঁরাই ভরসা। তাঁরা দুবেলা শাকসব্জী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করে নিজেরাও থেকে গেলেন জয়রামবাটীতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য। শ্রীমাকে খানিকটা সুস্থ দেখে ডাঃ কাঞ্জিলাল ফিরে গেলেন কলকাতায়।

ওদিকে আবার নতুন সমস্যা। অতিরিক্ত পরিশ্রম ও বৃষ্টিতে ভেজার দরুন কোয়ালপাড়ার সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আট দশ দিন তাঁদের কোন সংবাদ নেই—শাকসব্জীর সববরাহও বন্ধ। শ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষের কৃপণতার কথা জানতেন। কয়েকদিন অপেক্ষা করে একজন স্ত্রীলোককে পাঠালেন কোয়ালপাড়ায়—সংবাদ পেলেন তাঁর আশঙ্কাই সত্য। তখন আবার সেই স্ত্রীলোকটির মারফৎ রাধুকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে পাঠালেন। "শ্রীমান কেদার, ও আশ্রমে আমিই ঠাকুরকে বসিয়েছি। তিনি সিদ্ধচালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অতএব আমি বলছি, ঠাকুরকে সিদ্ধচালের ভোগ ও অন্তত শনি-মঙ্গলবারে মাছ ভোগ দেবে। আব যেমন করে হোক তিন তরকারির কম ভোগ দিতে পারবে না। অতো কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুজবে কেমন করে?"

কয়েকদিন পরে কেদারবাবু গেছেন মাতৃসকাশে। সেদিন শ্রীমা তাঁর কাছে রাধুর জন্মবৃত্তান্ত ও তার প্রতি তাঁর অহেতুক আকর্ষণের কারণ বর্ণনা করে বলেছিলেন, "ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে আর প্রার্থনা করছি, 'আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে!' সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লাল কাপড় পরা দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।' পরক্ষণেই তিনি অন্তর্ধান হলেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাইনি। তারপর একদিন ঠিক এই জায়গাটিতে বসে আছি, ছোট বৌ (রাধুর মা) তখন বদ্ধ পাগল, কতকগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে ঐদিকে যাচ্ছে, আর রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে

পেছনে যাচ্ছে। তাই দেখে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলাম। মনে হল, তাই তো একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে? বাবা নেই, মা ঐ পাগল। এই মনে করে যাই ওকে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'এই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।' কি জানি বাবা, আগে আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানা রোগ, আবার বিয়েও হল। এখন ভয় হয় পাগলের মেয়ে শেষে পাগল না হয়! শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলাম!"

॥ ১৯ ॥

১৯ সেপ্টেম্বর (১৯১৩) সারদাদেবী কলকাতায় এলেন।

এই সময় দলে দলে দর্শনার্থী ও দীক্ষার্থী তাঁর কাছে আসত। সারাদিনই তাঁর কেটে যেত তাদের প্রতি কৃপাবিতরণে। অনেকে উপস্থিত হত তাদের নানাবিধ সাংসারিক সমস্যা নিয়ে। শ্রীমা অসীম ধৈর্য নিয়ে তাদের কথা শুনতেন—প্রয়োজনমত পরামর্শ দিতেন। তাঁর কলকাতা আবাসের সামনেই ছিল একটি শ্রমিক বস্তি। একবার একটি স্ত্রীলোক এসেছে একটি রুগ্ন শিশুকে কোলে নিয়ে। শিশুটির জন্যই তাঁর আগমন—যাতে সে সুস্থ হযে ওঠে তাব জন্য মায়ের আশীর্বাদ-ভিক্ষা। শ্রীমা আশীর্বাদ জানিযে বললেন, 'ভাল হবে'—দুটি বেদানা, কিছু আঙুর, ঠাকুরকে নিবেদন করে মেয়েটিকে বললেন, "তোমার ছেলেকে খেতে দিও।"

আর একদিন দুটি বিবাহিতা নিঃসন্তান মহিলা এলেন। সলজ্জভাবে তাঁরা সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। শ্রীমা তাঁদেব প্রার্থনায় সাড়া দিযে বললেন, "ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিযে প্রার্থনা করবে। ...প্রাণের বেদনা কেঁদে কেঁদে জানাবে—দেখবে, তিনি একেবাবে ছেলে কোলে বসিযে দেবেন।" পবে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা সত্যই পূর্ণ হয়েছিল।

একদিন এলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী বিদেশী মহিলা। শ্রীমাকে প্রণাম কবে নিজের কন্যার কঠিন অসুখের কথা জানালেন। শ্রীমা কিছু ফুল ও বিল্বপত্র নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। পরে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিযে ওই ফুল বিল্বপত্র মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, "এগুলি তোমার মেযেব মাথায় বুলিয়ে দেবে।" পরে আবার সেই মহিলা এসে শ্রীমাকে প্রণাম কবে জানিযে যান, তাঁর মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে।

নানা মানুষ—বিচিত্র তাদেব পার্থিব প্রার্থনা। দর্শনার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে আর সেই সঙ্গে বাড়ছে শ্রীমায়ের যন্ত্রণা। কোন কোন দিন এমন অবস্থা হয় যে সকলে চলে যাবার পব হাঁটু পর্যন্ত গঙ্গাজলে ধুতে হয়। বলেন, "আর কাউকে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে দিও না— যত পাপ এসে ঢোকে। আমার পা জ্বলে যায়। পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এই জন্যই তো ব্যাধি ; দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।" কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি করুণাময়ী "এসব কথা শরৎকে বলো না। তাহলে প্রণাম বন্ধ করে দেবে।"

এইভাবেই চলে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। বহু মানুষের প্রার্থনা শুনতে ও পূরণ করতে করতে কখনো কখনো অস্থির হয়ে ওঠেন। রাত গড়িয়ে চলে—তবু বিশ্রাম নেই। শেষ প্রার্থীটি চলে যাবার পর কোন কোন দিন সেবিকাকে বলেন "গড় করি মা কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে ও দুঃখ। আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে এসেছে—মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু। সংযম নেই, কিছু নেই।" সেবিকাকে বলেন বাতাস করতে। পরদিনই আবার 'অন্ধকারে কিলবিল করা' কলকাতায় মানুষ 'পিঁপড়ের সার' দেয় আর শ্রীমাও সব ভুলে করুণার ভাণ্ডার উজাড় করে দেন।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমায়ের সেবিকা সরলাদেবীর (পরে ইনি সারদা মঠের প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা) লেডি ডাফরীন হাসপাতালে ট্রেনি নার্স-হিসাবে যোগদানের ব্যবস্থা হল। সেই সময় বাংলার গভর্নর ছিলেন লর্ড কারমাইকেল। তাঁর স্ত্রী লেডি ডাফরীন হাসপাতালের জন্য তিনটি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে চাইছিলেন, যারা নার্সিং শিখবে। লেডি কারমাইকেলের সঙ্গে ভগিনী ক্রিস্টিনের সৌহার্দ্য ছিল। ক্রিস্টিনই তিনটি মেয়েকে ঠিক করেন, যাদের মধ্যে একজন সরলাদেবী। অন্য মেয়ে দুটির মধ্যে একটি ডাক্তারী পরীক্ষায় অমনোনীত হয়—অপরটি প্রথমে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। তখনও পর্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নার্সিং-এর কাজ (শুধু নার্সিং কেন, স্ত্রী-শিক্ষাও সীমাবদ্ধ ছিল বাল্যাবস্থার মধ্যে) সম্মানজনক তো নয়ই পরন্তু ঘৃণিতই ছিল। সুধীরাদেবী সরলাকে নিয়ে এলেন মায়ের কাছে তাঁর অনুমতির জন্য। আঁৎকে উঠলেন গোলাপ-মা, "সুধীরার এ কি কাণ্ড! ব্রাহ্মণের মেয়েকে হাসপাতালে কাজ করতে দিচ্ছে! সে আবার কি গো! যত সব অনাছিষ্টি—ওর হাতে আর কে খাবে?" শ্রীমা শান্ত কণ্ঠে বললেন, "সে কি গোলাপ? শিখে এসে ও তো আমাদেরই সেবা কববে।" (শ্রীমায়ের শেষ শয্যায় সরলাদেবীই ছিলেন প্রধানা সেবিকা এবং গোলাপ-মা'র আশঙ্কাকে ব্যর্থ করে শ্রীমা তার হাত থেকেই ওষুধ পথ্য তো বটেই, ভাতও খেতেন।) ১৯১৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ডাফরীন স্কুলে সরলাদেবী মিডওয়াইফারী—নার্সিং শেখার জন্য ভর্তি হয়ে শ্রীমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। শ্রীমা বললেন, "আমি একটা কিছু দেব—কি দিই!" তিনি একটা ভাল গরম কম্বল কিনে দিলেন—সরলাদেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "তুমি ওখানে হিন্দুর মেয়ের মত থাকবে।"

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সারদাদেবী কয়েকজন ভক্ত মহিলাসহ সরযূদেবীর বালিগঞ্জের বাসভবনে যান। সারাদিন বেশ আনন্দেই কাটে, গোল বাধল রাত্রে ফেরার সময়। রাত হয়ে গেছে—বালিগঞ্জ থেকে বাগবাজার দীর্ঘ পথ—সুতরাং তাঁর ফেরার জন্য ভক্তেরা মোটরের ব্যবস্থা

করেছেন কিন্তু সারদাদেবী কিছুতেই মোটরে চড়বেন না, কারণ একবার তিনি মোটরে মাহেশে রথ দেখতে গিয়েছিলেন, সেই গাড়ি একটি কুকুরকে চাপা দেয়—সুতরাং মোটরে তাঁর প্রবল আপত্তি। ভক্তেরা অনেক বোঝালেন—রাত হয়েছে, এখন ঘোড়ার গাড়িতে যেতে গেলে পৌঁছতে মধ্যরাত হয়ে যাবে। খুব সাবধানে চলবে, যাতে আর কোন কুকুর না চাপা পড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি আশ্বস্ত হয়ে মোটরেই ফিরে আসেন।

কয়েকদিন পরে সরযূদেবী যখন উদ্বোধনে যান তখন শ্রীমা তাকে ঈশ্বর লীলা-তত্ত্ব বুঝিয়ে বলেনঃ "বিধাতা যখন প্রথম মানুষ তৈরী করলেন তখন একেবারে সত্ত্ব গুণী করেই করলেন। সুতরাং তখনই তারা ভগবানের নাম নিয়ে তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়ল এবং তাঁর মুক্তি পদে লীন হয়ে গেল। বিধাতা দেখলেন, তবে তো হল না। এদের দিয়ে সংসারে লীলা খেলা কিছু করা চলল না। তখন সত্ত্বের সঙ্গে রজঃ ও তমঃ অধিক পরিমাণে মিশিয়ে মানুষ তৈরী করলেন এবার লীলা খেলা চলল ভাল।"

এ কাহিনী তিনি শুনেছিলেন যাত্রা বা কথকতার আসরে। বললেন, "তখন, মা, যাত্রা কথকতা—এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর তেমনটি শোনা যায় না।"

এই সময় সারদাদেবী কোয়ালপাড়ায় কেদারবাবুকে একটি চিঠিতে লেখেন, "তোমরা যদি কোয়ালপাড়ায় আমার জন্য একখানা ঘর করে রাখতে পার তাহলে দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে থাকি। জয়রামবাটীতে ভাইয়ের সংসারে ঝামেলা দিন দিন বাড়ছে, আর ও সবের জ্বালা সব সময় সহ্য করতে পারি না। সামান্য একটু অসুখ-বিসুখ হলেও দেশে গিয়ে ঠাঁইনাড়া হবার উপায় নাই।"

পত্রপ্রাপ্তির পর কোয়ালপাড়া আশ্রমের কর্মীরা প্রবল উৎসাহে নিজেরা পরিশ্রম করে কেদারবাবুরই পুরানো ভিটায় শ্রীমায়ের বাসোপযোগী একটি ছোটখাট বাড়ি নির্মাণ করতে শুরু করেন এবং তিনখানি ঘর, একটি রান্নাঘর ও একটি পায়খানা সমেত আবাসটির কাজ সম্পন্ন করেন। পরে এই বাড়িটির নাম দেওয়া হয় 'জগদম্বা আশ্রম'। সম্ভবত ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের শেষে অথবা ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের প্রারম্ভে বাড়িটির নির্মাণকার্য শেষ হয়।

দীর্ঘকাল কলকাতায় কাটিয়ে সারদাদেবী ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯ এপ্রিল জয়রামবাটী যাত্রা করেন এবং পরদিন গিয়ে পৌঁছান কোয়ালপাড়ায়। নতুন বাড়ি (জগদম্বা আশ্রম) দেখে শ্রীমা বিশেষ আনন্দিত তবে সেসময় সেখানে তাঁর থাকা সম্ভব ছিল না। সারদাদেবী বললেন,—"এবার আর থাকা হবে না, সঙ্গে সব অনেকগুলি (রাধু, মাকু, তাদের স্বামীরা এবং আরও অনেকে) আছে। এদের সব

জয়রামবাটীতে রেখে পরে নিরিবিলি হয়ে রাধুকে নিয়ে এসে দিনকতক থাকব। তিন মাস জয়রামবাটীতে অবস্থানের পর সম্ভবত জুলাই-আগস্ট মাসে তাঁর কোয়ালপাড়ায় আসার দিন স্থির হয় কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে দারুণ দুর্যোগ। সেই প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই কোয়ালপাড়ার কর্মীরা পালকি নিয়ে জয়রামবাটী গিয়ে হাজির। তাদের দেখে কালীকুমার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "তোমরা যেমন বাঁদর, দিদির ভক্ত হয়েছ!... যোগেন মহারাজ দিদির কি সেবাটাই করেছেন। শরৎ মহারাজ কি সাবধানেই সব কাজ করেন—কী তাঁদের ভক্তি। আর তোমরা এই বাদলায় কি করে দিদিকে নিতে এলে?" সন্ত্রস্ত কর্মীরা বলল, "আমাদের কি সাধ্য আছে যে মাকে নিয়ে যাই বা তাঁর সেবা করি! আজ পালকি নিয়ে আসার কথা ছিল, তাই এসেছি।" শ্রীমা হাসতে হাসতে বললেন, "তোমরা কথা রাখতে পার আর আমি বুঝি পারি না? আমাকে এখনি নিয়ে চল। রাধু ওরা সব পরে যাবে।" মায়ের কথা শুনে কোয়ালপাড়ার কর্মীরা হার মেনে বলল, "তা কি হয়? এই বাদলে কেউ বাড়ির বার হতে পারছে না, আর আমরা আপনাকে ভিজিয়ে নিয়ে গিয়ে কি অসুখ করাব?"

অগত্যা যাওয়া স্থগিত হল। একমাস পরে আগস্টের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে শ্রীমা কোয়ালপাড়ার নতুন বাড়িতে এলেন—সঙ্গে রাধু, সুরবালাদেবী, নলিনী প্রমুখ আরও কয়েকজন কিন্তু ১৫ দিনের বেশি থাকা সম্ভব হল না কারণ তিনি ভাদ্র মাসে এসেছিলেন সুতরাং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ফিরে যেতে হল জয়রামবাটীতে।

সেবার জগদ্ধাত্রীপূজায় যাঁর ভাঁড়ারী হবার কথা ছিল তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অগত্যা কোয়ালপাড়ার একটি অব্রাহ্মণ ছেলের উপর এই দায়িত্ব দিতে হল। সঙ্কুচিত শ্রীমা তাকে বিশেষ করে সাবধান করে দিলেন, "একটু আলগোছে থেকে কাজগুলি করবে, তাহলেই হবে।" এই সতর্কতার কারণ জয়রামবাটীর তৎকালীন অতি রক্ষণশীল সামাজিক মানসিকতা। সেখানে সহায়তার লোক নেই কিন্তু নাক কাটার গোঁসাইরা সদা প্রস্তুত। পূর্বেকার একটি ঘটনার কথা শ্রীমা বিশেষ করে মনে রেখেছিলেন। সেবার এই জগদ্ধাত্রীপূজাতেই সারদাদেবীর ভ্রাতা বরদাপ্রসাদ পরিবেশন করছিলেন—একজন সন্ন্যাসী ভক্ত (সম্ভবত অব্রাহ্মণ) সেই সময় তাঁর কপালে ফোঁটা দেন। আর যায় কোথায়! স্থানীয় জমিদারেরা দারুণ শোরগোল তুললেন। তাঁদের মতে এটা ঘোর অনাচার—এর প্রতিবাদে তাঁরা আহার শেষ না করেই উঠে পড়লেন। শ্রীমা ও অন্যান্য সকলের বিনীত অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা আর আহারে বসলেন না, উপরন্তু পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য করা হল। এই সংবাদ কলকাতায় পৌঁছবার পর শ্রীমায়ের অন্যতম ভক্ত ললিতবাবু একটা কৌশল করলেন। তখন সবেমাত্র কলকাতায়

গ্রামোফোন উঠেছে—গ্রাম দেশে তখনও পৌঁছয়নি, বিশেষ করে জয়রামবাটীর মত ক্ষুদ্র গ্রামে। সুতরাং গ্রামোফোন দেখা এবং শোনার জন্য তাদের অদম্য কৌতূহল। ললিতবাবু একটি গ্রামোফোন যন্ত্র (তখন কলের গান নামেই এর বিশেষ পরিচিতি) ও কয়েকখানি রেকর্ড নিয়ে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলেন। গ্রামের লোক সেই অদ্ভুত যন্ত্র থেকে মানুষের কণ্ঠ শোনার জন্য দলে দলে ভিড় করে আসতে লাগল। শুধু জয়রামবাটী নয়, পাশের গ্রামগুলিতেও কলের গানের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ললিতবাবু অকাতরে সকলকে গান শোনাতে লাগলেন। একদিন জমিদারবাবুরাও এসে উপস্থিত এবং এই সুযোগের জন্যই ললিতবাবু অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁদের দেখেই ললিতবাবুর রুদ্রমূর্তি—জমিদারদের বললেন, 'টাকা ফেরৎ দিন না হলে গুলি করে মারব।' ফলও হল সঙ্গে সঙ্গে—তারা সব টাকা ফেরৎ দিয়ে দিলেন।

এই ছিল তখনকার পল্লীসমাজ। একবাব শ্যামাসুন্দরীর কাছে নিবেদিতা আনন্দ করে বলেছিলেন, "দিদিমা একবার তোমার দেশে গিয়ে তোমাকে রান্না করে খাওয়াব।" আঁৎকে উঠেছিলেন শ্যামাসুন্দরী "না দিদি, উ কথাটি বলো নি। তুমি আমার হেঁসেলে ঢুকলে দেশের লোক আমাদের ঠেকো (একঘরে) করবে।"

সুতরাং সারদাদেবীকে অত্যন্ত সতর্কভাবে চলতে হত জয়বামবাটী বাসকালে।

তিন দিন প্রতিমা রেখে পূজা করতেন সারদাদেবী। এবার তৃতীয় দিনে সাধুরা দেবীমাহাত্ম্য সূচক গানের আসর বসালেন—তার মধ্যে একটি গান ছিল "মাকে দেখব বলে ভাবনা কেউ করো না আর/সে যে তোমার আমার মা নয় শুধু/জগতের মা সবাকার।" সারদাদেবী গানটি শুনে মুগ্ধ। কোয়ালপাড়ার সেই ভাঁড়ারী ছেলেটিকে বললেন, "আহা গান বেশ জমেছিল, তাই তো, ভক্তের আবার জাত কি? সব ছেলেই তো এক। আমার ইচ্ছা হয় সব ছেলেদের এক পাতে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতির বড়াই আবার আছে। যা হোক মুড়িতে তো দোষ নেই। কাল এক কাজ করো—খুব সকালে কামারপুকুর গিয়ে সত্য ময়রার দোকান থেকে বড় বড় জিলাপী দু'সের নিয়ে এস। পরদিন প্রায় ন'টার সময় কামারপুকুর থেকে জিলাপী এসে পৌঁছল। শ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরকে নিবেদন করে একটি বড় থালায় প্রচুর মুড়ি এবং তার চারপাশে জিলাপি সাজিয়ে ভক্তদেব কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বর্ণ-নির্বিশেষে সকলে গোল হয়ে বসে একসঙ্গে আনন্দ করে খেতে শুরু করলেন আর শ্রীমা অন্তরালে দাঁড়িয়ে পুলকিত অন্তরে সে দৃশ্য উপভোগ করলেন।

ভাইদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগির পর জয়রামবাটী এলে সারদাদেবী প্রথমদিকে ভ্রাতা প্রসন্নকুমারের কাছে থাকতেন কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর ভক্তসংখ্যা বেড়ে চলেছে—ভ্রাতাদের সংসারও বাড়ছে। সুতরাং ওখানে থাকা অসুবিধাজনক

হয়ে উঠছে। এই অবস্থা উপলব্ধি করে সারদানন্দজী ও কয়েকজন ভক্ত শ্রীমায়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থার কথা চিন্তা করলেন। পুণ্যপুকুরের পশ্চিমদিকে জায়গা সংগ্রহ করে তাঁরা দু হাজার টাকা ব্যয়ে একটি নতুন বাড়ি তৈরী করলেন। বাড়িটির উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীমায়ের জন্য একটি দক্ষিণমুখী ঘর, তার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বৈঠকখানা বা জগদ্ধাত্রীমণ্ডপ। মায়ের ঘরের বিপরীত দিকে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বাসস্থান এবং উত্তর-পূর্ব কোণে রান্নাঘর। সবটাই মাটির ঘর—উপরে খড়ের চাল। বাড়ি তৈরীর জন্য শ্রীমা বিশেষ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এই বাড়ির জন্য জমি কেনার সময় পুণ্যপুকুরটিও অনেক টাকা দিয়ে কেনা হল। ললিতবাবুর অর্থসাহায্য ও আগ্রহে ঔষধালয় ও নৈশ পাঠশালাও স্থাপিত হল।

বর্ষাকালে মাটির উঠানে কাদা হয়, তাই সেটা পাকা করার প্রস্তাব হলে সারদাদেবী আপত্তি জানিয়ে বললেন, "গ্রামে মাটির ঘরই ভাল। সব লোক মাটির ঘরে থাকে—জাঁকজমকে লোকের মনে ঈর্ষা হয়—শত্রুতা বাড়ে। দু'তিন বছর পরে অবশ্য তাঁর মতের বিরুদ্ধেই উঠান ও অন্য ঘরের মেঝে পাকা করে বাঁধানো হয় কিন্তু শ্রীমায়ের ঘরের মেঝে মাটিরই রেখে দেওয়া হয়। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শোবার ঘরখানি যেন পুরো মাটিরই থাকে কারণ পাকা মেঝেতে বসে আরাম নেই—গ্রীষ্মে বেশি গরম, আবার শীতে বেশি ঠাণ্ডা। তাঁর শেষ অসুখের সময় যখন তিনি উদ্বোধনে ছিলেন তখন তাঁকে না জানিয়ে মেঝে বাঁধানো হলেও তিনি আর সেখানে ফেরার সুযোগ পাননি।

১৫ মে, ১৯১৬ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহপ্রবেশ হল। সেই অনুষ্ঠানের দিন একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কোয়ালপাড়ার সাধু এবং ভক্তেরা মায়ের গৃহনির্মাণ থেকে শুরু করে গৃহপ্রবেশের আয়োজন পর্যন্ত প্রাণপাত পরিশ্রম করেন কিন্তু কিছু কর্তৃপক্ষ স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তের ব্যবহারে তাঁরা মর্মান্তিক আঘাত পান এবং গৃহপ্রবেশের দিন সকলেই অনুপস্থিত থাকেন। কোয়ালপাড়ার কাউকে না দেখে শ্রীমা রীতিমত মনঃক্ষুণ্ণ হন—বারবার তাঁদের অনুসন্ধান করেন। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পরে কোয়ালপাড়ার ভক্তেরা কিছু তরিতরকারী ও জিনিসপত্র নিয়ে উপস্থিত হলে সারদাদেবী তাঁদের অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চান কিন্তু তাঁরা কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন। তখন শ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী সবিস্তারে মাকে ঘটনাটি জানায়। ব্যথিত শ্রীমা বললেন, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। কোয়ালপাড়ার ছেলেরা আমার জন্য, ভক্ত ছেলেদের জন্য, সেখানে ঘাঁটিটি করে আগলে বসে আছে। তারা আমাদের জন্যে কি না করে? যোগ্যতা নেই—দিলে তাদের দুটো কথা বলে মনঃক্ষুণ্ণ করে। অমুকের কথায় কি এইসব নিয়ে [তার বিপুল পরিবার] নদীনালা পার হয়ে

গড়বেতা দিয়ে আমাকে যেতে হবে? এ-সব বুদ্ধি তাকে কে দিয়েছে? কোয়ালপাড়ার ছেলেরা দেশে আমার ডান হাত, বাঁ হাত। যে যাই বলুক—কোয়ালপাড়া দিয়ে আমাকে চিরকাল যাতায়াত করতে হবে।" শ্রীমায়ের এই স্নেহ ও সহমর্মিতার আস্বাদ পেয়ে কোয়ালপাড়ার ভক্ত সন্তানেরা তাঁদের দুঃখ ভুলে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন শ্রীমা যখন তাঁদের ভালবাসেন তখন অন্যের কটুকথার মূল্য সামান্যই।

জয়রামবাটীতে মায়ের নিজস্ব গৃহে প্রবেশের সময় স্বামী সারদানন্দ মঠ মিশনের কাজে বৃন্দাবনে ছিলেন। দেড় মাস পরে কলকাতায় ফিরে শ্রীমাকে বাগবাজারে নিয়ে আসার জন্য তিনি স্বয়ং জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলেন। স্থির হল, কলকাতা যাবার পথে কোতুলপুর সাবরেজেস্ট্রি অফিসে জয়রামবাটীতে মায়ের যাবতীয় সম্পত্তি—নতুন বাড়ি, পুণ্যপুকুর, জগদ্ধাত্রীর জন্য কেনা ধানজমির অর্পণনামা রেজেস্ট্রি করে যাওয়া হবে। সেই ব্যবস্থামত তাঁরা ৬ জুলাই সন্ধ্যায় কোতুলপুরে উপস্থিত হয়ে পরদিন ৭ জুলাই কোতুলপুরের সাবরেজিস্ট্রারকে আশ্রমে এনে যাবতীয় সম্পত্তি জগদ্ধাত্রীর নামে অর্পণ করে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের উপর তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। সাব-রেজিস্ট্রার একজন ২৬/২৭ বৎসরের যুবক। সারদানন্দজী নিজে সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সিগারেট দিয়ে পাখার বাতাস করে সৌজন্য প্রদর্শন করেন। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তাঁকে পালকিতে তুলে দিলেন। সেই রাত্রেই আহারের পর সকলে গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুর রওনা হলেন। পরদিন ৮ জুলাই (১৯১৬) সকালে বিষ্ণুপুর পৌছে সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে সকলে বিশ্রাম নেন–আবার রাত্রের ট্রেনে যাত্রা করে ৯ জুলাই বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে পৌছান।

১৯১৬-র ১৫ জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নতুন নাটক 'রামানুজ'।নাটকটির কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের 'শ্রীরামানুজ-চরিত' থেকে। স্বামী সারদানন্দের উৎসাহে অপরেশচন্দ্র এই নাটকটি লিখেছিলেন এবং তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং এই নাটক রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল এবং সারদাদেবী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রমুখেরা কোন না কোন সময়ে মিনার্ভায় এই নাটকটি দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। ৯ জুলাই (১৯১৬) থেকে ৩১ জানুয়ারি (১৯১৭) পর্যন্ত সারদাদেবী কলকাতায় ছিলেন। এই সময়কালের মধ্যে কোন একদিন তিনি নাট্যকারের বিশেষ অনুরোধে মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়েছিলেন অভিনয় দর্শন করতে। ৩য় অঙ্কের শেষে রামানুজের ভূমিকাভিনেত্রী তারাসুন্দরী রামানুজ-এর সাজসজ্জা পরেই সারদাদেবীকে প্রণাম নিবেদন করতে গেলে তিনি 'আয় মা বোস' বলে সস্নেহে তারাসুন্দরীকে পাশে বসান। থিয়েটার শেষ হয়ে যাবার পর শ্রীমা চমৎকার

ভূমিকাভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীকে ডেকে পাঠান। অপরেশচন্দ্রেব মুখে মায়ের আহ্বানের কথা শুনে বেশ পরিবর্তন না করেই কিশোরী নীরদা তৎক্ষণাৎ ছুটে যান সারদাদেবীর কাছে। শ্রীমা তাঁকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। নাট্যজগতে এই ঘটনা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে অপরেশচন্দ্র লিখেছেন, "মানুষ খোলটা দেখে। ভগবান খোলের ভিতরটা দেখেন বলিয়াই, নিজে দেখিয়াছি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী, মা আমার এই দেশের রঙ্গালয়ের কোন পতিতা অভিনেত্রীকে কোলে করিয়া জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন—ভগবানের দয়া কাঁটাগাছ বাছে না—সে দয়ার পাত্রাপাত্র নাই, সে দয়া বিচার করে না, ব্যবহারিক জগতের কোন বিধিনিষেধ মানে না, সে কেবল জাতিনির্বিচারে সকলকে পবিত্র করিয়া লয়।" নীরদাসুন্দরীও শেষ জীবন পর্যন্ত মায়ের এই আশীর্বাদ লাভের কথা অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করতেন। এই ঘটনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করার মতই নাট্যজগৎকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিল।

তারাসুন্দরীর পূর্ব থেকেই উদ্বোধনে যাতায়াত ছিল। 'রামানুজ' নাটকে অভিনয়ের আগে এবং পরে তিনি উদ্বোধনে শ্রীমাকে প্রণাম করতে যেতেন—অনেক সময় সঙ্গে থাকতেন অভিনেত্রী তিনকড়ি। কিন্তু তাঁরা কখনো ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করতেন না। বাইরে থেকে ঠাকুর ও শ্রীমাকে প্রণাম করতেন। শ্রীমা তাঁদের প্রসাদ দিলে তাঁরা বাইরে বসে প্রসাদ গ্রহণ করে, রাস্তায় পাতা ফেলে দিয়ে, গোবর দিয়ে প্রসাদগ্রহণের স্থানটি পরিষ্কার করে দিতেন। শ্রীমা তাঁদের প্রসাদী পান দিলে তাঁরা শ্রীমার স্পর্শ বাঁচিয়ে আলগোছে সেটি গ্রহণ করতেন। শ্রীমা বলতেন, "এদেরই ঠিক ঠিক ভক্তি, যেটুকু ভগবানকে ডাকে একমনে ডাকে।"

একবার তিনকড়ি একাই এসেছেন মাকে প্রণাম করতে। লক্ষ্মীদেবী ধরে বসলেন, 'গান শোনাও।' সঙ্কুচিতা তিনকড়িকে সারদাদেবী উৎসাহিত করে বললেন, 'তোমার সেই পাগলীর ['বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকে পাগলিনীর গান] গানটা গাও।' তিনকড়ি গান ধরলেন 'আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে/যেখানে যাই, সে যায় পাছে/আমায় বলতে হয় না জোর করে।' সারদাদেবীর চোখ দুটি ধীরে ধীরে নিমীলিত হল—যখন চোখ খুললেন সেখানে বাহ্যদৃষ্টি নেই—গান শেষ হবার পরেও বসে রইলেন—স্থির, নিস্পন্দ। এ কি তাঁরই মনোজগতের উন্মোচন? কিছুক্ষণ পরে আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'আজ কি গানই শোনালি মা।'

এই বৎসর (১৯১৬) সারদাদেবী বেলুড় মঠে দুর্গোৎসবে যোগদান করেন। মহাসপ্তমীর দিন প্রত্যূষে চণ্ডীমণ্ডপে নবপত্রিকা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার

গাড়িতে মঠে পৌঁছান—তাঁর সঙ্গে ছিলেন যোগীন-মা, গোলাপ-মা ও সুধীরাদেবী। তাঁর আগমন উপলক্ষে মঠের প্রবেশদ্বার থেকে চণ্ডীমণ্ডপ পর্যন্ত পুরো পথ নানা পত্র পুষ্পে শোভিত করা হয়। শ্রীমা ঠাকুরঘরের সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হলে শুকুল মহারাজ (স্বামী আত্মানন্দ) আরতি ও বাবুরাম মহারাজ চামর ব্যজন করেন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। সারদাদেবী ৩ থেকে ৬ অক্টোবর মঠের উত্তরদিকের বাগানবাড়িতে অবস্থান করার কথা, কিন্তু জানা গেল রাধুর শরীরের অসুস্থতার জন্য সপ্তমীর দিনই সন্ধ্যায় ফিরে যেতে হবে। এই সংবাদ জেনে কৃষ্ণলাল মহারাজ ছুটে গেলেন স্বামী প্রেমানন্দের কাছে—"আপনি গিয়ে, একবার বলুন যাতে উনি থাকেন।" প্রেমানন্দ মহারাজ সভয়ে হাত জোড় করে বললেন, "মহামায়াকে কে বাবা নিষেধ করতে যাবে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে? তাঁর যা ইচ্ছে, তা তিনি করবেন।" অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাধু কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার সংবাদ পেয়ে তিনি পূজার চারদিনই উপস্থিত ছিলেন। সন্ধিপূজার পর স্বামী সারদানন্দ একজন ব্রহ্মচারীকে একটি গিনি দিয়ে বলেন, "ও বাগানে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আয়। এখানে তো তাঁরই পূজা হল।"

অষ্টমীর দিন সকালে শ্রীমা গেলেন প্রতিমা দর্শনে। মঠের সাধুরা তখন পাশে বসে ভোগের কুটনো কুটছিল। সারদাদেবী তা দেখে আনন্দিত, বললেন, 'ছেলেরা বেশ কুটনো কোটে তো।' কাজ করতে করতে সহাস্যে স্বামী জগদানন্দ বললেন, 'ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হলো উদ্দেশ্য—তা সাধনভজন করেই হোক আর কুটনো কুটেই হোক।'

অষ্টমীর দিন বহুলোক শ্রীমায়ের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন, তারপর যোগীন-মা দেখেন সারদাদেবী বার বার গঙ্গাজলে পা ধুচ্ছেন। শঙ্কিত যোগীন-মা বলে ওঠেন "মা ও কি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে।" সারদাদেবী উত্তর দেন "যোগেন কি বলব, এক একজন প্রণাম করে যেন গা ঠাণ্ডা হয়, আবার এক একজন প্রণাম করে, যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়—গঙ্গাজলে না ধুয়ে বাঁচিনে।"

এই প্রণাম গ্রহণ করা তাঁর কাছে কোনদিক দিয়েই সুখকর ছিল না—সর্বাঙ্গ চাদরে মুড়ে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক, তার ওপর অনেকের স্পর্শ তাঁকে পীড়িত করত কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মেনে নিতেন সর্বপ্রকার ক্লেশ—পরে বলতেন, "বাবা সারাদিন যেন কুস্তি করছি, এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না। ঠাকুরকে বলে 'রাধু রাধু' করে মনটা রেখেছি।" কখনো কখনো ভাবতেন, আর কারও প্রণাম নেবেন না—অন্যের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন কিন্তু পরক্ষণেই ভাবতেন—'এ দেহটা তো ঠাকুর রেখেছেন এই জন্যই'—সুতরাং প্রণাম চলতেই থাকে।

সেবারের পূজার বিবরণ স্বামী শিবানন্দের ৯।১০।১৬ তারিখের পত্রে পাওয়া যায়। "শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন প্রত্যক্ষরূপে হইল।...যদিও তিনদিনই অনবরত বৃষ্টি-ঝড় তথাপি মা-র কৃপায় কোন কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমন কি ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে, ঠিক সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য থামিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগীন-মার কাছে শোনা গেল যে, যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এল এল, অমনি শ্রীশ্রীমা দুর্গানাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন, 'তাই তো, অত লোক কি করে বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা-টাতা সব যে ভেসে যাবে। মা, রক্ষা কর।' মা-ও সত্য-সত্যই রক্ষা করিতেন। তিন দিনই ঐ রকম।"

প্রায় পাঁচমাস কলকাতায় অবস্থানের পর ৩১ জানুয়ারি, ১৯১৭ তিনি কোয়ালপাড়ার পথে জয়রামবাটী যাত্রা করলেন। কোয়ালপাড়ায় নিজ বাড়ি 'জগদম্বা আশ্রমে' দুদিন অবস্থান করে জয়রামবাটী গিয়ে পৌঁছলেন।

ফাল্গুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির কয়েকদিন আগে একদিন কোয়ালপাড়া থেকে সাইকেলে বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ) গিয়েছিলেন জয়রামবাটীতে। সেদিন বিকালে, অকালবর্ষণের কিছু লক্ষণ দেখা গেল—ওদিকে রাধুও আব্দার ধরল বরদা মহারাজকে থাকতে হবে। শ্রীমা বললেন, 'মেঘও তো সামান্য হয়েছে, রাধুও জেদ করছে, তবে থেকেই যাও।' বরদা মহারাজ কিন্তু সব উপেক্ষা করে কোয়ালপাড়া অভিমুখে বেরিয়ে পড়লেন। দেশড়া গ্রাম অতিক্রম করে প্রান্তরে উপস্থিত হতেই শুরু হল দারুণ শিলা বৃষ্টি। নিকটে কোথাও আশ্রয় নেই। একটি শুষ্কপত্র গাছের তলায় দাঁড়িয়ে শিলার আঘাত ও বৃষ্টিতে জর্জরিত হয়ে কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামতে—হেঁটে গিয়ে পৌঁছলেন কোয়ালপাড়ায়। পরদিন সকালেই রাধুকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে কেদারবাবুর কাছে শ্রীমা লোক পাঠালেন—"শ্রীমান বরদা নিরাপদে পৌঁছেছে কিনা এবং কেমন আছে পত্রপাঠ জানাবে। কাল ঝড়বৃষ্টির সময় সমস্ত রাত্তির চিন্তায় কাটিয়েছি এবং উদ্বিগ্নে আছি।" বরদা মহারাজ কোয়ালপাড়ায় পৌঁছে কিছু জানাননি—এখন সব কথা বলতে হল। দু'একদিন পরে আবার যখন তিনি জয়রামবাটী গেলেন তখন শ্রীমা মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, "কথা না শুনে গোঁ ভরে তো চলে গেলে। তারপর উৎকণ্ঠা ও চিন্তা তো আমার। তোমাদের মাস্টারমশাই বকবেন বলে আমার কথা না শুনে চলে গেলে। আমি কি তোমার পর? আমার কথা না শুনলে আমাকেই কষ্ট পেতে হয়। অন্তর থেকে যে যা বলে শুনতে হয় বাবা।"

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস। বরদা মহারাজ গিয়েছেন কিছু আনাজপাতি নিয়ে জয়রামবাটীতে। গিয়ে শুনলেন, শ্রীমা গিয়েছেন বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ি। কিছুক্ষণ পরে তিনি ফিরে এসে জানালেন বাঁড়ুজ্জে বাড়ির রাজেন্দ্রনাথের বিধবা

স্ত্রী একটি নাবালক ছেলে নিয়ে থাকে—তার কানের মধ্যে ঘা হয়েছিল। দেখা শোনার কেউ নেই—ফলে সেই ঘা পচে গিয়ে বড় বড় পোকা হয়েছে, দুর্গন্ধে কেউ কাছে যেতে পারে না। শ্রীমা সকালে নিমপাতার জল গরম করে একজন ব্রহ্মচারীকে নিয়ে সেখানে গিয়ে ঘা ধুইয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে এলেন। পরে স্ত্রীলোকটিকে কোয়ালপাড়ায় নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ ও চিকিৎসা করা সত্ত্বেও সে মারা গেল।

সে বছর দুর্গাপূজার সময় ভাইদের ছেলেমেয়েদের জন্য কতকগুলি কাপড় কেনার ভার দেন বরদা মহারাজের উপর। বরদা মহারাজ কোয়ালপাড়া আশ্রমের স্বদেশীয়ানায় বিশ্বস্ত—তিনি দেশী মিলের কাপড় কিনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু নলিনী-মাকুরা তা এককথায় না-পছন্দ করল। তারা যে জিনিস চায় সব বিলাতি। বরদা মহারাজ বললেন, 'ও সব তো বিলিতি হবে, ও আবার কি আনব?' শ্রীমা হাসতে হাসতে বললেন, 'বাবা, তারাও (বিলাতের লোকেরা) আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি আর একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে, তাই সব এনে দাও। ওদেরও মনটি বুঝে আমাকে চলতে হবে। আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় বাবা।' অগত্যা আবার বরদা মহারাজকে সব পোশাক পালটে আনতে হল।

নভেম্বর মাসে নতুন বাড়িতে জগদ্ধাত্রীপূজা। দুর্গাপূজার পর থেকেই শুরু হল উদ্যোগ আয়োজন। সেবার পূজার পুরোহিত হলদিপুরের হৃষীকেশ ভট্টাচার্য। তন্ত্রধারক মাতৃকুলগুরু। পূজা শেষ হলে কুলগুরুকে প্রণাম করে শ্রীমা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন কিন্তু পুরোহিত প্রণাম করতে যেতেই তিনি সসঙ্কোচে পিছিয়ে গেলেন, 'মা আপনি আমাকে প্রণাম করছেন কি? আশীর্বাদ করুন।' কুলগুরু অপ্রস্তুত—আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন, 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং/তৎপদং স্পর্শিং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।' শ্রীমাও তাঁকে সমর্থন করে বললেন 'তা বৈকি বাবা!'

পরদিন সকালে সাতবেড়ের লালু জেলে এসে সারদাদেবীর কাছে আব্দার ধরল, 'পিসিমা, আমি বাউল গান করব।' শ্রীমা তাতে সম্মত নন, নানা অসুবিধার কথা জানালেন, বললেন, 'কেন লোক হাসাবি লালু? তার চেয়ে অমনি বসে দু'একখানি গান জগদ্ধাত্রীকে শুনিয়ে পরে প্রসাদ পেয়ে যাস।' কিন্তু একথায় লালু ভোলবার পাত্র নয়—সে নিজেই সামিয়ানা জোগাড় করে, টাঙিয়ে বাউলের আলখাল্লা পরে ঢোলক কাঁধে নিয়ে আসরে নামল। তারপর দু'চারটি হাসির গান গেয়ে সকলকে হাসিয়ে বিদায় নিল।

জগদ্ধাত্রীপূজার পরেই সারদাদেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পৌষ মাসে তাঁর জ্বর খুব বেড়ে গেল। ৪ জানুয়ারি (১৯১৮) তাঁর জন্মতিথি পালনের ব্যবস্থা হয়েছিল

কিন্তু সেই দিনই তাঁর প্রবল জ্বর। সংবাদ পেয়ে সারদানন্দজী নিজের ভ্রাতা ডাক্তার সতীশ চক্রবর্তী, ডাঃ কাঞ্জিলাল, যোগীন-মা, গোলাপ-মা এবং সরলাদেবীকে নিয়ে ২১ জানুয়ারি জয়রামবাটী পৌঁছান। শ্রীমা বললেন, 'আমি কাঞ্জিলালের ওষুধ খাব।' কিছুদিন চিকিৎসা ও সেবাযত্নের পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। প্রকৃতপক্ষে সারদানন্দজীর উপস্থিতিই তাঁকে মানসিকভাবে সুস্থ করে তুলেছিল।

এই সময় শুরু হয়েছিল এক নতুন উৎপাত। তখন সারা দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। মায়ের ভক্তদের মধ্যে দু'একজন ছিলেন অন্তরীণ বন্দী। তাঁরা প্রায়ই যাতায়াত করতেন মাতৃআশ্রয়ে। পুলিশ আসে, জেরা করে—এমনকি সারদাদেবীকেও বাদ দেয় না। একবার পুলিশ এসে সারদাদেবীকে প্রশ্ন করল, তাঁর কাছে স্বদেশীরা আসে কিনা! শ্রীমা অকুতোভয়ে উত্তর দিলেন, 'কে তোমার স্বদেশী, কে বিদেশী তা ত জানি না বাবা। আমার কাছে আমার ছেলেরা আসে।' বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের সাধুদের আগমনই পুলিশকে সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল। তারা প্রায়ই এসে আগত ভক্তদের নাম ধাম লিখে নিয়ে যেত এবং মায়ের বাড়ির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত। সারদাদেবীর পক্ষে এটা নিতান্ত অস্বস্তির ব্যাপার। কোয়ালপাড়া আশ্রমটিও স্বভাবতই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে তখনকার দিনে এইসব আশ্রম, যাদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মানসিক যোগ আছে, পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শ্রীমায়ের এক ভক্ত বিভূতিবাবু সারদাদেবীর অস্বস্তির ব্যাপারটা বুঝে বাঁকুড়ার পুলিশের এক বড় কর্মচারীকে জয়রামবাটীতে আনেন। তিনি শ্রীমাকে দর্শন ও আশীর্বাদ লাভ করে তাঁকে প্রশ্ন করেন 'পুলিশের ওই খবরদারিতে তিনি ভয় পান কি না!' সরলভাবেই সারদাদেবী উত্তর দেন, 'ভয় হয় কি বাবা!' পুলিশ কর্মচারীটি তাঁকে আশ্বস্ত করে এ ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান, তার পর থেকে পুলিশ কেবল নামধামটুকুই লিখে নিয়ে যেত অন্য কোনও তৎপরতা দেখাত না। এমনকি স্থানীয় থানার দারোগাও শ্রীমা ও তাঁর আবাসটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করল। সারদানন্দজী সকলকে নিয়ে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হলে গ্রামের চৌকিদার অম্বিকা এসে সকলের নামধাম লিখে নিয়ে গেল—সারদানন্দ স্বামীও সকলের পরিচয় সঠিকভাবেই তাকে দিয়ে দিলেন।

এর কিছুদিন আগে বাঁকুড়া জেলারই যূথবিহার গ্রামে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটে। যূথবিহার গ্রামের দেবেনবাবুর ভগিনী ও স্ত্রী উভয়েরই নাম ছিল সিন্ধুবালা। ভগিনী সিন্ধুবালা তখন সন্তানসম্ভবা। রাজদ্রোহমূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত সন্দেহে পুলিশ উভয়কেই গ্রেপ্তার করে (পুলিশ একজন সিন্ধুবালাকেই হয়ত

গ্রেপ্তার করতে এসেছিল কিন্তু উভয়ের একই নাম হওয়াতে বিভ্রান্ত হয়ে দু'জনকেই ধরে নিয়ে যায়)—ভগিনীকে তার শ্বশুরালয় সরোজপুর থেকে এবং স্ত্রীকে যূথবিহার থেকে। উভয় মহিলাকেই পায়ে হাঁটিয়ে দূরবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামবাসীদের সমস্ত যুক্তিতর্ক তারা অগ্রাহ্য করে, এমনকি যানবাহনের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। শ্রীমায়ের ভ্রাতা কালীকুমার তাঁকে এই সংবাদ দিলে তিনি স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে উঠে বলেন, "বল কি? এটা কি কোম্পানীর আদেশ না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকদের ওপর এতো অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে তো শুনিনি। এ যদি কোম্পানীর আদেশ হয় তো আর বেশি দিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু'চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারে?" কিছুক্ষণ পরে কালীকুমারই সংবাদ আনলেন, মেয়ে দুটি ছাড়া পেয়েছে। সারদাদেবী আশ্বস্ত হয়ে বললেন, "এ খবর যদি না পেতুম তবে আজ আর ঘুমুতে পারতুম না।"[১]

সারদানন্দজীর ইচ্ছা ছিল, শ্রীমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন কিন্তু সারদাদেবী সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। সুতরাং তিনি সরলাদেবীকে মায়ের সেবার জন্য এবং ইতিমধ্যে যদি মায়ের মত পরিবর্তন ঘটে সেই আশায় একজনকে রেখে বাকি সকলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমায়ের আশু মত পরিবর্তনের কোন লক্ষণ না দেখে ব্রহ্মচারীটিও জয়রামবাটী ত্যাগ করেন।

শিবরাত্রির পূর্বদিনে অম্বিকা চৌকিদার এসে খবর জানিয়ে গেল—শিরোমণিপুরের দারোগা শীঘ্রই আসছেন। কিছুদিন আগে স্বামী জ্ঞানানন্দ ম্যালেরিয়ায় ভুগে চিকিৎসার জন্যে কাটিহার গিয়েছিলেন এবং সেখানে ডাক্তার অঘোরনাথ ঘোষের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এর পরই তিনি মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে জয়রামবাটীতে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার কাটিহারে ফিরে যান। অঘোরনাথের এক ভ্রাতা ফেরার নজরবন্দী রাজনৈতিক কর্মী। পুলিশের সন্দেহ জ্ঞানানন্দ নাম নিয়ে তিনিই এসেছিলেন জয়রামবাটীতে। এ বিষয়ে তদন্তের জন্যই পুলিশকর্তার আগমন। এ সংবাদে সকলে বিচলিত হলেও সারদাদেবীর কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। পরদিন আরামবাগের উকীল মণীন্দ্র বসু মাতৃসন্দর্শনে উপস্থিত হলে সারদাদেবী আনুপূর্বিক সমস্ত তাঁকে জানালেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দারোগাবাবু এসে হাজির। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গেই সব কথাবার্তা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে শ্রীমা সংবাদ পাঠালেন দারোগাবাবুর জলখাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। জলযোগে

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ ঘটনাটি উল্লেখ কবলেও তিনি এর সত্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত নন, কারণ পল্লীগ্রামে সংবাদ প্রচারিত হয় মুখে মুখে। গ্রামান্তবে সে সংবাদ যখন পৌঁছায তখন তা অতিরঞ্জিত হযে ওঠা অস্বাভাবিক নয। তবে ইংরেজ আমলে এই ধবনেব ঘটনা বা এব চেযেও ভয়াবহ নাবী নির্যাতনের ঘটনা ইতিহাসে আশ্রয় পেযেছে।

আপ্যায়িত দারোগাবাবু শ্রীমাকে প্রণাম করে, তাঁর স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে পরিতৃপ্ত ও নিঃসন্দেহ হয়ে বিদায় নিলেন।

সারদাদেবী কলকাতায় গেলেন না। কোয়ালপাড়ার কর্মীরা প্রস্তাব করলেন তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কোয়ালপাড়ায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। শ্রীমা তাতে সম্মত হয়ে বরদা মহারাজকে জয়রামবাটীতে রেখে ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীকে নিয়ে কোয়ালপাড়ায় ১৯১৮-র মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবস্থান করেন। কোয়ালপাড়ায় অবস্থানের শেষ দিকে তিনি আবার জ্বরে আক্রান্ত হন।

কোয়ালপাড়ায় অবস্থানকালে একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অকস্মাৎ একদিন দুপুরে এখানে তাঁর ভাবসমাধি হয়। 'ঠাকুর' এই শব্দটি উচ্চারণ করেই তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। নলিনীদেবী সেই অবস্থায় তাঁর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আবার বাহ্যিক জগতে ফিরে আসেন। নলিনীদেবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ও কিছু নয়। তোদের ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।" কিন্তু পরে একদিন এই দিনের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ দেন। "জয়রামবাটী থেকে দুর্বল শরীর নিয়ে [কোয়ালপাড়ায়] এসে একদিন বারাণ্ডায় বসে আছি। নলিনীরা কি সব সেলাই করছে। খুব রোদ—চারদিক রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। দেখি সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠাণ্ডা বারাণ্ডায় বসেই শুয়ে পড়েছেন। তাই দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলটা পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়েই ঐ অবস্থায় কেমন হয়ে গেলুম। কেদারের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগল। তাই তাদের বললুম, "ও কিছু নয়।" এই ঘটনার পরেও তিনি বহুবার ঠাকুরের দর্শন পেয়েছেন। যেদিন বরদা মহারাজের কাছে পূর্বোক্ত ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন, সেদিনই বলেন, 'কোয়ালপাড়ায় অতো জ্বর হতো, বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই বে-সামাল হয়ে পড়তুম। কিন্তু হুঁশ হলে যখনই তাঁকে শরীরটার জন্য স্মরণ করতুম, তখনই তাঁর দর্শন পেতুম।'

কোয়ালপাড়ায় সারদাদেবীর অসুস্থতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। দুপুরে শরীরের তাপমাত্রা ১০২°-১০৩°-তে পৌঁছয়। সেই সময় দেখা দেয় অসম্ভব হাত-পা জ্বালা—অর্ধচৈতন্য অবস্থায় কোন শীতল দেহের স্পর্শ খোঁজেন—সেই স্পর্শ তাঁকে কিছু স্বস্তি দেয়। এ সময় তিনি বার বার খুঁজতেন সারদানন্দজীকে, তাঁর শীতল দেহের স্পর্শ লাভ করার জন্য। অসুস্থতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে ১০ এপ্রিল (১৯১৮) সারদানন্দজীকে টেলিগ্রাম করা হল। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ মহারাজ সেই রাত্রেই পাঠিয়ে দিলেন ডাঃ কাঞ্জিলালকে। আর তিনি স্বয়ং উপস্থিত হলেন ১৭ এপ্রিল দ্বিপ্রহরে—সঙ্গে ডাঃ সতীশ চক্রবর্তী, যোগীন-মা। তিনি দেখলেন শ্রীমা জ্বরের মধ্যে একটা কিছু পাবার জন্য

হাতড়াচ্ছেন। যাঁরা আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন তাঁরা জানতেন এই সময় শ্রীমা খোঁজেন একটু শীতল স্পর্শ। শরৎ মহারাজকে সে কথা জানাতেই তিনি তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের জামা খুলে তাঁর অনাবৃত শীতল দেহে শ্রীমায়ের শীর্ণ হাত দুখানি চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারদাদেবীর স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল, তিনি 'আঃ' বলে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর পাশে বসে আছেন তাঁর স্নেহের সন্তান সারদানন্দজী, কিন্তু শ্রীমা তাঁর স্বভাব অনুযায়ী ঘোমটা টানলেন না। সকলে ভাবলেন বোধহয় শরৎ মহারাজকে তিনি চিনতে পারলেন না।

স্বামী সারদানন্দ কোয়ালপাড়ায় পৌঁছবার আগে থেকেই ডাঃ কাঞ্জিলালের চিকিৎসা চলছিল। পরদিনই জ্বর ছেড়ে গেল—২১ এপ্রিল সারদাদেবী অন্নপথ্য করলে ডাঃ কাঞ্জিলাল ফিরে গেলেন কলকাতায়।

সারদাদেবী ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন—ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক শক্তি ফিরে পাচ্ছেন—এই অবস্থায় সারদানন্দজী প্রস্তাব করলেন, 'এখানে আর আপনাকে ছেড়ে যাব না—আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' এইবার অসুস্থতার পর সারদাদেবী বুঝতে পারলেন, তাঁর শরীর এখন আর আগের মত নেই, প্রায়ই তাঁকে ভুগতে হচ্ছে—ছেলেদেরও তাঁর জন্য উদ্বেগের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। পল্লীগ্রামে আর থাকা সম্ভব নয়। তিনি শরৎ মহারাজের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'কিন্তু বাবা, একবার জয়রামবাটী গিয়ে যাত্রাটা বদলে আসতে হবে।' তাঁব কথামত ২৯ এপ্রিল সারদানন্দজীকে সঙ্গে নিযে ফিরে এলেন জয়রামবাটী। বাধু তখন তাজপুরে নিজের শ্বশুরালয়ে। সে শ্রীমায়ের সঙ্গে যেতে চায় কিনা জানার জন্য সেখানে লোক পাঠানো হল—রাধু তখন কলকাতা যেতে সম্মত হল না। প্রায় একমাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে বাধুও কলকাতা এসে পৌঁছয়।

॥ ২০ ॥

৫ মে জয়রামবাটী পরিত্যাগ করে সারদাদেবী কোয়ালপাড়ায় একরাত্রি অবস্থান কবেন। পরদিন ঘোড়ার গাড়িতে বিষ্ণুপুর পৌঁছে ট্রেনে কলকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং ৭ মে বেলা সাড়ে দশটায় উপস্থিত হন উদ্বোধনে।

এবার কলকাতায় অবস্থানকালে তাঁর জীবনে আরও একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে—৩০ জুলাই ১৯১৮ স্বামী প্রেমানন্দ দেহত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যু আসন্ন জেনে সেদিন সকাল থেকেই শ্রীমায়ের চোখ অশ্রুসিক্ত। বিকালে বললেন, "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিষ ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত।" মাঝের ঘরের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের বড় ছবিটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠাকুর নিলে?"

আবাব যথারীতি ভক্ত সমাগম শুরু হয়েছে। আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সকলের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন তিনি। ১৮ ভাদ্র ১৩২৫, ১৯১৮-র সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শ্রীমতী সরযূবালার কাছে কথা প্রসঙ্গে বললেন, "সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে-বাগদি-ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীনভাব আসবে।" তাঁর নিজের এক আত্মীয়া সম্পর্কে বললেন, "ওর কথা কি বলব মা, জয়রামবাটীতে ডোমরা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে—ঘরে দিতে এসেছে। আমি বললুম, 'ঐ খানকে রাখ।' তা তারা কত সাবধান হয়ে রেখে গেল। ও বলে কি না, 'ঐ ছোঁয়া গেল, ও সব ফেলে দাও।' এই বলে তাদের গালাগাল, 'তোবা ডোম হয়ে কোন সাহসে এমন করে রাখতে চাস?' তারা তো ভয়ে মরে। আমি তখন বলি, 'তোদের কিচ্ছু হবে না, কোন ভয় নেই।' তাদের মুড়ি খেতে পয়সা দি। এমনি মন ওর! রাত তিনটের সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের বারাণ্ডায়) বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে! তা তো করবে না, কেবল অশান্তি অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর? আমি তো মা, অশান্তি কেমন তা জানতুম না। এখন ওই ওদের জন্যে, আর কি ক্ষণে ছোট বৌ [সুরবালা] ঘরে এল, আর তার মেয়েকে মানুষ করতে গেলুম, সেই হতে জ্বালা। যাক সব চলে যাক, কাউকে আমি চাইনে।..."

৭ সেপ্টেম্বর, নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের অনুরোধে শ্রীমা 'কুমারী' নাটক দেখতে যান।

৩০ সেপ্টেম্বর সকালে স্বামী অরূপানন্দের কাছে কথাপ্রসঙ্গে সারদাদেবী বলেন, "যদি মন শুদ্ধ হয়, কেন ধ্যানধারণা হবে না? কেন দর্শন হবে না? জপ করতে বসলুম তো আপনা হতেই ভিতর থেকে গরগর করে নাম উঠতে থাকবে, চেষ্টা করে নয়।"

"জপধ্যান সব যথাসময়ে, আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়।...এ বিষয়ে রোখ করে অভ্যাস করতে হয়।

"সাধন বল, ভজন বল, তীর্থদর্শন বলো, অর্থোপার্জন বলো— সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়। এই আমি হেঁটে হেঁটে কাশীবৃন্দাবন কত দর্শন করেছি। এখন দু'হাত যেতে হলে পালকি চাই—ধরে ধরে নিতে হয়।...এই যে এখানকার ছোকরারা সব প্রথম বয়সেই ভগবানে মন দিচ্ছে, এ ঠিক দিচ্ছে, ঠিক সময়ে হচ্ছে।"

অরূপানন্দজী প্রশ্ন করলেন, "এখন যারা তোমার কৃপা পাচ্ছে তারা তো ভাগ্যবান। এর পর যারা আসবে তাদের কি করে হবে?"

উত্তরে শ্রীমা বলেন, "সে কি? তা হবে না? ভগবান সর্বত্র সব সময়ে রয়েছেন। তাঁর কৃপায় হবে। অন্য সব দেশে হচ্ছে না?"

১৯১৮-এর নভেম্বরে (১২ কার্তিক ১৩২৫) একদিন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে নির্বাক চলচ্চিত্র 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' দেখতে যান।

এই সময়ে একদিন একজন ভক্ত সারদাদেবীকে প্রণাম করলে তিনি বলেন, "জপ, সংখ্যা, করগণনা এসব শুধু মন আনবার জন্যে। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু এ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না, ধ্যান হল তো সবই হল।

"মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মন স্থির করার জন্য একটু নিঃশ্বাস বন্ধ করে ধ্যানের চেষ্টা করতে হয়। তাতে মন স্থির হবার সাহায্য করে। কিন্তু ও-ভাবে বেশি করতে নাই, মাথা গরম হয়। ভগবান দর্শন বল, ধ্যান বল সবই মন। মন স্থির হলে সব হয়।

"মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দরকার, তিনি নিজে এক একবার এসে সাধন করে পথ দেখিয়ে দেন। এবার দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেদেব নিয়ে থাকবেন বলেছেন।"

বড়দিনের ছুটিতে তখন গড়ের মাঠে সার্কাসের আসর বসত। সেবার রাধুকে নিয়ে সারদাদেবী একদিন সার্কাস দেখে এসেছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। একদিন বিকালে একটি ভক্ত ছেলেকে তিনি প্রশ্ন করলেন, "হ্যাঁ গা, এতবড় যুদ্ধটা হচ্ছিল, তা হঠাৎ থেমে গেল কি করে?" ছেলেটি বলল, "মা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৪ দফা শর্ত দিয়ে সন্ধি

করে মিটিয়ে দিলেন।" মায়ের প্রশ্ন, "কি রকম এবং কি কি শর্ত হল?" ভক্ত ছেলেটি বলল, "পরস্পর পররাজ্য অনাক্রমণ, প্রীতির সঙ্গে বসবাস, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি কতকগুলি শর্তে।" শ্রীমা বলেন, "এ তো খুব ভাল কথা, কিন্তু ওরা যা বলে ও সব মুখস্থ।" ছেলেটি কথাটির মানে বুঝতে পারেনি দেখে তিনি আবার বলেন,"যদি অন্তঃস্থ হত তাহলে কথা ছিল না।"

৩১ ডিসেম্বর সারদাদেবী রাধুকে নিয়ে নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রী নিবাসে ওঠেন কারণ রাধু তখন অন্তঃসত্ত্বা এবং অসুস্থ—কোন গোলমাল তার সহ্য হয় না। কিন্তু এখানে এসেও তার শান্তি নেই—সারাদিন কাকের চিৎকার—সুতরাং সারদাদেবীকে সারাদিনের জন্য গ্রহণ করতে হল কাকতাড়ুয়ার কাজ। অবশেষে বাধ্য হয়েই তাঁকে আবার রওনা হতে হল জয়রামবাটীর পথে—২৭ জানুয়ারি—১৯১৯। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাধু, সুরবালা দেবী, মাকু ও তার শিশুপুত্র ন্যাড়া, নলিনী, নবাসনের বৌ,[১] গণেন মহারাজ, দ্বিজেন মহারাজ ও বরদা মহারাজ (স্বামী ঈশানানন্দ)। বিকালে তাঁরা বিষ্ণুপুরে পৌঁছে গড়দরজায় সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে ওঠেন। শ্রীমায়ের শুভাগমন উপলক্ষে বাড়িটি চুনকাম ও পরিষ্কার করে রেখেছিলেন গৃহকর্তা।

পরদিন সকালে সুরেশ্বরবাবু একটি যুবককে পরিচিত করে দেন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলে। জ্যোতিষী শুনে সকলেই তাঁকে হাত দেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল—রাধু-মাকুও (উভয়েই তখন সন্তানসম্ভবা) বাদ গেল না। রাধুর হাত দেখে জ্যোতিষী গম্ভীরভাবে জানালো "সুপ্রসব হবে না" আর মাকুকে বললেন, "এঁর পর পর কয়েকটি সন্তানের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের দেখা হবে না।" শুনে রাধু-মাকু কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে শ্রীমা জ্যোতিষীকে অন্তরালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "বাবা তুমি ছেলেমানুষ, এরকম কোন গ্রহের অরিষ্ট যোগ আছে দেখলে তোমার তাকে না বলে গোপনে আমাদের বললেই ভাল হত। যাই হোক এখন তোমার জ্যোতিষবিধানে এর কোন প্রতিকার থাকলে বলো। তার ব্যবস্থাদি না করলে এদের সান্ত্বনা দেবো কি করে? বিধির বিধান মানতে হবে বাবা। তারপর বিধির যা ইচ্ছা।"

জ্যোতিষী ভদ্রলোক তিনদিন চণ্ডীপাঠ শ্রবণ, হোম, স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে বললেন। শ্রীমা ২৯ জানুয়ারি রাত ১১টায় কোয়ালপাড়ায় পৌঁছান এবং জ্যোতিষীর নির্দেশমত গ্রহশান্তির সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাধুর ইচ্ছানুযায়ী তখনকার মতো কোয়ালপাড়ায় জগদম্বা আশ্রমেই সকলের থাকার ব্যবস্থা হল।

১। শ্রীমতী মন্দাকিনী রায়ের স্বামীগৃহ ছিল. গোঘাট থানার অন্তর্গত নবাসন গ্রামে। নিঃসন্তান এই মহিলা বিবাহের অল্পদিনের মধ্যে বিধবা হন। সারদাদেবীর কাছে দীক্ষা লাভ করে তাঁরই সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে ইনি নবাসনের বৌ নামেই পরিচিত।

এদিকে রাধুর মধ্যে ক্রমশঃ উন্মাদনার লক্ষণ পরিস্ফুট হতে লাগল। সংবাদ পেয়ে শরৎ মহারাজ কাশীতে সরলাদেবীর কাছে সংবাদ পাঠালেন, যেন তিনি পত্রপাঠ চলে আসেন কারণ তাঁকে জয়রামবাটী যেতে হবে। চিঠি পেয়েই সরলাদেবী কলকাতায় এলেন এবং সেখান থেকে কোয়ালপাড়ায়। কোয়ালপাড়া তখন জমজমাট—শ্রীমা তো আছেনই, তাঁর সঙ্গে আছেন রাধু, নলিনী, মাকু, ভূদেবের স্ত্রী, সুরবালা, নন্দরানী, যুগল, ভোলা ও যামিনীর দুই বোন।

সরলাদেবী পৌঁছে দেখেন সারদাদেবীর আবাব জ্বর হয়েছে। ওদিকে রাধু ও মাকু সন্তানসম্ভবা এবং রাধুর আচরণ অস্বাভাবিক। সে গোলমাল সহ্য কবতে পারে না, যার জন্য আশ্রম থেকে একটু দূরে একখানা ঘর তৈরী করে তাকে রাখা হয়েছে। ঘরে রাধু শুত আর বাবাগুায় নবাসনেব বৌ (মন্দাকিনী বায়) এবং যামিনী। রাধু গায়ে জামাকাপড় কিছুই রাখতে পারত না—তাকে স্নান—আহার সবই করিয়ে দিতে হত।

সরলাদেবী পৌঁছবার দু'একদিন পরে শ্রীমায়ের জ্বর ছাড়ল। ইতিমধ্যে একদিন নলিনী ঝগড়া করে মাকু ও তার শিশুপুত্র ন্যাড়াকে নিয়ে চলে গেল জয়রামবাটীতে। ২০ এপ্রিল মাকুর এই শিশুপুত্রটি মারা গেল এবং ৭ মে রাধুর প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

জুন মাসের শেষে সুধীরাদেবী সরলাকে কলকাতায় ফিরে যেতে লিখলেন। রাধুর শিশুপুত্রের বয়স হয়েছে তখন প্রায় তিন মাস। সুধীরাদেবীর চিঠির কথা শুনে সারদাদেবী বললেন, 'সুধীরা যখন লিখেছে তখন তোমরা এস মা।' স্বামী হরানন্দ ও শান্তানন্দ গিয়েছিলেন মাতৃদর্শনে—শ্রীমা তাঁদের ওপর ভার দিলেন বিষ্ণুপুর থেকে টিকিট কেটে সরলাদেবী ও যুগলকে ট্রেনে তুলে দিতে।

সরলাদেবী ফেরার সময় শ্রীমা কান্নায় ভেঙে পড়লেন, বললেন, "মা, দেখে গেলে তো! শরৎকে বোলো আমি কি অবস্থায় আছি।"

২০ জুলাই (১৯১৯) শ্রীমা'র জয়রামবাটী ফেরার দিন স্থির হল কিন্তু যাত্রার পূর্বক্ষণে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল, সুতরাং সেদিন যাত্রা স্থগিত রেখে ২৩ জুলাই রাধু ও তার পুত্রসন্তানটিকে নিয়ে জয়রামবাটী ফিরে গেলেন। যাত্রার পূবে কেদারবাবু প্রণাম করে মাকে বললেন, "মা, এরা [আশ্রমস্থ কর্মীগণ] সব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন চোখ ফুটেছে, আমার কথা আর সবসময় মেনে থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ ও আপনাদের কাছে গেলে আপনারা আদর-যত্ন করে কাছে রেখে দেন, ভাল খাবার-থাকবার সুবিধা পায়, বেশি কাজ করতে হয় না, তা মা, আপনারা যদি একটু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন, তবে বাধ্য হয়ে এখানেই থাকবে।" কেদারের কথার প্রতিবাদ করে সারদাদেবী বললেন, 'সে কি গো কেদার? ওসব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। এই

ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আর আমি মা, আমার কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়াপরার খোঁটা দিয়ে কি করে বললে, বলো দেখি?'

জয়রামবাটীতে তখন সারদাদেবীর সংসার সুবৃহৎ—নিজের স্বজন ছাড়াও সাধু-ভক্ত সেবকরা মিলিয়ে ১৫/২০ জন। সে সময় চিঠি-পত্রের উত্তর তাঁর নির্দেশমত লিখে দিতেন স্বামী ঈশানানন্দ। একদিন সারদাদেবীকে চিঠি শোনাতে শোনাতে তিনি বললেন, 'মা, কই আমার তো জপ ধ্যানে তেমন মন বসছে না, জপধ্যান তেমন করতেও পারছি না।' শ্রীমা গম্ভীরভাবে বললেন, 'জপধ্যান লোকে করে কেন বলো দেখি?' ঈশানানন্দকে নির্বাক দেখে শ্রীমা বললেন, 'এ সব ছেলেদের চিঠিপত্র শুনে মন আবার চঞ্চল করছ তো? এমনি বসে জপধ্যানের চেয়ে ঢের বেশি হচ্ছে, মন খারাপ করোনি। সময়ে সব বুঝতে পারবে। ঠাকুর তোমাদের ইহকাল পরকাল সব দেখছেন। এখানে আমার এ কাজগুলি তোমরা না হলে একদণ্ড চলে কই?"

এই বৎসর দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে সারদাদেবীর ভ্রাতা প্রসন্নকুমারকে যজন-যাজন কাজের জন্য কলকাতা যেতে হয় কিন্তু তাঁর ভয় ভ্রাতা কালীকুমারের জন্য। কালীকুমার শ্রীমায়ের কাছে থাকার সুযোগ পাবেন, হয়ত তিনি মায়ের স্নেহ-অনুকম্পা এর মধ্যে দখল করে নেবেন এবং তাঁর দাক্ষিণ্যলাভও করবেন। তিনি স্পষ্ট কবে সেটা উল্লেখ করতেই দু'ভায়ে শুরু হল বচসা—কে কতখানি শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা করেছেন, কতখানি সারদাদেবীকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন তার নানাবিধ বর্ণনা। শ্রীমা উভয়ের বাদানুবাদ শুনে মৃদু হেসে বললেন, "ভাইগুলি আমার রত্নই বটে! ওরা গলাকাটা তপস্যা করেছিল বলেই আমি ওদের সংসারে পড়ে আছি। এত অশান্তি ও আসক্তি আর দেখিনি বাবা!"

দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন শ্রীমা সদ্য আহরিত কয়েকটি পদ্ম সমেত একটি থালাতে ফল-মিষ্টি-সিঁদুর সাজিয়ে বরদা মহারাজকে (স্বামী ঈশানানন্দ) পাঠালেন সিংহবাহিনীর পূজা দিতে। ঈশানানন্দজী থান ধুতি পরে সেগুলি নিয়ে যাবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছেন তখন শ্রীমা বাধা দিয়ে বললেন, "ও কি! সাদা পেড়ে কাপড় কেন পরেছ? তোমরা ছেলেমানুষ, পাড় দেওয়া কাপড় পরবে। নইলে মন বুড়ো হয়ে যাবে। মনে সর্বদা উৎসাহ রাখতে হয়। মন বুড়ো হলেই সব শেষ হয়ে যাবে।" নিজের ট্রাঙ্কটি নামিয়ে তিনি লাল নরুন পাড় কাপড় বার করে দিলেন।

ঐদিনই সন্ধিপূজার সময় সারদাদেবী তক্তপোষের উপর বসে পা ঝুলিয়ে সকল ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। সকলের পূজা শেষ হবার পর তিনি আদেশ দিলেন—'আরও ফুল আনো। রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন (যোগীন-মা), গোলাপ—এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেরা, যে যেখানে আছে সকলের হয়ে ফুল দাও।' তারপর জোড়হাতে

শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হোক। ঠাকুর, তুমি সকলকে দেখো।'

এর আগে সারদাদেবী যখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন তখন রাধুর জন্য তাঁর বিপুল খরচের পরিমাণ দেখে তাঁর দক্ষিণদেশীয় ভক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার ১০০ টাকা করে সাহায্য করতেন। যাবার সময় তিনি শ্রীমাকে অনুরোধ করে যান যে টাকার প্রয়োজন হলে শ্রীমা যেন নির্দ্বিধায় তাঁকে জানান— তিনি টাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু শ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের নিষেধের কথা সব সময় স্মরণ রেখেছিলেন ('কারো কাছে একটি পয়সার জন্যও চিৎহাত কবো না') এবং আর্থিক অনটন সত্ত্বেও আয়েঙ্গারকে সে-কথা জানাননি। ওদিকে তখন শরৎ মহারাজও টাকা সংগ্রহ করে প্রয়োজনের সময় পাঠাতে পারেন না—প্রায়ই বিলম্ব হয়—শ্রীমায়ের সুবৃহৎ সংসারে তখন রীতিমত আর্থিক অস্বচ্ছলতা। বিজয়ার পর তুলসী মহারাজ [স্বামী নির্মলানন্দ] বাঙ্গালোর থেকে শ্রীমাকে প্রণাম জানিয়ে পত্র দিলে শ্রীমা বরদা মহারাজের উপর ভার দিলেন আশীর্বাদ জানাতে। বরদা মহারাজ সেই আশীর্বাদ সূচক পত্রের মধ্যেই শ্রীমায়ের তৎকালীন আর্থিক অবস্থার কথা তুলসী মহারাজকে জানান এবং আয়েঙ্গার তুলসী মহারাজের কাছে খবর পেয়ে তখন থেকে নিয়মিত মাসিক আর্থিক সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেন।

বিজয়ার পর কোয়ালপাড়া থেকে কেদার মহারাজ শ্রীমাকে প্রণাম করতে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে—যাদের অবস্থা ভাল তারাও সব ওষুধ নিতে আসে। আমরা তো গরীবদের জন্যেই করেছি। যাদের অবস্থা ভাল তাদের কি ওষুধ দেওয়া উচিত?'

একটু চিন্তা করে সারদাদেবী উত্তর দিলেন, 'বাবা, এদেশে সকলেই গরীব। তবে ওরা এ সব [দরিদ্রদের জন্যই ওষুধের ব্যবস্থা] জেনেশুনেও যদি প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়, সামর্থ্য থাকলে দেবে বইকি। যে প্রার্থী, সেই গরীব।'

কেদার মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'মা, এবারে ঠাকুর কি একটা নতুন ভাব দেবার জন্যে এসেছিলেন—সর্বধর্ম সমন্বয় করে গেলেন?'

সারদাদেবী বললেন, 'দেখো বাবা, তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু আমার মনে হয় নাই। তিনি সর্বদা ভগবদ্ভাবেই বিভোর থাকতেন।... তবে কি জানো, বাবা, এই যুগে, এই কালে তাঁর ত্যাগই হল আদর্শ।... ও রকম সহজ ত্যাগ কি আর কখনো কেউ দেখেছে?'

নলিনী, মাকু প্রমুখ মেয়েদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়েছে—অপবাদের মধ্যে কোন অপবাদ ভাল। মীমাংসার জন্য সকলে উপস্থিত হলেন পিসিমা অর্থাৎ সারদাদেবীর কাছে। হাসতে হাসতে বললেন শ্রীমা, 'অপবাদের আবার ভাল মন্দ

কি ?' 'না, তার মধ্যেও তো তারতম্য আছে'—ভ্রাতুষ্পুত্রীদের যুক্তি। সারদাদেবী রায় দিলেন, 'ধনের অপবাদই ভালো। কোন লোককে যদি বলা যায়, উনি বেশ ধনী লোক, সে কথা শুনে প্রথমটায় মুখে দীনতা বা অসন্তোষ যাই দেখাক না কেন, তার অন্তরটি বেশ খুশি হয়।'

(এবার সারদাদেবীর প্রশ্নের পালা, 'আচ্ছা, তোরা বল দেখি নলিনী কোন জিনিষটি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় ?' নলিনী বললেন, 'কেন পিসিমা, মানুষ যাতে সুখে থাকতে পারে, আর এই জ্ঞানভক্তি—এই সব প্রার্থনা করতে হয়।' শ্রীমা ধীরে ধীরে বললেন, "সে তো হলো, কিন্তু এককথায় বলতে গেলে তাঁর কাছে অন্তর থেকে 'নির্বাসনা' প্রার্থনা করতে হয়। কেন না, বাসনাই হল সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্মমৃত্যুর কারণ আর মানুষের মুক্তিপথের অন্তরায়।"

বরদা মহারাজ এই সময় একদিন সারদাদেবীকে প্রশ্ন করেন, "মা কেদার মহারাজ বলেন, এ সব কাজকর্মে খুব খাটো, তাহলেই যা হবার তা আপনি হবে।"

উত্তরে শ্রীমা বলেন, "কাজকর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভালো থাকে। তবে কি জানো—জপ-ধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্তত সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হল যেন নৌকোর হাল। সন্ধ্যার সময় একবার একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম, তার একটা হিসেব আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যানে প্রথমে মুখখানি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপ-ধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে ?"

বরদা মহারাজ বললেন, "কেউ কেউ আবার বলেন কাজকর্মে কিছুই হবে না, সর্বদা জপধ্যান সাধন-ভজন করতে পারলেই সব হবে।"

শ্রীমা'র উত্তর—"তারা সব কি করে বুঝলে—কি করলে হবে আর কি করলে হবে না ? দিনকতক একটু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল ? দেখো, আসল কথা কি জানো—মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই কিছু হবার নয়। একমাত্র তাঁর কৃপাতেই সব হয়। সেদিন দেখলে তো, একজন জোর করে জপধ্যান বেশি করে করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন ! মাথাটি যদি বিগড়ালো তো আর রইল কি ? ইস্ক্রুপের প্যাঁচের একটু এধার আর ওধার। এক প্যাঁচ একটু আলগা হলেই হয় পাগল, আর না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভেবে মনে করে বেশ আছি। আর উলটো দিকে এক প্যাঁচ কষা হলেই ঠিক পথে চলে, শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্বদা তাঁকে স্মরণ-মনন করে প্রার্থনা করতে হয় 'প্রভু, সদ্বুদ্ধি

দাও।' সব সময় জপধ্যান করতে পারে ক'জন? প্রথমটা একটু সাধনভজন করে, শেষে... বসে থেকে থেকে আসনের গরম মাথায় ওঠে, অহঙ্কার হয়।... মনটাকে শুধু বসিয়ে না রেখে, আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভালো। মন আলগা পেলেই যত গোল বাঁধায়। নরেন আমার এসব দেখেই তো এইসব কাজের পত্তন করলে।")

সম্ভবত নভেম্বর মাস (১৯১৯)—একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর সারদাদেবী সকলের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। একদিন বরদা মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "মা, মহাপুরুষদের সেবকগণের অনেক সময় কেন দুর্বুদ্ধি এসে পড়ে?"

উত্তরে সারদাদেবী বললেন, "দেখো, সেবা-অপরাধ একটা আছে বটে, সেটা হল সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে গুরুকে পুতুলের মত নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে—সবটাতেই কর্তামি করে; সেবার ভাব আর থাকে না। অহঙ্কার হয়, নিজ অধিকাব ভুলে যায়। দেখো, যারা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের মনে করে অতি আপনার জন ভেবে তাঁর সেবা করে, তাঁদের ও রকম হবে কেন? আর পতনের কথা বলছ? অনেক সময় সব সিদ্ধ মহাপুরুষ বা অবতারদের সঙ্গে তাদের চারদিকে একটা ঐশ্বর্যের ছটা থাকে। তাই দেখে অনেকে তাদের সেবা করতে এসে তাতেই মত্ত থাকে, আর পরে তাতেই ডুবে মরে। ঠিক ঠিক তাঁদের সেবা করে ক'জন বলো?

"কথায় আছে, পুকুরে পূর্ণিমার চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে পুকুরের ছোট ছোট মাছগুলি আনন্দে লাফালাফি করে সমস্ত রাত্রি খেলা করছে। তারা ভাবছে চাঁদ বুঝি আমাদেরই একজন, কি মজা! কিন্তু যখন চাঁদ ভোরবেলা অস্ত গেল, তখন তাদের সেই পূর্বাবস্থা। সমস্ত রাত লাফালাফিতে অবসাদ এলো—কিছুই বুঝতে পারলে না।"

১৬ ডিসেম্বর (১৯১৯) সারদাদেবীর জন্মতিথি পালনের যথাবিধি ব্যবস্থা হল। শরৎ মহারাজ শ্রীমায়ের জন্য একখানি কাপড় ও সাদা গরমের চাদর পাঠালেন—যোগেন-মা বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন, গায়ের কাপড়টি কাউকে বিতরণ না করে যেন তিনি নিজেই সেটি ব্যবহার করেন। শ্রীমা স্নানান্তে সেই কাপড়টি পরে ঠাকুরের পূজা করলেন—তারপর সকলে তাঁর পায়ে অঞ্জলি প্রদান করলেন। বিকাল থেকে শুরু হল জ্বর। সেই জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল, দু'দিন যদি বা ভাল থাকেন, বেশির ভাগ সময়ই তিনি জ্বরে ভুগতে শুরু করলেন। কিন্তু এর মধ্যেও তাঁর কৃপাবিতরণের কামাই নেই। একদিন একটি ছেলে এলো—জাতিতে বাগদি। সে মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে চায়। শ্রীমা বললেন, 'তোমাদের কুলগুরু আছেন তো? আর এতো তাড়াতাড়িই বা কেন?

আমার শরীর ভাল নয়। এখন বড় ঝামেলায় আছি। না হয় কলকাতা গেলে তখন সেখানে দীক্ষা হবে।' ছেলেটি কিন্তু শ্রীমায়ের শরীর বা তাঁর কথা মোটেই চিন্তা করল না, বলল, "হ্যাঁ, মা, বুঝতে পেরেছি, আমি বাগদির ছেলে কি না তাই, 'বাগদির মা' হতে কিন্তু করছেন। কিন্তু সেই তেলোভেলোর মাঠে আপনার 'বাগদির মেয়ে' হতে কিছুই বাধে নাই।" শ্রীমা হাসলেন, বললেন, "আচ্ছা বাবা, কাল সকালে স্নান করে তৈরী থেকো। ঠাকুরের পূজার পর এরা তোমাকে ডেকে আনবে।" ছেলেটির পরদিন দীক্ষা হয়ে গেল।

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি একদিন শ্রীমায়ের দুই ভ্রাতা কালীকুমার ও বরদাপ্রসাদের মধ্যে বেড়া দেওয়া নিয়ে ঝগড়া আর উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। অসুস্থ শ্রীমা উভয়কেই শান্ত করার চেষ্টা করছেন—তখন উপস্থিত ভক্তেরাও উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনক্রমে তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন। ভক্তদের অনুরোধে শ্রীমা বাড়ির ভিতরের রোয়াকে গিয়ে বসে হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এ সব পড়ে থাকবে। জীব এটুকু বুঝতে পারে না" বলতে বলতেই শুরু হল আবার হাসি—সে হাসি আর থামে না!

রাঁচীর ভক্তেরা মায়ের জন্মস্থান চিহ্নিত করার জন্য দু'টি পাথর এনে রেখেছিলেন কিন্তু চিহ্নিতকরণ সম্ভব হয়নি প্রধানত কালীকুমারের আপত্তিতে। এই অংশটি ছিল সারদাদেবীর ভ্রাতাদের এজমালি সম্পত্তি। এই সময় হঠাৎ একদিন পাথর দুটি দেখে কালীকুমারই প্রস্তাব করলেন, "দিদি, আমার অংশটি আমি এখনই লিখে দিচ্ছি, আর সব তুমি দেখ দিকি। আমাকে যা দিতে হয় শরৎ মহারাজ দিবেন। আমার কিন্তু মনেপ্রাণে ইচ্ছা এক্ষুণি ওটির একটি ব্যবস্থা হয়।"

সেইদিনই সন্ধ্যায় বরদা মহারাজকে ডেকে শ্রীমা নির্দেশ দিলেন, "কালীর যখন সুমতি হয়েছে তখন মনে হয় আর দেরি করা উচিত নয়। প্রসন্ন এইসময় কলকাতায় আছে। বরদার অমত হবে না। সব বিষয়ে বাগড়া দিত কালী—ও যখন আপনা থেকে ওটির উত্থাপন করলে, তখন বুঝতে হবে ওটি এখন হয়ে যাবে। দেখলে না, সেবারে নারায়ণ আয়েঙ্গার সামনে কূয়ো করে দেবে বলে কতো সাধ্য সাধনা করলে, তা কিছুতেই ও মত করলে না। ওটি হলে ওদের সকলেই জল খেত, এটি আর মাথায় এলোনি। এখন যখন সুমতি হল, তাড়াতাড়ি শরৎকে লিখে দাও।" স্বামী সারদানন্দকে চিঠি লেখার পর কালীকুমারকে সে কথা জানানো হলে তিনি ধরে বসলেন, "এজমালে যা জমির মূল্য ধার্য হবে, আমাকে কিন্তু আলাদা করে কিছু দিতে হবে।"

শরৎ মহারাজ কিছুদিনের মধ্যে দলিল রেজেস্ট্রি করে নিলেন। তিন ভাই-ই এজমালি জমির জন্য ন্যায্য দামের অতিরিক্ত আলাদা আলাদা অর্থ আদায়

করলেন মোট ১০০ টাকা। শ্রীমায়ের ইচ্ছামত জমির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে কূপ খনন করাও হয়েছিল কিন্তু সারদাদেবী তখন শেষবারের মত কলকাতায় অবস্থান করছেন।

সারদাদেবীর অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়ছে। প্রায়ই জ্বর হচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে দুর্বলতা। তার ওপর সাংসারিক অশান্তি তাঁর নিত্যদিনের সাথী। সেদিন দুপুরে নবাসনের বৌ ও নলিনীর মধ্যে কথা কাটাকাটি—নবাসনের বৌয়ের একটা রূঢ় কথা শ্রীমার কানে গেল, বললেন, "ও কি গো, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব হয়ে যাবে। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না, বিশেষ করে মেয়েমানুষের। ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়—তুমি অমন খোঁড়া হলে কেন? তবে তাকে বলতে হয়—তোমার পাটি এমন খোঁড়া হল কি করে।... সব একটু সহ্য করে চলবে মা। সহ্য করার সমান গুণ নেই।"

শ্রীমা জ্বরে শয্যাশায়ী। বাড়ির মধ্যে ঝি-এর সঙ্গে রাধু উচ্চ কণ্ঠে ঝগড়া করছে। শ্রীমা করুণ কণ্ঠে বার বার সতর্ক করছেন—"রাধি, মিষ্টি কথা বল, রাধি, মিষ্টি কথা বল, রূঢ় কথা বলিসনি।"

আর একদিনের কথা। রাধু, মাকু, নলিনী প্রভৃতি মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে হৈ-চৈ শুরু করেছেন। শ্রীমা বললেন, "ও কি হচ্ছে তোদের? তোদের একটু লজ্জাসমীহ নেই। মেয়েদেব ও-সব বাড়াবাড়ি ভালো নয়। মেয়েমানুষকে কত সাবধানে চলাফেরা করতে হয়, সম্ভ্রম রেখে চলতে হয়। কথায় বলে মেয়েদের হাঁটুর কাছে কাপড় উঠলে 'দশ-হাত কাপড়ে ন্যাংটা'। লজ্জাশরম বজায় রেখে চলতে হয়।" মেয়েদের মধ্যে একজন যুক্তি দেখালো—"ঠাকুর তো বলেছেন, লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, তিন থাকতে নয়।" শ্রীমা প্রতিবাদ করে বললেন,"না, না। সে যাঁরা ভগবৎ প্রেমে পাগল, তাঁদের কথা [গৌরী-মাকে এই পর্যায়ে গ্রহণ করতেন তিনি]।আমি বলছি, লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে হয়। যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়ে-মানুষদের।"

ক্রমশঃ তাঁব দৈনিক পূজা করাও বন্ধ হয়ে গেল—প্রত্যহ সকালে স্নান করা আর সম্ভব নয়। নিজেই বরদা মহারাজকে শিখিয়ে দিলেন পূজাবিধি।

স্বামী সারদানন্দ ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় ফিরে সারদাদেবীর দীর্ঘ রোগভোগের খবর শুনে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ১৯২০-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি আত্মপ্রকাশানন্দজী ও অপর দু'জনকে জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিলেন যত শীঘ্র সম্ভব সারদাদেবীকে কলকাতায় নিয়ে আসার জন্য। যাত্রার ব্যবস্থা সত্বরই হল। ২৪ ফেব্রুয়ারি তাঁর সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করলেন রাধু,

সুরবালা, নলিনী, মাকু, নবাসনের বৌ ও বরদা মহারাজ। আগে থেকে ঠিক ছিল শ্রীমা ও রাধু দুখানি পালকিতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যাবেন—অন্য সকলে হেঁটে আমোদর পার হয়ে গরুর গাড়িতে যাত্রা করবেন। কিন্তু যাত্রার মুহূর্তে রাধু জিদ ধরল সে এবং তার শিশুপুত্র পালকিতে যাবে না। শ্রীমা দ্বিরুক্তি না করে দ্বিতীয় পালকিতে মাকুকে তার শিশুপুত্রসহ তুলে নিয়ে যাত্রা করলেন। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বহু লোক তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য উপস্থিত হলেন—অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তাঁরা বললেন 'শরীর সেরে শীগগির ফিরে এসো।' ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন, 'সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, তোমাদের কি ভুলতে পারি?' ঠাকুরের ছবিখানি কাপড়ে জড়িয়ে বাক্সে তুলে তিনি সদরদরজা পার হয়ে সিংহবাহিনী ও গ্রামের অন্যান্য দেবদেবী উদ্দেশে শেষ প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে গ্রামের বাইরে এসে পালকিতে আরোহণ করলেন। গ্রামে সিংহবাহিনী দেবীর অবস্থানের জন্য গ্রাম থেকে অন্যত্র যাত্রাকালে তিনি কখনই গ্রামের মধ্যে শিবিকায় উঠতেন না। সারদাদেবী পথে ঘোষপাড়ায় যাত্রাসিদ্ধিরায়কে প্রণাম করলেন, তারপর আহের দীঘির পাড়ে পালকির কাছে উপস্থিত হয়ে জোড় হাতে ভূমিস্পর্শ করে বললেন, 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী?' ধীরে ধীরে পালকিতে উঠে শেষবারের মত জয়রামবাটীকে দর্শন করলেন। পালকিবাহকেরা এবার চলল বিষ্ণুপুর অভিমুখে। বিদায় জয়রামবাটী!

শিহরে পৌঁছে সারদাদেবী পালকি থেকে নেমে শিবকে প্রণাম করলেন এবং দু'টাকার সন্দেশ, চিনি ও সরাগুড় দিয়ে পূজা দেওয়ালেন। বেলা ১১টায় সকলে এসে পৌঁছলেন কোয়ালপাড়ায়। বরদা মহারাজের এখানে এসে খেয়াল হল পাথেয় খরচ তিনি ভুল করে কালীকুমারের বাড়ি ফেলে এসেছেন। শ্রীমাকে কিছু না-জানিয়েই তিনি তখনই ছুটলেন জয়রামবাটী। এদিকে শ্রীমা একটি কালো ডুরে মশারী খুঁজে পাচ্ছেন না—তার জন্য অনুসন্ধান করছেন বরদা মহারাজের কিন্তু তাঁর খোঁজও কেউ জানাচ্ছেন না। অনেক পরে বরদা মহারাজ টাকা নিয়ে ফিরে আসতেই মায়ের প্রশ্নের উত্তরে বরদা মহারাজকে বলতেই হল তাঁর অনুপস্থিতির কারণ। মশারী কিন্তু পাওয়া গেল না। শ্রীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এবার দেখছি সবই অমঙ্গলের লক্ষণ।'

স্থির হল বিকালে পাঁচখানি গরুর গাড়িতে সকলে রওনা হবেন—কেবল শ্রীমা ও মাকুর পালকি পরদিন সকালে। সারদাদেবী অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্য প্রসন্নকুমারের লাঠিটি সঙ্গে এনেছিলেন, তার ওপর ভর দিয়ে চলার জন্য। এবার গগন মহারাজকে লাঠিটি দিয়ে সেটি প্রসন্নকুমারকে ফেরৎ দিতে বললেন। কোয়ালপাড়া থেকে যাত্রার মুহূর্তে তিনি অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'বাবা, শরৎ রইল।' আকস্মিক এই কথাতে সকলেই বিমূঢ়।

জয়পুরে এসে কিছুক্ষণ যাত্রা বিরতি। একটি কম্বল বিছিয়ে মাটিতে বসে সারদাদেবী দুটি টাকা দিলেন বেহারাদের—মুড়ি খাওয়ার জন্য। মাকুর ছেলের জন্য দুধ গরম করে তাকে খাওয়ানো, মাকুর জন্য মুড়ি তেলেভাজা এবং নিজের জন্য এক পয়সার মুড়ি আনিয়ে মোটামুটি সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা হল। নিজে অল্প দুটি মুড়ি খেয়ে বাকিগুলি অন্যদের দিযে বললেন, 'আর চিবুতে পারি না।'

বেলা দুটোর সময় তাঁরা পৌছলেন বিষ্ণুপুরের গড়বাজারে—সুরেশ্বর সেনের বাড়ি। কিছুদিন আগে সুরেশ্বর পরলোকগমন করেছেন—তাঁর কথা স্মরণ করে শ্রীমা বললেন, "আহা আমি এখানে এলে সুরেশ আমার সর্বদা জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকত—বারান্দায় পর্যন্ত উঠত না—কি ভক্তিই ছিল, সুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরিশবাবু।" সেইদিন ও তারপরের দিন বিষ্ণুপুরে কাটিয়ে তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে আহারাদি সেরে সকলে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে কলকাতা যাত্রা শুরু করলেন। হাওড়া স্টেশনে কিরণচন্দ্র দত্তের ঘোড়ার গাড়ি শ্রীমায়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। অন্য সকলেও ৩/৪ খানি ঘোড়ার গাড়ি করে উদ্বোধনে পৌঁছলেন ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাত তখন প্রায় ১০টা।

॥ ২১ ॥

"কি মাকেই তোমরা নিয়ে এলে গো! ভূতের মত কালো, কেবল চামড়া আর হাড় ক'খানি এনে হাজির করলে গো! মায়ের শরীর যে এত খারাপ তা তো আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।" যোগীন-মা যেন আঁৎকে উঠলেন সারদাদেবীকে দেখে।

পরদিন থেকেই শুরু হল তাঁর চিকিৎসা। শরৎ মহারাজ সরলাদেবীকে ডেকে তাঁর হাতেই দিলেন মায়ের সেবার ভার। ডাঃ কাঞ্জিলাল শুরু করলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা—কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না দেখে ১২ মার্চ তৎকালের প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির উপর চিকিৎসার ভার ন্যস্ত হল। তাঁর চিকিৎসায় পনেরো দিন জ্বর বন্ধ হল বটে কিন্তু আবার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। তার ওপর আবার নতুন বিপত্তি—কবিরাজ মহাশয় যে পাঁচনটির ব্যবস্থা করেছিলেন যেটার স্বাদ এতো বিশ্রী ও তিক্ত যে দুপুরের আহার পর্যন্ত মুখ তেতো হয়ে থাকে—শ্রীমা কিছুই খেতে পারেন না। এই পাঁচনটি খেতে তাঁর তীব্র আপত্তি। শ্যামাদাসবাবুকে সেকথা জানাতে তিনি বললেন, 'এ অসুখে তিক্ত ছাড়া কোন ওষুধ নেই।' উপায়ান্তর না দেখে ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা, ডাঃ বিপিনচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে।

এই সময় একদিন বিকালে কয়েকজন স্ত্রীভক্ত এলেন সারদাদেবীকে দর্শন করতে। তাদের মধ্যে একজনের অলঙ্কার ও বেশভূষা বেশ পরিপাটী—স্বভাবও চঞ্চল। শ্রীমা তাদের বললেন, "দেখো, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হল ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সবচেয়ে সার্থক। না হয়, গাছে ফুটে গাছেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমার দেখে বড় কষ্ট হয়—যখন বাবুরা ফুলটি কখনো তোড়া করে কখনো বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে 'বাঃ, বেশ তো গন্ধটি।' ও মা পরক্ষণেই হয়তো মেঝেয় ফেলে দিয়েছে! জুতোয় মাড়িয়েই হয়তো চলেছে, চেয়েও দেখলে না।"

একদিন সম্ভবত মার্চ মাসে (বাংলা চৈত্র মাসের প্রথম দিকে) এন্টালির অর্চনালয়ে উৎসব দেখতে যাওয়ার পথে রামলাল, লক্ষ্মীদেবী ও কৃষ্ণময়ীদেবী এসেছেন সারদাদেবীর কাছে। প্রসঙ্গক্রমে উঠল কামারপুকুরে ঠাকুরের জন্মস্থানে মন্দির নির্মাণের কথা। লক্ষ্মীদেবী প্রশ্ন করলেন, "ওখানে মন্দিরটি হলে আমাদের হেপাজতেই থাকবে তো? এদের ছেলেপুলেরাই সব পূজাদি করবে?" এ ব্যবস্থা

সারদাদেবীর ইচ্ছা-অনুসারী নয়, তিনি বললেন, "তা কি করে হবে? এরা সব সাধুভক্ত; এদের কি জেতের বিচার আছে? কতো দেশের লোক সায়েব-সুবো সব যাবে, ঐখানে থাকবে, প্রসাদ পাবে। আমাদের তো সব ভক্ত নিয়েই কারবার। আর তোরা হলি সংসারী, তোদের সমাজ আছে, ছেলেমেয়েদের বে-থা আছে। তোদের কি ওদের সঙ্গে থাকলে চলবে?"

তারপর নিজেই ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ঠিক করে দিলেন, "তোদের এখন যেমন ঘরগুলি আছে, ঐরকম করে, তবে করোগেটের ছাউনি দিয়ে, যুগীদের খামারের কাছে, আর নয়তো পশ্চিমদিকে যেখানে হয় একটু জায়গা নিয়ে আলাদা বাড়ি করে দেবে।"

লক্ষ্মীদেবী বললেন, "তবে রঘুবীর, শীতলা কি ঠাকুরের যে মন্দির হবে, তাতেই থাকবেন?"

শ্রীমা বললেন, "তা কি হয়? ও তোদের গৃহদেবতা; পালাপার্বণে তোদের বৌ-ঝিরা সব পূজা অর্চনা করবে। তা হয় না। রঘুবীর, শীতলার জন্যে আলাদা একটি ছোট পাকা মন্দির করে দেবে। পাশ দিয়ে একটু রাস্তা থাকবে। আর তুই, রামলাল বা শিবু যখন যাবি, তোরা মন্দিরেই ভক্তদের সংসারে থাকা খাওয়া করবি; তোদের আর কি?" এই ব্যবস্থা পরে রামলাল ও শরৎমহারাজ উভয়েই মেনে নেন।

ডাঃ বিপিনচন্দ্র ঘোষের চিকিৎসা চলল প্রায় একমাস কিন্তু সুফল কিছু দেখা গেল না। ১ মে (১৯২০) সারদাদেবীর চিকিৎসার ভার অর্পিত হল প্রাণধন বসুর উপর। রোগ নির্ণয়ের জন্য ডাঃ সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও নীলরতন সরকারকেও একদিন আনা হল। ১৬ মে প্রাণধন বসু জানালেন সারদাদেবীর কালাজ্বর হয়েছে। তখনকার দিনে কালাজ্বরের কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি, তারপর শ্রীমা ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করার ক্ষমতাও প্রায় নিঃশেষ। সুতরাং ভক্তেরা বুঝতে পারলেন এ যাত্রা তাঁর সেরে ওঠা প্রায় অসম্ভব কিন্তু তবু তাঁকে সারিয়ে তোলার চেষ্টার অন্ত নেই। ১ জুন বোঝা গেল, ডাক্তাররাও তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করেছেন। ঐদিনই কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেনকে আহ্বান জানানো হল, সঙ্গে রইলেন কালীভূষণ সেন।

এর মধ্যেও ভক্তগণের যাতায়াতের বিরাম নেই, তবে প্রায় সকলেই বাইরে থেকে মাকে দর্শন করে প্রণাম জানান। সেদিন এসেছেন অভিনেত্রী তারাসুন্দরী শ্রীমায়ের শরীর খুব দুর্বল, সেইজন্য মাঝের ঘরের মেঝেতে মেয়েদের সঙ্গে বসে বিশ্রাম করছিলেন। তারাসুন্দরী বাইরে থেকে মাকে প্রণাম জানালেন। যুক্তকরে দরজার কাছে বসে মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিলেন। শ্রীমা বললেন, "থিয়েটারে তো বেশ বল, এমন সেজেগুজে আসো, তখন তোমায় চেনাই যায় না। এখানে এমনি

একটু শোনাও দেখি।" মায়ের আদেশ পেয়ে জোড়হাত করে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে 'জনা' নাটক থেকে প্রবীরের বীররসাত্মক সংলাপের কিছু অংশ শোনালেন। শ্রীমা বললেন,'আর একদিন সময়-মতো এসো।' প্রণাম করে প্রসাদ গ্রহণ করে সেদিন তারাসুন্দরী ফিরে গেলেন। ক'দিন পরেই তিনি একদিন বিকালে ট্যাক্সি করে এসে উপস্থিত—ট্যাক্সি-বোঝাই জিনিসপত্র—দই, মিষ্টি, ম্যাঙ্গোস্টিন, লেবু, কলা, বাতাবি, আঙুর, আনারস, বেদানা, রজনীগন্ধার তোড়া, রাধু-মাকুর ছেলেদের জন্য পশমী জুতা ইত্যাদি। শ্রীমায়ের সামান্য জ্বর, তিনি নিজের ঘরে শুয়ে আছেন। তারাসুন্দরী পূর্বের মত ঘরে প্রবেশ না করে বাইরে থেকে সাষ্টাঙ্গে শ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মায়ের আদেশে তাঁর আনীত জিনিসগুলি মাঝের ঘরে রেখে দেওয়া হল। তারাসুন্দরী কিছু পরে প্রসাদ নিয়ে ফিরে গেলেন। শ্রীমা বললেন, 'দেখো তারার ঐ জিনিষগুলি ঠাকুরকে, এখানকার সাধুব্রহ্মচারীদের দিও না। রাধু, মাকু, ছোট বৌ এবং ঝি চাকর বামুন সকলকে কিছু কিছু দাও।' সকলকে দিয়েও অনেক জিনিস তখনও রয়ে গেছে মাঝের ঘরে। সন্ধ্যার পর ডাঃ প্রাণধন বসু শ্রীমাকে দেখতে এলেন। সারদাদেবী বরদা মহারাজকে বললেন, "তারাসুন্দরীর বাকি জিনিষ যা যা আছে সেগুলি ঐ বুড়োর (ডাক্তার) গাড়িতে সব তুলে দিয়ে এসো। ওরা ফুল খুব ভালোবাসে—ফুলগুলিও দিয়ে এসো।" ডাক্তার প্রাণধন বসু ছিলেন খ্রীস্টান। গাড়িতে ওঠার সময় ওই জিনিসগুলি দেখে তিনি খুব খুশি, প্রশ্ন করলেন, 'এসব কে দিলেন?' শরৎ মহারাজ উত্তরে বললেন, 'মা ঐগুলি আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' ডাক্তার খুশি হয়েই সেদিনের মত বিদায় নিলেন।

পরদিন রোগিণীকে দেখতে এসে তিনি সারদাদেবীর ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো ও অন্যান্য ছবিগুলি ভাল করে দেখে বাইরে এসে শরৎ মহারাজকে প্রশ্ন করলেন। 'আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি?' শরৎ মহারাজ উত্তর দিলেন, 'পরমহংসদেবের সহধর্মিনী আমাদের সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের।' ডাক্তারের পরবর্তী প্রশ্ন, 'চিকিৎসার এত খরচপত্রের অর্থ কোথা থেকে আসে?' সারদানন্দজী বললেন, 'ভক্তদের সহায়তায় ও আনুকূল্যে চলে যাচ্ছে। ডাক্তার বললেন, 'অ। তা এতোদিন বলোনি তো।' ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থাদি লেখার পর শরৎ মহারাজ ভিজিটের টাকা ও মোটর ভাড়া যথারীতি দিতে গেলেন কিন্তু ডাক্তার বললেন, 'তোমরা আজীবন অতি নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁর সেবা করে জীবন সার্থক করছ, আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে—শেষ জীবনে তাঁর একটু সেবা করার Chance (সুযোগ) দাও।' এর পর থেকে আর কোনদিন তিনি দর্শনী বা গাড়ি ভাড়া নেননি, এমনকি চিকিৎসক পরিবর্তন হলেও তিনি প্রায় নিত্যই আসতেন, ডাক্তারদের পরামর্শে যোগ দিতেন।

দৈবানুগ্রহ লাভের জন্যও কি কম চেষ্টা করেছেন সারদানন্দজী? মায়ের বাড়িতে কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা এবং কমলাত্মিকা—পঞ্চ মহাবিদ্যার অর্চনা এবং পাঁচগ্রহের পূজার ব্যবস্থা হয়। বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর কাছে শতরূপ চণ্ডীপাঠ হল। সবশেষে বারাসতের শ্মশানে একটি স্বস্ত্যয়নও করা হল (সম্ভবত মহাপুরুষ মহারাজের পরামর্শে)—কিন্তু সবই নিরর্থক। একদিন শ্রীমতী চপলা বসু শ্রীমাকে দেখতে এসেছেন, তিনি তাঁকে বললেন, 'মা কিছু জিজ্ঞাসা কোরো নি, এরা কি ওষুধ দিয়েছে তার গুণ থাকবেক নি।' শরৎ মহারাজ অবশ্য আগেই এ বিষয়ে শ্রীমতী বসুকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

শ্রীমার জ্বর অবিবাম—শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হচ্ছেন কিন্তু শরৎ মহারাজ হাল ছেড়ে দেওযাব পাত্র নন। বার বার চিকিৎসক পবিবর্তন হচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে চলছে শান্তি স্বস্ত্যয়ন কিন্তু কোন দিক থেকেই কোন আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যহ তিন-চার বার করে জ্বর আসে—সারা শরীরে অসম্ভব জ্বালা, বলেন, 'পানা পুকুরে গা ডুবিয়ে থাকব।' সেবক-সেবিকাবা ববফে নিজেদের হাত ঠাণ্ডা করে তাঁব গায়ে হাত বুলিযে দেন। দীর্ঘকাল অবিরাম অসুস্থতায় তাঁর স্বভাব হয়েছে অবুঝ শিশুর মতো। একদিন সকালে রাসবিহারী মহারাজকে বললেন, 'আমাকে কোলে করে বসো।' কাছেই ছিলেন সেবিকা সরলা দেবী—রাসবিহারী মহারাজ তাঁকেই বললেন, শ্রীমাকে কোলে করে বসতে। সবলাদেবী বিছানার উপর কয়েকটি বালিশ উঁচু করে তাতে হেলান দিয়ে শ্রীমাকে বসিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সরলাদেবী অক্লান্তভাবে সেবা করে চলেছেন—ওষুধ পথ্য সবই তিনি নিজের হাতে খাওয়ান—আর সময়মত তাপমাত্রা পরীক্ষা করেন। নবাসনের বৌ তাঁকে সাহায্য করেন। কবিরাজী চিকিৎসা চলছে—রান্না সব কিছু কাঠের জ্বালে। কিন্তু সারদাদেবীর মুখে আর রুচি নেই। প্রতিদিন সামান্য একটু পোস্ত ও আমরুল শাক পছন্দ করতেন। ভক্তেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরুল শাক সংগ্রহ করে আনে। সরলাদেবী প্রত্যহ তাঁকে দুধ খাওয়ান, থার্মোমিটার দেন—তাই নিয়ে প্রতিদিন অশান্তি। একদিন রাত্রি এগারোটার সময় শেষবারের মত দুধ খাওয়াতে গিয়ে রীতিমত বিপত্তি। শ্রীমা কিছুতেই দুধ খাবেন না। সরলাদেবী বললেন, 'তাহলে ডাকি মহারাজকে?' অন্যদিন এই শরৎ মহারাজকে ডাকার কথায় তিনি ভয় পেয়ে বালিকার মত দুধ খেয়ে নিতেন কিন্তু সেদিন তিনি মরীয়া হয়ে উঠেছেন, নির্ভয়ে বললেন, 'ডাক তোর মহারাজকে।' তখন সবাই শুয়ে পড়েছেন। শরৎ মহারাজ তাঁর ঘরের একপাশে মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে আছেন—সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়েও পড়েছেন। সরলাদেবী ডাকতে গিয়েও পারলেন না, ইতস্তত করে ফিরে এলেন। শ্রীমা বললেন, 'কি ডাকলি না?' তখন

আবার ফিরে গেলেন মহারাজের ঘরে—মাথার কাছে দাঁড়িয়ে খস খস আওয়াজ করতেই সারদানন্দজীর ঘুম ভেঙে গেল, তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সব শুনে তিনি মায়ের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীমা বললেন, 'কৈ শরৎ এলো ?'

সরলাদেবী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, মা, ঐতো আপনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।'

শ্রীমা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, 'কৈ ? এস বাবা, কাছে এসো, বসো। দেখত বাবা এত রাত্রে তোমাকে ডেকে তুলে কষ্ট দিলে।'

সারদানন্দজী শ্রীমায়ের কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'মা এবার একটু খাবেন ?' তাঁর সম্মতি পেয়ে তিনি বললেন, 'তবে সরলা খাইয়ে দিক।'

প্রবল আপত্তিতে উত্তেজিত সারদাদেবী—"না, ও খাওযাবে না। ও রাতদিন বলবে 'মা খাও' 'মা খাও' আব বগলে কাঠি [থার্মোমিটার] দাও। ও দুটোই শিখেছে। আমি ওর হাতে খাব না, তুমি আমায় খাইয়ে দাও।"

শরৎ মহারাজের সামনেও সারদাদেবী থাকতেন অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে—অন্যের মারফৎ কথা বলতেন। তার জন্য সারদানন্দজীরও ক্ষোভ বড় কম ছিল না, বলতেন, 'আমি যেন বেটীর শ্বশুর।' আজ জীবনের শেষলগ্নে তাঁর অনাবৃত রোগপাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দুধ খাওয়াতে বসে সারদানন্দজীর স্নায়ু দুর্বল হয়ে গেল—তিনি থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। ওদিকে সরলাদেবীরও তখন প্রবল অভিমান—তিনি কিছুতেই আর দুধ খাওয়াবেন না। ফিডিং কাপে দুধ ঢেলে তিনি শরৎ মহারাজের হাতে তুলে দিলেন। সাহস সঞ্চয় করে সারদানন্দজীও মায়ের মুখে ধীরে ধীরে দুধ ঢেলে দিতে লাগলেন—একটু পরে বললেন, 'মা একটু জিরিয়ে খান।'

খুশিতে শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারদাদেবীর। "দেখ দিকিনি কি সুন্দর কথা—'মা একটু জিরিয়ে খান।' এই কথাটি আর ওরা বলতে জানে না।"

দুধ খাওয়ানো শেষ করে মশারী ফেলে চারদিক ভালো করে গুঁজে দিয়ে সারদানন্দজী বললেন, 'মা, তবে আমি আসি।'

সস্নেহে সারদাদেবী বললেন, 'এস বাবা এস। আহা, বাছার আমার কত কষ্ট হল। ও-ই তো ডেকে আনলে। এস বাবা—দুর্গা, দুর্গা।'

এই ধরনের সাময়িক অবুঝ মনোভাব ও শিশুসুলভ জিদ সত্ত্বেও সারদাদেবী কিন্তু সাধারণভাবে আগের মতই স্বভাবজ স্নেহশীলা। এই ঘটনার পর সরলাদেবী স্থির করলেন, তিনি আর দুধ খাওয়াবেন না বা থার্মোমিটারও দেবেন না। অন্য কেউ এ কাজগুলি করবে। তিনি অন্তরালে থেকে গুছিয়ে দেবেন। শরৎ

মহারাজকে তিনি তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। তবে ভাত অবশ্য তিনিই খাইয়ে দেবেন। পরদিনটা এই ভাবেই গেল। শ্রীমা কিন্তু সব লক্ষ্য করছেন। সেদিন সরলাদেবী নবাসনের বৌয়ের ওপর কাজগুলি সমাধা করার ভার দিয়ে নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং-এ গেলেন, কয়েকটা কাজ সারতে। ভাত খাওয়াবার সময় সারদাদেবী স্নিগ্ধকণ্ঠে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি মা আমার ওপর রাগ করেছ।' উদ্গত অভিমান চেপে রেখে সরলাদেবী বললেন, 'রাগ করব কেন মা।' কথাটা শুনেই তিনি তাঁর রোগজীর্ণ হাত দুটি দিয়ে সরলাদেবীকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, 'তবে কেন দুধ খাওয়াচ্ছ না—বগলে কাঠি দিচ্ছ না? আমি মা অসুখে ভুগে ভুগে কেমন হয়ে গেছি। কখন কি বলে ফেলি ঠিক নেই। আমার কথায় রাগ করো না, মা।' চিরপবিচিত এই মাতৃস্নেহের অমৃতধারায় স্নাত সরলাদেবীর দু'চোখে তখন অশ্রুর প্লাবন—সে প্লাবনে তাঁর অভিমান ধুয়ে মুছে গেল।

শ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় মাতৃমন্দিরের অনেকেই তাঁর সেবিকার কাজ করেছিলেন—সুনন্দাদেবী তাঁদের অন্যতম। ইনি বাঙ্গালোর নিবাসী ডঃ পি. ভেঙ্কটরঙ্গমেব কন্যা। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। শ্রীমায়ের সেবিকারূপে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেনঃ

"মায়ের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে শুরু করল এবং তাঁকে সব সময় দেখাশুনোর জন্য একজন সেবিকার প্রয়োজন হল। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলাদেবী) মায়ের সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলেন। ইনি বিশেষ যত্নসহকারে ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন। মাতৃমন্দিরে আমাদের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন ইনি। মাতৃমন্দিরের মেয়েদের পালা করে মায়ের কাছে রাত্রি জাগার জন্য এবং তাঁর সেবা করার জন্য নিয়োগ করা হল। আমার সময় ছিল রাত দুটো থেকে ভোর চারটে। সেবার জন্য যাকে পাঠানো হত মা তাব নাম জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি আমাকে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে হাত বোলাতে বলতেন। আমরা সব সময় খুব সতর্ক থাকতাম। কারণ, সামান্য একটু শব্দ হলেই পাশের ঘর থেকে সারদানন্দের গলা শোনা যাবে, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করতেন, কি হয়েছে। এরকম এক রাতে মায়ের একটু বিকারের মত হয়েছিল। কখনও বলছেন বেলুড় মঠে যাবেন, কখনও বা বাঙ্গালোরে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললামঃ সেরে উঠুন তারপর ঐসব জায়গায় যাবেন। এই শুনে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। মা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকতেন বলে আমি মশারির মধ্যে ঢুকে মায়ের সেবা করতাম। বহুবার আমাকে তিনি বলেছেন তাঁরই সঙ্গে মাদুরে শুয়ে পড়তে। (যখন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁকে খাট থেকে মেঝেতে মাদুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।) যদিও এটা একটা মহাসুযোগ ছিল, তবুও সব সময়ই আমি ইতস্তত করতাম, মনে মনে খুব ভয় পেয়ে যেতাম। আমার সৌভাগ্য যে,

প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার সঙ্গে একই ঘরে থাকতে পেয়েছিলাম। মায়ের সেবা ও শুশ্রূষা করতেন বলে তিনি মায়ের নখ-কাটার সুযোগও পেতেন; সুযোগ পেতেন তাঁর গা-হাত-পা টিপে দেবারও। এই নখ-কাটার এবং গা-হাত-পা টিপে দেবার সুবাদে তিনি মায়ের নখ, চুল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রেখে দিতেন। ভারতীপ্রাণার সংগ্রহে মায়ের যে নখ চুল ছিল, সেগুলি তিনি, যখনই আমি অনুরোধ করেছি, তৎক্ষণাৎ আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। সেই পবিত্র স্মারকগুলি বর্তমানে বাঙ্গালোরে মাতৃমন্দিরে পূজিত হয়।...

"শ্রীমায়ের অবস্থা দিনের পর দিন খুব দ্রুতগতিতে খারাপ হয়ে চলল। মহাসমাধির তিনদিন আগে থেকে আমাদের আর তাঁর সঙ্গে থাকতে দেওয়া হল না। আমরা শুধু দর্শন করে মাতৃমন্দিরে ফিরে আসতাম।"

অসুখের খবর নিতে কবিরাজ মাতৃসকালে উপস্থিত হলে তিনি বলতে ভুলতেন না—'খেয়ে যাও, বেলা হবে।' কবিরাজেরা শ্রীমাকে দেখে নিচে নেমে যাবার পর উপস্থিত কাউকে ডেকে বলতেন, 'বুড়োর (কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন) নাতিকে (কবিরাজ কালীপদ সেন) জল খেতে দাও, সন্দেশ দাও, আম দাও।' ডাক্তার কাঞ্জিলাল, দুর্গাপ্রসাদ, শ্যামাদাস তাঁকে দেখতে এলে রোগিণীই আগে তাঁদের কুশল প্রশ্নটি করতেন। আরামবাগের প্রভাকর ও মণীন্দ্রবাবু তাঁকে দেখতে এসেছেন—তাঁদের কাছে খোঁজ নেবেন দেশের অবস্থার কথা, বৃষ্টি কেমন হয়েছে ইত্যাদি। মায়ের পরিচিত রমণীর মারফৎ মণীন্দ্রবাবু তালশাঁস পাঠিয়েছিলেন—সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, 'রমণী কখন এসেছিল জানি না, জ্বরে হুঁশ ছিল না—তাঁকে বলো সে যেন মনে দুঃখ না করে।' লাটু মহারাজ কাশীতে কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী—কাশী থেকে কেউ এলে প্রথম প্রশ্ন 'নাটু কেমন আছে।' (সারদাদেবী লাটু মহারাজকে বলতেন 'নাটু', ডাঃ কাঞ্জিলালকে 'কাঞ্জিনাল')।

সেই লাটু মহারাজ ২৪ এপ্রিল দেহত্যাগ করলেন। বলরাম বসুর পুত্র, শ্রীমায়ের আশ্রিত ভক্ত রামকৃষ্ণ বসুও ১৪ মে শ্রীরামকৃষ্ণ পাদপদ্মে বিলীন হলেন। দুটি অপ্রিয় সংবাদই গোপন রাখা হল কিন্তু শ্রীমায়ের বার বার প্রশ্নের জবাবে একদিন গোলাপ-মা বললেন, 'আর চেপে রেখে কি হবে? লাটু আজ ৮/১০ দিন হল মারা গেছে।' বেদনাহত শ্রীমার চোখে তখন অশ্রুর বন্যা। সেদিন রাতে তাঁর ঘুম হল না, অসুস্থতা বাড়ল। ২০ মে জয়রামবাটীতে বরদাপ্রসাদের মৃত্যু হল। আগে থেকে অসুখে ভুগছিলেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা মানিঅর্ডার করে পাঠানো হত। তাঁর মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চেপে রাখা হয়েছিল কিন্তু স্নেহময়ী দিদির অন্তরের মধ্যে সে কথা অপ্রকট রইল না। একদিন নিজেই বললেন, 'বরদা বুঝি নেই? দেখলুম বারান্ডায় রেলিং-এর

ধারে দাঁড়িয়ে আছে।' গোলাপ-মা তখন বললেন, 'যা হবার তা তো হয়ে গেছে। লুকিয়ে রেখে আর কি হবে। যে যাবার সে চলে গেছে।' শ্রীমা অস্থিরভাবে কেঁদে উঠলেন—পরক্ষণেই দুর্বলতায় ভেঙে পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। সকলে তাড়াতাড়ি তাঁকে বাতাস করতে শুরু করলেন। যোগীন-মা বললেন, 'মা, এই কয়দিন আপনার জ্বর বাড়ছে বলে শরৎ ও-সংবাদ আপনাকে জানাতে চায়নি, জ্বর একটু কমলে আপনাকে শোনাবে মনে করেছিল। বরদা [মহারাজ] সেই ২০ টাকা জয়রামবাটীতে কিশোরীকে পাঠিয়েছে—শ্রাদ্ধাদিতে খরচ হবে।'

মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু। সারা 'মায়ের বাড়ির' (উদ্বোধন) আবহাওয়া মৃত্যু-মৃত্যু সংবাদে ভারী হয়ে আছে—সেই সঙ্গে আসন্ন এক মহানির্বাণের ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। উদ্বোধনের সেই শান্তিপ্রদ আবেষ্টনী হারিয়ে যাচ্ছে—সর্বত্রই আসন্ন বিপৎপাতের লক্ষণ স্পষ্ট। সারদাদেবীও ধীরে ধীরে মনটিকে তুলে নিচ্ছেন পার্থিব জগৎ থেকে। একদিন একজন ভক্তকে ডেকে বললেন, 'মনে হয়, এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করার ছিল তা শেষ হয়েছে। এখন সর্বদা মনটা তাকে চায়, অন্য আর কিছু ভাল লাগে না। এই দেখ না রাধু—এতো ভালবাসতুম, ওর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কত করেছি, এখন ভাব উল্টে গেছে। ও আমার সামনে এলে ব্যাজার বোধ হয়, মনে হয়, ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নিচে নামাবার চেষ্টা করছে? ঠাকুর, তাঁর কাজের জন্য এতদিন এই সব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন, নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপব কি আমার থাকা সম্ভব হত?'

সারদাদেবীর মন ক্রমশঃ পার্থিব সম্পর্কেব উর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে—এতদিন যে সব খেলনা দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভুলিয়ে পৃথিবীর কর্তব্যভারে নিয়োজিত রেখেছিলেন, আজ সেগুলি তাঁর কাছে মাটির ঢেলা। এতদিন যারা তাঁর নিকট সান্নিধ্য পেয়ে এসেছে, যাদের জন্য তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করেছেন এখন তাদের আকর্ষণ আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই। তিরোভাবের কিছুদিন পূর্বে রাধুকে ডেকে বললেন, 'দেখ, তুই জয়রামবাটী চলে যা এখানে আর থাকিস নে।' সেবিকা সরলাদেবীকে বললেন, রাধুদের জয়রামবাটী পাঠাবার ব্যবস্থার জন্য শরৎ মহারাজকে বলতে। সরলাদেবী বললেন, 'কেন এদের পাঠিয়ে দিতে বলছেন। রাধুকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারবেন?' বিস্ময়কর সারদাদেবীর উত্তর—'খুব পারব, মন তুলে নিয়েছি।' এই সংবাদ পেয়ে যোগীন-মা এসে বললেন, 'কেন মা ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?' শান্ত কণ্ঠে শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'যোগীন, এর পর এদের সেখানেই থাকতে হবে যে। হরি (স্বামী হরিপ্রেমানন্দ) যাচ্ছে, ঐ সঙ্গে ওদের পাঠিয়ে দাও। মন তুলে নিয়েছি। আর চাই না।' অনুনয় করে যোগীন-মা বললেন, 'ওকথা বলো না, মা। তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে থাকব?' শ্রীমা উত্তর দিলেন সর্বরিক্ত বৈরাগিণীর কণ্ঠে 'যোগীন, মায়া

কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়।' এই সংবাদ শুনে হতাশ সারদানন্দজী বললেন, 'তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর ওপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন, তখন আর আশা নেই।' কত উৎপাত সহ্য করেছেন রাধু ও সুরবালার।—বাক্যযন্ত্রণা তো আছেই, দৈহিক নির্যাতনও ভোগ করেছেন কিন্তু ওই মায়াটুকু সম্বল করে এতদিন প্রাণধারণ করেছিলেন। তাঁর প্রাণপাখীর খাঁচা রাধুর দিকে মনটা ফিরিয়ে আনার জন্য সকলেরই প্রয়াস। সারদানন্দজী বললেন, 'আপনার এই অসুখের সময় ওদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওরা যাবে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও তখনকার মত ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন তিনি—"তা পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তবে যেন আমার কাছে ওরা আর না আসে। ওদের আর ছায়া দেখতেও ইচ্ছা নেই।" আপাতত রাধুর যাওয়া স্থগিত হল। রাধু থাকে পাশের ঘরে। একদিন তার শিশুপুত্রটি হামা টেনে মায়ের ঘরে এসে উপস্থিত—অভ্যাসমতো সে মায়ের বুকের ওপর ওঠার চেষ্টা করছে—তীব্র বিরক্তির সঙ্গে শ্রীমা বললেন, 'তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা, যা, আর পারবি নি।' পার্শ্বস্থিত সেবককে বললেন, 'একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এসো। এ-সব আর ভাল লাগে না।' রাধুর প্রতি তাঁর শেষ সম্ভাষণ, 'কুটো ছেঁড়া করে দিয়েছি। তুই আমার কি করবি, আমি কি মানুষ?"

দক্ষিণেশ্বরে নহবতে থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন গৌরী-মাকে[১] সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও একজন সঙ্গিনী এলো।' তারপর শ্রীমায়ের 'গৌরদাসী'র সঙ্গে সুখ-দুঃখে রঙ্গ-বিভঙ্গে কতদিন কেটেছে। কোন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে গৌরী-মা'র কাছে উপস্থিত হয়েছেন—গৌরী-মা'র কর্মপ্রণালীকে সমর্থন করে এসেছেন বরাবর। সেই গৌরী-মা এসেছেন অসুস্থ সরদাদেবীকে দেখতে, কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'মা, আপনি অসুখে পড়ে আছেন, আমাদের মনে শান্তি নেই। সর্বদা দেখতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু সময় পাই না। তাই রোজ একবার করে আসি।' গৌরী-মাকে স্তম্ভিত করে শ্রীমা উত্তর দিলেন, 'আমার কাছে এসে কি হবে? আমি আর কারও ঝামেলা সহ্য করতে পারছি না।' গৌরী-মা'র বিস্ময়কে কঠোরতর আঘাতে জর্জরিত করে শ্রীমা আবার বললেন, 'যদি আসো তবে আমার ঘরে ঢুকো না, ঐ দরজার বার থেকে দেখে চলে যেও,

---

১। গৌরী-মা'র প্রকৃত নাম মৃড়ানী। গঙ্গাসাগরে স্নান করতে গিয়ে তিনি সঙ্গিনীদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে বিভিন্ন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর গৌরবর্ণ গাত্রের জন্য অনেকেই তাঁকে 'গৌরা-মাই' বলতেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সন্ন্যাস দান করেন ও নাম দেন 'গৌরী আনন্দ'। গৌর-মা বলতেন, আমি গৌরের দাসী—তাতেই আমার আনন্দ।

আর কোন কথায় বকিও না।' স্তব্ধ গৌরী-মার দুচোখে নামল অশ্রুধারা—সে কি শুধুই আহত অভিমানে, না নিশ্চিত আসন্ন বিরহ ব্যথার শঙ্কায়?

জুন মাসের (১৯২০) শেষ দিকে শ্রীমার কক্ষস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি তিনি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন কারণ তখন থেকে বাইরে গিয়ে শৌচাদি করার সামর্থ্য আর তাঁর নেই। শরীর ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছে—চিকিৎসকরা তাঁদের সাধ্যমত চিকিৎসা করছেন বটে কিন্তু তাঁরাও জানেন—চিকিৎসার দ্বারা তাঁকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব নয়—শেষের দিন ক্রমশঃ নিকটবর্তী হয়ে আসছে। গৌরী-মা নিত্য আসেন—মায়ের ঘরের দরজার সামনে বসে প্রায় ঘণ্টাখানেক দর্শন করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরে যান, কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে থাকেন দুর্গাদেবী (দুর্গাপুরী)।

তিরোভাবের পাঁচদিন পূর্বে (আনুমানিক ১৫ জুলাই) ভক্ত অন্নপূর্ণার মা দেখতে এসেছেন সারদাদেবীকে—ঘরের ভিতরে যাওয়া নিষেধ বলে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সারদাদেবী পাশ ফিরে তাঁকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। তিনি প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মা, আমাদের কি হবে?' করুণাবিগলিত কণ্ঠে শ্রীমা অভয় দিলেন, 'ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ,—তোমার আবার ভয় কি?' সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, 'তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।'

এরই মধ্যে একদিন হরিপ্রেম মহারাজ এলেন জয়রামবাটীর নতুন কূয়ার জল নিয়ে। সেই জল শ্রীমাকে একটু খাইয়ে তিনি বললেন,'মা কিশোরীদা আপনার ঘরের মেঝে সব সিমেন্ট করে দিয়েছেন—এরপর আপনি দেশে গেলে আর কোনও কষ্ট হবে না।'

বাংলার শ্যামল মাটির মেয়ের দু'চোখে ফুটে উঠল অসন্তোষ, বললেন,'কেন কিশোরী মাটি তুলে সিমেন্ট করতে গেল? মাটিই ভাল। এ সব করবার কি দরকার ছিল? কিশোরী কি মনে করেছে, আমি আর সেখানে যাব? আমার আর যাওয়া হবে না।'

সময় এগিয়ে চলেছে চরম মুহূর্তটির দিকে তবু কারও চোখে জল দেখলে বরাভয় দেন, 'ভয় কি শরৎ রইল।' চিরবিদায়ের তিনদিন আগে থেকে আর বিশেষ কোন কথা বলতেন না। কেউ কেউ কথা বলে তাঁর মনকে নিচে নামাবার চেষ্টা করলে বিরক্তি প্রকাশ করতেন। জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি শেষ আশীর্বাদ জানান। 'যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে—আমার

সকল সন্তানকে জানিয়ে দিও মা—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।[১]

২১ জুলাই ১৯২০ (৪ শ্রাবণ ১৩২৭) রাত্রি দেড়টা। উদ্বোধন বাড়ির দ্বিতলে মায়ের ঘরের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন শরৎ মহারাজ, তুলসী মহারাজ, গোলাপ-মা, যোগীন-মা, বরেনের পিসীমা, মাস্টার মহাশয়, শান্তিরামবাবু, কৃষ্ণলাল মহারাজ, কিরণবাবু, ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ এবং আরও অনেক সাধু ও ভক্ত। শ্রীমা সারদাদেবী কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

মর্ত্যভূমিতে সেই তাঁর প্রশ্বাসের ঋণ শোধ।

১। শ্রীমতী দুর্গাপুরী 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে এই কথাগুলি 'চরমক্ষণে একদিন' বলেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু কার কাছে এবং ঠিক কখন বলেছিলেন, তার উল্লেখ করেননি। আমরা অনুমান করছি, প্রায় শেষ মুহূর্তের কাছাকাছি সময়ে শ্রীমা এই শেষ আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।হয়তোসে সময় গৌরী-মা এবং শ্রীমতী দুর্গাপুরী শ্রীমায়ের ঘরের বাইরে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী দুর্গাপুরী তাঁর গৌরী-মা গ্রন্থে আরও জানিয়েছেন, যে শ্রীমা একদিন গৌরী-মা'কে বলেছিলেন, "আমার তো যাবার সময় হয়ে এলো... দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্য ভোগ দিলেই হবে।"

॥ ২২ ॥

'উদ্বোধন'-এ আজ বিসর্জনের বিষণ্ণতা। ২২ জুলাই (৫ শ্রাবণ) সকাল সাড়ে দশটায় মায়ের খাটটিকে নানাবিধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হল। শ্রীমা সারদাদেবীকে সরু লালপাড় শাড়ি পরিয়ে দিলেন ভক্ত মহিলারা। অশ্রুসিক্ত 'মায়ের বাড়ি' পরিত্যাগ করে তাঁকে ভক্তগণ বহন করে নিয়ে গেলেন কাশীপুর হয়ে বরানগর কুঠীঘাট পর্যন্ত—সঙ্গে রামনাম সংকীর্তন। একটি বড় নৌকায় শ্রীমায়ের মরদেহ স্থাপন কবে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত গঙ্গা পার হয়ে সবাই পৌঁছলেন বেলুড় মঠে, তখন বেলা দুটো। আমতলায় স্থাপন করা হল দেহ—সর্বসাধারণের শেষ দর্শনের জন্য। তারপর স্ত্রীভক্তগণ তাঁকে স্নান করিয়ে নববস্ত্র পরিধান করালেন। ইদানীং অসুস্থ অবস্থায় গায়ের অসহ্য জ্বালার জন্য প্রায়ই বলতেন 'আমায় গঙ্গায় নিয়ে চলো।' আজ তাঁর শরীর গঙ্গাতীরে—কিন্তু শরীরে আর পার্থিবজ্বালা নেই—এখন পরমশান্তিতে তিনি নিমগ্ন। সাধুরা তাঁকে আরতি করলেন। বেলা তিনটায় স্বামীজীর স্মৃতি মন্দিরের উত্তরদিকে চন্দন কাষ্ঠের চিতা সাজিয়ে স্থাপন করা হল সঙ্ঘজননীর মরদেহ। শরৎ মহারাজ এবং অন্যান্য সাধুরা চিতা প্রদক্ষিণ করে বেলপাতা, ধুনো, গুগগুল দিয়ে অগ্নি সংযোগ করলেন। গঙ্গার অপরতীরে তখন প্রবল বর্ষণ কিন্তু এপারে অগ্নিলোভী শুষ্কতা। সন্ধ্যা সমাগমে নির্বাপিত হল চিতাবহ্নি। প্রথম কলস গঙ্গোদক চিতায় নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল মঠভূমিকে প্লাবিত করে।

১৯২১, ২১ ডিসেম্বর। এই প্রথম মাতৃরিক্ত শ্রীমায়ের জন্মতিথি। সেইদিনই বেলুড় মঠে যেখানে তাঁর অগ্নিসৎকার হয়েছিল সেখানে গঙ্গামুখী মাতৃমন্দিরের উদ্বোধন। আজ তিনি শুধু নিরাবয়ব আত্মামাত্র—নেপথ্যচারিণী অন্তঃপ্রেরণার উৎস। তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্মরণমন্দির।

সংযোজন

বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থে শ্রীমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে যার কাল নিরূপণ করা সম্ভব নয়, এমনকি যুক্তিসিদ্ধ অনুমানও দুঃসাধ্য অথচ সারদাদেবীর জীবন পর্যালোচনায় এই ঘটনাগুলি যে আলোকপাত করে তার গুরুত্ব যথেষ্ট। সংযোজন অংশে এই রকম কিছু ঘটনা এবং তাতে সারদাদেবীর প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

গিরিশ প্রসঙ্গ ঃ একবার শ্রীমা অনেকদিন পরে দেশ থেকে আসছেন—তাঁর সঙ্গে আছেন গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। বাগবাজারের বাড়িতে সেবার উঠেছিলেন এবং সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল—এইটুকু মাত্র জানা যায়। বাগবাজারের অনেক বাড়িতে বিভিন্ন সময় শ্রীমা অবস্থান করেছেন—ঠিক কোন বাড়িতে এই ঘটনাটি ঘটে সেটা বলতে পারব না।

শ্রীমা আসছেন বিষ্ণুপুরের পথ দিয়ে। বেলুড় মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ আলোচনা করে স্থির করলেন তাঁরা হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে সারদাদেবীকে অভ্যর্থনা জানাবেন। কয়েকজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে তাঁরা জানতে পারলেন ট্রেন ৩ ঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছবে। এতদূর এসে শ্রীমাকে দর্শন না করেই ফিরে যাওয়াটা তাঁদের মনোমত হল না—তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন স্টেশনে। তিন ঘণ্টারও বেশি বিলম্বে ট্রেন এসে পৌঁছল। শ্রীমাকে সযত্নে ট্রেন থেকে নামালেন গোলাপ-মা ও যোগীন-মা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দকে দেখেই গোলাপ-মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ মহারাজ, তোমাদের কি একটু আক্কেল নেই? ওই রোদে মা তেতে পুড়ে এলেন, আর তোমরাই যদি পেন্নাম করার জন্যে এখানে এসে বিভ্রাট কর তো অপরের আর কথা কি?" রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্বোচ্চপদের অধিকারী হলে কি হবে গোলাপ-মাকে সমীহ করে চলবেন না এমন শক্তি তাঁরও নেই। ব্রহ্মানন্দজী অপরাধীর মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘোড়ার গাড়িতে তুলে শ্রীমাকে বাগবাজারের বাড়িতে আনা হল। রাজা মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ভাবলেন, শ্রীমাকে প্রণাম করতে না পেলেও তাঁর থাকার সুব্যবস্থা হয়েছে কি না, সেটা জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। সুতরাং তাঁরা অন্য একটি গাড়ি ভাড়া করে বাগবাজারে এসে পৌঁছলেন এবং মায়ের আবাসস্থলে নিচের তলায় অপেক্ষা করে রইলেন—শ্রীমায়ের অবস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল দোতলায়।

এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌঁছলেন গিরিশচন্দ্র—গায়ে কোনক্রমে একটা সাধারণ জামা চড়িয়ে ছুটে এসেছেন শ্রীমায়ের আগমন সংবাদ পেয়ে। তাঁর সারা শরীর ঘর্মাক্ত। স্বামীজীদ্বয়কে নিচে দেখতে পেয়ে তিনি মায়ের কুশলাদির প্রশ্ন করলেন—তারপরই অগ্রসর হলেন সিঁড়ির দিকে। গিরিশচন্দ্রের গলা ওপরে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপ-মা ওপর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে গিরিশকে উপরে গমনোদ্যত দেখে ঝেঁঝে উঠলেন, "বলিহারি যাই ঘোষজার এই ভক্তি দেখে। বলি গিরিশবাবু মাকে তো দেখতে এসেছ। মা তেতেপুড়ে এলেন—কোথায় একটু জিরোবেন, না এখানেও এলে জ্বালাতন করতে!" তাঁর কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে গিরিশচন্দ্র ওপরে উঠতে উঠতে বললেন, 'চল চল মহারাজ, বাবুরাম

মাকে দেখে আসি।" গোলাপ-মা সহজে ছাড়ার পাত্রী নন, তিনি কঠোরতর কণ্ঠে শাসনবাণী উচ্চারণ করলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে আমল না দিয়ে সেবিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঝাঁজা মেয়ে বলে কি না মাকে জ্বালাতন করতে এসেছি! কোথায় এতদিন পরে এসে ছেলের মুখ দেখে মাযের প্রাণ জুড়িয়ে যাবে, আর ইনি আমাকে মাতৃস্নেহ শেখাচ্ছেন।" গিরিশচন্দ্র সকলকে নিয়ে সটান গিয়ে পৌঁছলেন সারদাদেবীর কাছে—সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং শ্রীমাও সস্নেহে তাঁদের প্রণাম গ্রহণ করে আশীর্বাদ জানালেন। অপমানিত গোলাপ-মা ততক্ষণে এসে পৌঁছেছেন শ্রীমার কাছে। ছলছল চোখে মার কাছে অভিযোগ করে বললেন, 'শেষে কি না গিরিশবাবু আমাকে এরকম বললে!' শ্রীমা তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, 'তোমাকে অনেকবার বলেছি, আমার ছেলেদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে যেও না।' ডিক্রি পেযে গিরিশবাবু সকলকে নিয়ে সগর্বে নিচে নেমে এলেন।

'খ'

আমজাদ প্রসঙ্গ: সারদাদেবী বলতেন 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।' এটি যে কেবল তাঁর মুখের কথা মাত্র ছিল না, প্রচলিত অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত—তারই মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমজাদ প্রসঙ্গ। আমজাদ মাতৃসান্নিধ্যে আসেন জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের জন্য স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণের সময়—এটুকু মাত্র প্রচলিত জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায। বাড়ি তৈরীর সময অনেক মজুরই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল কিন্তু বিশেষ করে আমজাদ কিভাবে মাতৃস্নেহ লাভ করে তা জানা যায় না অর্থাৎ পূর্ব থেকেই শ্রীমা আমজাদকে চিনতেন কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

জয়রামবাটীর কাছে শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। একসময় তারা রেশমকীটের চাষ করে জীবিকানির্বাহ করত যার জন্যে তাদের নাম হয়ে গিয়েছিল তুঁতে মুসলমান। কালক্রমে বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে ব্যবসা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায় এবং তখন অনেকেই চুরি ডাকাতির আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীমায়ের নতুন বাড়ি তৈরীর সময় তারা সাধারণ শ্রমিক হিসাবে যোগ দেয়—আমজাদ তাদেরই একজন। গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হলেও আমরা দেখতে পাই আমজাদের শ্রীমায়ের নিকট যাতায়াত অব্যাহত ছিল। একদিনের কথা—শ্রীমা আমজাদকে খেতে দিয়েছেন নিজের নতুন বাড়ির বারান্দায়—পরিবেশন করছেন ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনী। কিন্তু তিনি স্পর্শ বাঁচাবার জন্য অনেক দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খাদ্যবস্তুগুলি পরিবেশন করছেন। তাই দেখে শ্রীমা বললেন, 'অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি।' খাওয়া শেষ হতে আমজাদ পাতা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলতে গেল। শ্রীমা নিজেই জল ঢেলে

জায়গাটা পরিষ্কার করে দিলেন। নলিনী তাই দেখে বললেন, 'ও পিসিমা, তোমার জাত গেল।' শ্রীমা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, আমজাদও তেমন ছেলে।'

আর একদিনের কথা। শ্রীমা তখন জ্বরে শয্যাশায়ী। সেদিন সকাল ৯টা-১০টার সময় একজন কালো, শীর্ণ, ছেঁড়া কাপড়-পরা বিষণ্ণ মানুষ লাঠির ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে শ্রীমায়ের নতুন বাড়িতে ঢুকল। একজন ব্রহ্মচারী সেখানে ছিলেন, কৌতূহলী হয়ে তাকে অনুসরণ করে মায়ের বাড়িতে তিনিও প্রবেশ করলেন। শ্রীমা ঘরের মধ্যে চৌকিতে শুয়ে আছেন। তাঁর ঘরের সামনের বারান্দার কিছু অংশ চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া—যাতে বাড়িতে ঢুকেই কেউ ঘরের মধ্যে দেখতে না পায়। লোকটি সেই বেড়ার উপর দিয়ে ডিঙ্গি মেরে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই শ্রীমায়ের কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে বাবা আমজাদ, এসো।' লোকটি এবার বারান্দার উপরে উঠে শ্রীমায়ের ঘরের দরজার সামনে বসল এবং সেখান থেকেই কক্ষস্থিত শয্যাশায়ী মায়ের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। শ্রীমা অসুস্থ বলে তখন পূজা ও ভোগারতির ভার ছিল ব্রহ্মচারীটির উপর। আমজাদ নিশ্চিন্ত মনেই মায়ের সঙ্গে গল্প চালিয়ে যাচ্ছে—শ্রীমারও কিছুমাত্র বিরক্তি নেই। এদিকে ব্রহ্মচারীটির সমস্যা—মায়ের ঘরের মধ্যে পঞ্চপাত্রের মধ্যে গঙ্গাজল থাকে—সেই গঙ্গাজল তাঁকে পৌঁছে দিতে হবে রান্নাঘরে, ভোগের জন্য—আমজাদের উপস্থিতিতে বারান্দা দিয়ে সেই পঞ্চপাত্র কি আনা সমীচীন হবে! অবশেষে তিনি স্থির করলেন—মায়ের সামনে দিয়েই যখন পঞ্চপাত্র আনা হবে তখন মায়ের আপত্তি থাকলে তিনি নিশ্চয় ব্যবস্থা করবেন। সেই সিদ্ধান্তমত তিনি শ্রীমা ও আমজাদের মাঝখান দিয়ে পঞ্চপাত্র নিয়ে গেলেন—শ্রীমা কোন নিষেধ করলেন না। আমজাদ সারাদিনই রইল—গায়ে মাথায় তেল মেখে স্নান করে ওখানেই আহারাদি করে বিকালে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন তার এক হাতে এক শিশি তেল অন্য হাতে পুঁটলি—তাতে নানবিধ জিনিস আর মুখে প্রসন্নতা। সে চলে যাবার পর শ্রীমা ব্রহ্মচারীকে বললেন, "গরম ওষুধ খেয়ে খেয়ে আমজাদের মাথা গরম হয়েছে, রাত্রে ঘুম হয় না। অনেকদিন থেকে একশিশি নারায়ণ-তেল পড়েছিল—তাকে দিয়েছি। মাখলে মাথা ঠাণ্ডা হবে—খুব ভাল তেল।"

শ্রীমায়ের স্নেহলাভ করেও আমজাদ কিন্তু চুরি-ডাকাতি ছাড়েনি (সম্ভবত সংসার চালাবার জন্য অন্য কোন পথ তার সামনে ছিল না) কিন্তু জয়রামবাটীতে সে কোনদিন চুরি ডাকাতি করেনি। হয়তো বা তার নিষেধের জন্যই জয়রামবাটীতে চুরি ডাকাতি হত না। মায়ের যে কোন প্রয়োজনে আমজাদকে সংবাদ দিলেই সে এসে হাজির হত এবং বিশ্বস্তভাবে মায়ের আদেশ পালন করত।

অনেকদিন পরে আবার একদিন আমজাদের আবির্ভাব, মাথায় একঝুড়ি লাউ, মায়ের জন্য সন্তানের উপহার। তাকে দেখে শ্রীমা বললেন, "অনেকদিন ভাবছিলাম তুমি আসোনি কেন?" আমজাদ সরলভাবেই জানালো গরু চুরির দায়ে সে ধরা পড়েছিল, ছাড়া পেয়ে এসেছে। শ্রীমা সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন, 'তাই তো ভাবছিলাম আমজাদ আসে না কেন?"

শেষ অসুখের সময় শ্রীমা যখন উদ্বোধনে শয্যাশায়ী তখন খবর এল, আমজাদ ডাকাতি করে অনেকদিন ফেরার হয়েছিল, অবশেষে ধরা পড়েছে। শুনে শ্রীমা বললেন, 'ও বাবা, দেখলে! আমি জানতুম ডাকাতিটা তার জানা আছে।'

শ্রীমা সবই জানতেন তা সত্ত্বেও আমজাদকে সন্তান বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। আমজাদও নিজেকে ভাল করেই জানত—শ্রীমাকেও চিনেছিল অসৎ সন্তানের স্নেহময়ী জননীরূপে।

।। গ ।।

পদ্মবিনোদ প্রসঙ্গ ঃ বিনোদবিহারী সোম রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে পদ্মবিনোদ নামে খ্যাত। আবার মঞ্চ-জগতে পদবাবু নামও তাঁর প্রচলিত। ইনি শ্রীম-র ছাত্র এবং তাঁর সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহলাভও করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি থিয়েটারে যোগ দেন, অভিনেতা হিসাবে সুনামও অর্জন করেন কিন্তু সমকালীন থিয়েটারী রীতি অনুসরণ করে মদ্যপানেও আসক্ত হন। তা সত্ত্বেও অবশ্য রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়নি, স্বামী সারদানন্দকে তিনি বলতেন 'দোস্ত'। বিনোদবিহারী সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির সঠিক কাল নির্ণয় কর সম্ভব হয়নি কারণ শ্রীআশুতোষ মিত্র তাঁর 'শ্রীমা' গ্রন্থে ঘটনাস্থল বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়ি বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীমা বাগবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে ছিলেন ১৯০৪ এবং পরে আবার ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে। ঠিক কোনবার নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি ঘটে সেটা নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি এবং যুক্তিসিদ্ধ অনুমানও এক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কারণ অভিনেতা হিসেবে পদ্মবিনোদের নাম প্রচলিত মঞ্চ ইতিহাসে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের পর আর পাওয়া যায় না। সুতরাং ১৯০৪ বা ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন একবার বাগবাজার স্ট্রিটে শ্রীমায়ের অবস্থানকালের ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় মাত্র।

বিনোদবিহারীর বাড়ি ছিল রামকান্ত বোস স্ট্রিটে। তিনি প্রায়ই মধ্যরাত্রে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফেরার পথে শ্রীমায়ের আবাসে উপস্থিত হয়ে শ্রীমায়ের সাক্ষাৎলাভের জন্য সারদানন্দজীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক ও হৈচৈ করতেন। শরৎ মহারাজাকে এই সময় বিশেষ সতর্ক থাকতে হত, যাতে অসুস্থ মায়ের নিদ্রাভঙ্গ না হয়। অন্য ভক্তদের তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে বিনোদবিহারী এলে কেউ সাড়া না দেয়। পদবাবু সেদিনও যথারীতি গভীররাত্রে উপস্থিত—বার কয়েক

দোস্ত' 'দোস্ত' বলে ডাকলেন কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে বলতে বলতে চলে গেলেন—"আমি ব্যাটা এত রাত্রে এলাম আর তুমি দোস্ত একবার উঠলেও না, সাড়াও দিলে না।"

কিন্তু এরপর যেদিন এলেন সেদিন একটা নতুন কৌশল করলেন। দু'একবার 'দোস্ত' 'দোস্ত' বলে ডেকেই একেবারে চুপচাপ। তিনি সটান গিয়ে হাজির হলেন শ্রীমায়ের দোতলার ঘরের জানলার সামনে—তারপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'ওঠো মা, ছেলে এসেছে তোমার, একবার ওঠো।' তারপরই গান ধরলেন ঃ

ওঠো গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীরদ্বার
আঁধারে হেরিতে নারি, প্রাণ কাঁদে অনিবার।
তারস্বরে ডাকিতেছি, তারা তোমায় কতবার
দয়াময়ী হয়ে আজি এ কী তব ব্যবহার।।
সন্তানে রেখে বাহিরে, শুয়ে আছ অন্তঃপুরে
(আমি) ডাকিতেছি মা মা বলে
নিদ্রা কি ভাঙ্গে না তোমার।।

সারদানন্দজী লাফিয়ে উঠলেন। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন ইতিমধ্যে বিনোদবিহারী কাজ হাসিল করে ফেলেছে। গানের প্রথম কলিটি গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা এসে জানলা খুলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। চারটি পঙক্তি গাওয়া শেষ করে পদ্মবিনোদ শ্রীমাকে দেখে বলে, "উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কানে গেছে? উঠেছ তো পেন্নাম নাও।" বলে রাস্তার ধুলো-কাদার ওপর শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। পরে উঠে দাঁড়িয়ে সেখানকার ধুলো মাথায় দিয়ে বাড়ির দিকে চলে গেলেন—মুখে তখন গান ঃ

"যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে
(মন) তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে..."

আবার সঙ্গে সঙ্গে আখর দিলেন—

"মন তুই দেখ আর আমি দেখি, দোস্ত যেন নাহি দেখে।"

পরদিন সকালে শ্রীমার কাছে উপস্থিত হলে আশুবাবুকে শ্রীমা প্রশ্ন করেন, "ছেলেটা কে?" আশুবাবু পদ্মবিনোদের কাহিনী বর্ণনা করলে শ্রীমা বলেন, "দেখেছ? জ্ঞানটুকু টনটনে আছে?"

আর একবার গভীর রাত্রে ওই একই কৌশল করে তিনি মাতৃসাক্ষাৎ লাভ করেন। সেদিন তিনি আর কাউকে ডাকেননি—সোজা মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গান গাইতে থাকেন ঃ

"শ্মশান ভালবাসিস বলে
তাই শ্মশান করেছি এ হৃদি

শ্মশানবাসিনী শ্যামা, তুই নাচবি
বলে নিরবধি ।।
আর কিছু গো নাই মা চিতে
দিবানিশি ধূ ধূ জ্বলছে চিতে
চিতাভস্ম চারিভিতে ছড়ায়ে
রেখেছি মা, আসিস যদি ।।...'

সেদিনও তিনি শ্রীমায়ের দর্শন পেয়ে পূর্বের মতই প্রণাম করে গানটি গাইতে গাইতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে শ্রীমা পূর্বরাত্র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে আশুবাবু অনুযোগ করে বললেন, 'কিন্তু মা, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হয় যে!'

শ্রীমা বললেন, "তা হোক গে, বাবা। ওর ডাকে যে থাকতে পারি নে—তাই দেখা দি।"

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে—পদবাবুর আর দেখা নেই। সারদানন্দজীও বেশ নিশ্চিন্ত। হঠাৎ একদিন পদ্মবিনোদের ১২/১৩ বছরের ছেলে এসে সারদানন্দজীকে খবর দিল, বিনোদবিহারী দুরারোগ্য জলউদুরী রোগে শয্যাশায়ী। তখনই শরৎ মহারাজ ডাঃ কাঞ্জিলাল ও আশুতোষ মিত্রের নেতৃত্বে একদল ভক্তকে পাঠালেন তাঁকে নিয়মিত সেবাশুশ্রূষার জন্য। তাঁরা উপস্থিত হয়ে দেখেন প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। ডাঃ প্রাণধন বসুকে ডাক হল—তিনি দুবার 'ট্যাপ' করে পেটের জল বার করে দিলেন। দু'চার দিন ভাল ভাবে কাটে—রোগী একটু সুস্থ হয়ে ওঠেন তারপরই আবার পেটে জল জমে। অবশেষে অপারেশনের ব্যবস্থা। ডাঃ ব্রাউন তখনকার দিনের নামকরা সার্জন। তিনি অপারেশন করে বললেন, রোগীর পেটের নলিগুলি সব পচে গেছে—বাঁচার আর বিশেষ আশা নেই। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সেবকরা প্রাণপণে সেবা যত্ন করতে লাগলেন। বিনোদবিহারী বেশির ভাগ সময় অচৈতন্য থাকেন—মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসে—তখন নানাবিধ আব্দার ধরেন। একেবারে শেষ দিনে তিনি একটা আঙুর খেতে চাইলেন কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ—নির্দিষ্ট পথ্য ছাড়া আর কিছু দেওয়া চলবে না। আশুতোষ মিত্র বিনোদবিহারীর অনুরোধ এককথায় উড়িয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই আবার অচৈতন্য। রাত ১টায় শেষবারের মত জ্ঞান ফিরল। আশুতোষকে দেখে বললেন, "আর বাঁচব না—একটা আঙুর চেয়েছিলাম দিলি না। তা না দিয়েছিস, বেশ করেছিস, আর কিছু চাইব না। এখন একটা কাজ কর—ঠাকুরের কথা শোনা—আমার শেষ হয়ে এসেছে।"

আশুতোষের হাতের কাছেই ছিল 'কথামৃত'। বইটি খুলতেই চোখে পড়ল সেই অংশটি যেখানে বিনোদের কথা আছে। সেই অংশটি শুনতে শুনতেই

পদ্মবিনোদ উচ্চারণ করলেন—'রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ'—মৃত্যুযবনিকা নেমে এল।

পরদিন সকালে সারদানন্দজী মায়ের কাছে মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'বড় কষ্ট পেয়েছে—কিন্তু বড় চমৎকার অন্তিম মুহূর্তটি।'

শ্রীমা বললেন, "তা হবে না? ঠাকুরের ছেলে যে! কাদা মেখেছিল, এখন যাঁর ছেলে তাঁরই কোলে ফিরে গেছে।"